টলস্টয়
জীবন সাহিত্য শিল্পজিজ্ঞাসা

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

প্রাক্তন অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা, হুগলী কলেজ, কারমাইকেল কলেজ, রঙপুর, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ।

প্রাপ্তিস্থান

প্রভা প্রকাশনী

আবাহনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১১, নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

Tolstoy : Jiban Sahitya Silpa Jignasa
Tolstoy : A Study of his life, literature and inquiries into the problems of Art by Prof. Dwijendra Lal Nath.

প্রকাশকদ্বয় : শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল ও
শ্রীতাপসকুমার পাল
১১, নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৫৯

গ্রন্থস্বত্ব : ডঃ ক্ষিতীন্দ্রপ্রসাদ দালাল

পরিবেশক : প্রভা প্রকাশনী
মাঠপাড়া নোনাচন্দন পুকুর
বারাকপুর, উত্তর ২৪-পরগণা

প্রচ্ছদ : পিণ্টু ভদ্র ও
সুবিভারঞ্জন বিশ্বাস

মুদ্রণে : শ্রীবাদলচন্দ্র পাল
এস. এম. প্রিন্টিং
১৯ডি, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

বিশ্ব-নাগরিক হয়েও স্বদেশের মাটি এবং
মানুষের মধ্যে যার সংবেদনশীল মন
সদা ভ্রাম্যমান,
স্বদেশের সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি
যাঁর অনুরাগ অকৃত্রিম,
ন্যু-ইয়র্ক প্রবাসী আমার সেই পরমাত্মীয়
ডঃ ক্ষিতীন্দ্রপ্রসাদ দালাল-এর
করকমলে—

গ্রন্থকারের নিবেদন

টলস্টয়ের জীবন-বৈচিত্র্য যেমন অপরিসীম তেমনি তাঁর সৃজনকর্মও বহু স্রোতে প্রবাহিত। জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক প্রভৃতি সৃজনশীল রচনায় এই মহান শিল্পী নিজের অন্তর্জীবন এবং উপলব্ধিময় জীবন-ভাবনাকে যেভাবে ক্রমশঃ পরিণাম-মুখী করে তুলেছেন তার তুলনা বিশ্ব-সাহিত্যে খুব সুলভ নয়। তাঁর সামগ্রিক সৃজনকর্ম পাঠক-মনে যেমন সত্য-জিজ্ঞাসা জাগ্রত করে তেমনি গভীর মানবচেতনায়ও উদ্বুদ্ধ করে।

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে টলস্টয়ের অন্তর্দ্বন্দ্বমথিত সত্যসন্ধানী জীবনের পটভূমিকায় তাঁর অবিস্মরণীয় সৃজনকর্মের বিচিত্র বিকাশকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপে তাঁর শিল্প-ভাবনার পরিচয় দিয়েছি। তৃতীয় অধ্যায়ে আমার জ্ঞান-বিশ্বাস মত টলস্টয়ের শিল্প-ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে যে দুঃসাহস দেখিয়েছি তার কোন মূল্য আছে কিনা সে বিচারের ভার সুধী পাঠকের ওপর। চতুর্থ অধ্যায়ে টলস্টয় এবং রবীন্দ্রনাথের শিল্প-জিজ্ঞাসার তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে টলস্টয়ের শিল্পাদর্শের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছি। পঞ্চম অধ্যায়ে পাশ্চাত্য মনীষী লেখকদের এবং বিপ্লবী সাম্যবাদী নেতা লেনিনের নির্মোহ বিশ্লেষণের আলোকে টলস্টয়ের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়নের প্রয়াস পেয়েছি। বিখ্যাত গ্রন্থ What is Art? রচনার পূর্বে On Art নামক প্রবন্ধটিতে টলস্টয় শিল্পের লক্ষণ, বৈশিষ্ট্য, প্রবণতা এবং আদর্শ প্রভৃতি নিয়ে যে প্রাথমিক ভাবনা-চিন্তা করেছিলেন, পরিশিষ্টে সে প্রবন্ধের অনুবাদ সংযোজন করে পাঠকের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ-পরিচয় সাধনের চেষ্টা করেছি।

টলস্টয়ের জীবন এবং সাহিত্য সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালে কোন কোন গ্রন্থ রচিত হলেও তাঁর শিল্প-জিজ্ঞাসার সংক্ষিপ্ত পরিচয়, আধুনিকতা বিচার এবং রবীন্দ্রনাথের শিল্পভাবনার সঙ্গে তার তুলনা-মূলক বিচার কেউ করেছেন কিনা আমার জানা নেই। এই গ্রন্থেও

ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা পাঠক-মনে কৌতূহল জাগাতে সমর্থ হলে পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করব।

এই গ্রন্থের কোন কোন অংশ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হবার পর শিল্প-জিজ্ঞাসু মহলের মনোযোগী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। গ্রন্থের প্রকাশ মুহূর্তে তাঁদের উৎসাহ-বাক্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

এই গ্রন্থ প্রকাশে সক্রিয় সহযোগিতার জন্য বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক-সমালোচক বন্ধুবর নারায়ণ চৌধুরীর নিকট আমি ঋণী। আমার প্রতি তাঁর আন্তরিক প্রীতি এত স্বতঃস্ফূর্ত যে মামুলি ধন্যবাদ দিয়ে তার অমর্যাদা করব না। গ্রন্থের প্রকাশ ভার গ্রহণ করে আবাহনীর শ্রীঅসীম কুমার মণ্ডল এবং তাপস কুমার পাল আমাকে দুশ্চিন্তামুক্ত করেছেন। তাঁদের এবং প্রেসের সংশ্লিষ্ট কর্মীদের অজস্র ধন্যবাদ। সতর্কতা সত্ত্বেও গ্রন্থমধ্যে কতগুলি ভুল-দোষ-ত্রুটি আত্মপ্রকাশ করায় দুঃখিত এবং লজ্জিত। পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থটিকে সর্বপ্রকার ত্রুটিমুক্ত করা হবে। পাঠের সুবিধার জন্য বর্তমানে গ্রন্থশেষে একটি শুদ্ধিপত্র সংযোজিত হল।

জীবন-সায়াহ্নে অসংখ্য টলস্টয়-অনুরাগী পাঠক-পাঠিকার হাতে আমার টলস্টয়-চর্চার অকিঞ্চিৎকর এই ফসল তুলে দিতে পেরে আনন্দ অনুভব করছি। নমস্কার।

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

সূচীপত্র

এই লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১. আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য
২. সাহিত্য ও শিল্পলোক
৩. দ্বারকানাথ ঠাকুর (অনুবাদ)
৪. মোহিতলালের কাব্য পরিক্রমা
৫. সমবায় (অনুবাদ)
৬. রবীন্দ্র-মন ও রবীন্দ্র-সাহিত্য
৭. সাহিত্যের আকাশ।
৮. শিল্পের স্বরূপ (টলস্টয়ের What is Art ?-এর অনুবাদ।
৯. মোহিতলাল মজুমদার : ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য-প্রতিভা (সম্পাদনা)
১০. বিবেকানন্দের সাধনা
১১. মধুসূদন : সাহিত্য-প্রতিভা ও শিল্পী-ব্যক্তিত্ব (সম্পাদনা)
১২. মোহিতলাল মজুমদার
১৩. বঙ্কিম সান্নিধ্যে
১৪. বাংলা উপন্যাসের একযুগ
১৫. নারায়ণ চৌধুরীর নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ (সংকলন ও সম্পাদনা)

প্রথম অধ্যায়

জীবন ও সাহিত্য

জীবন-রহস্যের স্বরূপ সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে অস্কার ওয়াইল্ড্ চমৎকার একটি মন্তব্য করেছিলেন: **The Book of life begins with man and woman in a garden. It ends with Revealations**। মনীষী টলস্টয়ের জীবন সম্পর্কে এ উক্তি বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। দেড়শো বছর আগে রাশিয়ার ইয়াস্নায়া পলিয়ানার যে পৈতৃক ভবনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন (জন্মের তারিখ ২৮শে আগস্ট ১৮২৮, ভিন্ন মতে ৯ই সেপ্টেম্বর) তা শুধু অভিজাত পরিবারের বাসযোগ্য প্রাসাদোপম বাড়ী নয়, আক্ষরিক অর্থে একটি বৃহৎ উদ্যান-বাটিকা। ৩'৮৪ হেক্টর ভূখণ্ড জুড়ে সে প্রকাণ্ড উদ্যান বাড়ীর বিস্তৃতি। বৃহদায়তন অট্টালিকা ছাড়াও সে উদ্যান-বাড়ীতে ছিল ফুলে ফুলে সুসজ্জিত সুন্দর বাগান, ঝিল, সরোবর, নির্জন বনপথের দুধারে সারিবদ্ধ বার্চ গাছ, অজস্র বৃক্ষের সমাবেশ—যেন সযত্ন-রচিত অরণ্যপ্রকৃতি। এ ছাড়া ছিল চাষবাসের জন্য বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র, কর্মনিরত পরিচারক-পরিচারিকা এবং অপরাপর কর্মীর জন্য বাসগৃহ, খামার-বাড়ীর বাসিন্দা দরিদ্র প্রজাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসগৃহ প্রভৃতি। এক দিকে ঐশ্বর্য এবং ভোগবিলাসের সীমাহীন আয়োজন, আর এক দিকে রিক্ত দারিদ্র্যের অনাবৃত জীবনরূপ।

ইয়াস্নায়া পলিয়ানার যে অভিজাত পরিবারে টলস্টয় জন্মগ্রহণ করেন সে পরিবারের ঐতিহ্য-গৌরব ছিল অনন্যসাধারণ। সে পারিবারিক ইতিহাসের শুরু ষোড়শ শতাব্দী থেকে। কারো কারো মতে সে পরিবার নাকি জার্মানি থেকে রাশিয়ায় এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। টলস্টয় নিজেও এটা বিশ্বাস করতেন। কিন্তু এ কিংবদন্তী তথ্যসম্মত নয়। পিটার দ্যা গ্রেট টলস্টয়ের পূর্বপুরুষ (পিতামহ) ইলিয়া

আন্দ্রেইভিচ্ টলস্টয়কে 'কাউন্ট' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর সন্তান কাউন্ট নিকলাই ইলিচ্ টলস্টয় (Count Nicholas Illyich Tolstoy) ছিলেন টলস্টয়ের পিতা। ইলিয়া আন্দ্রেইভিচের সংসারে ছিলেন পুত্র নিকলাই ছাড়া দুই কন্যা এবং পালিতা আত্মীয় কন্যা সুশ্রী তন্বী তাতিয়ানা—যিনি নিজে সারাজীবন অবিবাহিত থেকে নিকলাই-র সন্তানদের নিজের সন্তানবৎ প্রতিপালন করেছিলেন। লিও (লেভ্) টলস্টয়ের মায়ের অকালমৃত্যুর পর তিনি তাঁর মায়ের অভাব পূর্ণ করেছিলেন। টলস্টয়ের জীবনের ওপর মাতৃস্বরূপা এ মহিলার প্রভাব ছিল গভীর। কাউণ্ট নিকলাই প্রিন্সেস মারিয়া ভল্‌কোন্‌স্কায়াকে (Marie Volkonsky) বিয়ে করে বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক হন। তাঁদের পাঁচটি সন্তানের মধ্যে টলস্টয় ছিলেন চতুর্থ। এই অভিজাত পরিবারের ঐশ্বর্যময় বিলাস-বৈভবের মধ্যে মধ্যে টলস্টয় বেড়ে ওঠেন। তখন রাশিয়ায় দাসত্ব প্রথার শেষ পর্যায় চলছে। একদিকে আভি-জাত্যের দুর্ভেদ্য দুর্গ, আর একদিকে মেহনতী দাস শ্রেণীর (Serfs) অবর্ণনীয় দুর্দশা। সমসামায়িক সমাজ-জীবনের এই বৈপরীত্য টলস্টয়ের জীবন-দৃষ্টি পরিবর্তনে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। ঐশ্বর্যময় জীবন-পরিবেশে বিলাস-বৈভবের মধ্যে বাস করে তিনি যে ভোগাকাঙ্ক্ষার জালে জড়িয়ে পড়েন, সেই ভোগাকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধেই পরবর্তীকালে তাঁর অন্তরে সৃষ্টি হয় এক তীব্র প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া তাঁকে জীবনের গভীরে প্রবেশ করবার প্রেরণা দেয় এবং মানবাদর্শের পরম লক্ষ্য অনুসন্ধানে উদ্দীপ্ত করে। এ অনুসন্ধানের প্রত্যক্ষ ফল তাঁর চেতনার জগতে প্রথমে বিক্ষুব্ধ আলোড়ন এবং পরিণামে জীবন-সত্যের সন্ধান লাভ—যা তাঁকে ঋষিত্বের পর্যায়ে উন্নীত করে।

টলস্টয়ের জীবনের প্রথম পর্বের জীবন-দৃষ্টির সঙ্গে শেষ পর্বের জীবন-দৃষ্টির প্রভেদ আকাশ-পাতাল। ১৮৩১ এবং ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে যথাক্রমে তাঁর মাতা এবং পিতার মৃত্যুর পর তাঁর শিক্ষার ভার ন্যস্ত হয় ফরাসী শিক্ষকের ওপর। এই শিক্ষার প্রভাবে টলস্টয়ের জীবনে যে

মানসিক এবং সাংস্কৃতিক ভিত্তি রচিত হয় তা অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসীয়। ফ্যাসানবিলাসী বাস্তব-জীবনবিচ্ছিন্ন সেই সংস্কৃতি টলস্টয়ের মনে সৃষ্টি করে জীবনবিমুখ ভাবাবেগ-প্রধান বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি। সমকালীন রুশ সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঘটে পরবর্তী কালে। সে সম্পর্ক ছিল সহানুভূতিবর্জিত। ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে টলস্টয় কাজান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বার্লিনের পূর্ব দিকে অবস্থিত এই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সে যুগে খুব বড় শিক্ষাকেন্দ্র। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় গতানুগতিক শিক্ষাধারার প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন মনীষী রুশোর শিক্ষাচিন্তার প্রভাবে। পড়াশোনার চাইতে সামাজিক লোকের সম্পর্ক এ সময় তিনি বেশী ভালবাসতেন। সেণ্ট পিটার্সবার্গ (সাংকৃৎ পিতের্বুর্গ) এবং মস্কোর পরেই কাজান (Kazan) ছিল তখন রুশ ভদ্র সমাজের একটি বড় সংস্কৃতি-কেন্দ্র। এখানে যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ তিনি উপভোগ করেছিলেন পরবর্তীকালে তিনি তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। তখন থেকেই জীবন সম্পর্কে তাঁর মনে নানা প্রশ্ন জাগতে থাকে। এই সময়কার আনন্দিত দিনগুলি তাঁর রচনার ওপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে বলে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন।

গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে টলস্টয় ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা ছেড়ে ইয়াস্নায়া পলিয়ানায় এসে বসবাস শুরু করেন। উদ্দেশ্য ছিল, পৈতৃক খামারগুলির পরিচালনা এবং ভূমিদাসদের (Serfs) কাজের দেখাশোনা করা। কাজে নেমে বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হয়ে তাঁর মনে হল, আরব্ধ কাজের জন্য তাঁর কোন প্রস্তুতি নেই। ফলে তাঁর এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

ধনীর দুলাল টলস্টয় এর পর অনেকগুলি বৎসর কাটিয়ে দিলেন মস্কোতে। নাগরিক পরিবেশে বিত্তবান অবসরবিলাসী অপর যুবকদের মত যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অনিয়ন্ত্রিত জীবনস্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেন তিনি। এই ভোগময় উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের সঙ্গে সঙ্গেই চলছিল অবশ্য তাঁর আত্মসমীক্ষা এবং আত্ম-সমালোচনা।

জীবনের প্রথম থেকেই অন্তর্জগতের এই দ্বন্দ্বসংকট তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনকে শুধু চরম সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করেনি, জীবন-পরিণতিতে তাঁর চরিত্রে অগ্নিশুদ্ধ স্বর্ণদীপ্তি এনে দিয়েছিল। প্রবৃত্তি-তাড়িত জীবনে এই আত্মসমীক্ষা এবং আত্ম-সমালোচনা শুরু হয় ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে প্রারব্ধ তাঁর ডায়েরীতে। উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের সঙ্গে সঙ্গেই অগ্রসর হচ্ছিল আত্মসমীক্ষামূলক এই রচনাকর্মটি। আত্মসমীক্ষার ফলেই ভোগলালসামুক্ত জীবনের সত্যরূপ তাঁর চিত্তলোকে ক্রমে ক্রমে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠছিল। এই নবলব্ধ চেতনা প্রভাবে ভোগবাসনাময় অলস জীবন বেশীদিন তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারল না।

১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে টলস্টয়ের দ্বন্দ্বময় জীবনে একটি নতুন পৃষ্ঠা অনাবৃত হল। সে বৎসর গোলন্দাজ বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নাম লিখিয়ে চলে গেলেন তিনি ককেসাসে। সেখানকার কশাক গ্রামাঞ্চলের সৈন্য ছাউনিতে কাটতে লাগল একরঙা দিনগুলি। সে কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার দিনগুলিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হত শিকার এবং পাহাড়িয়াদের বিরুদ্ধে অভিযানের সাহায্যে। সৈনিক জীবনের এই প্রথম পর্বেই প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম গল্প Childhood ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে। এই আত্মজৈবনিক রচনাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রুশ সাহিত্যে তাঁর খ্যাতি যেন রাতারাতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। বিদগ্ধ পাঠক এই বইটির মধ্যে খুঁজে পেল ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতিবান এক অসামান্য শিল্প-স্রষ্টাকে।

টলস্টয়ের সৈনিক জীবনের খতিয়ানও উজ্জ্বল। সেনাবাহিনীতে সাহসিক কাজে কৃতিত্বের জন্য ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে কমিশন পেয়ে তিনি প্রথমে ডানিয়ুবের ধারে তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সৈন্যবাহিনীতে বদলি হলেন। সেখান থেকে সিবাস্তোপোলে। সিবাস্তোপোল দুর্গের পতনের পর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তিনি প্রেরিত হন সেণ্ট পিটার্সবার্গে (সাংকৃৎ পিতেবুর্গ)। সেখানে তাঁর জীবন আবর্তিত হত মুখ্যত সাহিত্য ও সমাজবৃত্তের মধ্যে। তবে সেখানকার সাহিত্যিকদের দাম্ভিকতা

তাঁকে আহত করত বলে সামাজিক পরিবেশে আনাগোনাই তিনি পছন্দ করতেন বেশী। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে টলস্টয় সৈন্যবাহিনী থেকে অবসর নেন।

অতঃপর টলস্টয়ের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনে আর একটি নতুন পৃষ্ঠা সংযুক্ত হল। ১৮৫৭ এবং ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে ব্যাপক ভাবে তিনি বিদেশ ভ্রমণ করেন। ফিরবার সময় নিয়ে আসেন তিনি পাশ্চাত্যের ঐশ্বর্য-মদমত্ত দাম্ভিকদের সৃষ্ট মেকী সভ্যতার বিরুদ্ধে তীব্র বিতৃষ্ণা। অতঃপর আরও একবার তিনি বিদেশ পরিভ্রমণ করেন। এর ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর মন বিষিয়ে ওঠে। মানসিক শান্তি লাভের আকাঙ্ক্ষায় ইয়াস্নায়া পলিয়ানায় এসে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

নাগরিক স্বার্থমগ্ন ভোগ-লালসাপূর্ণ জীবনের প্রতি ক্রমশ বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছিলেন টলস্টয়। পল্লী অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে এসে একটি সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায় উন্মুক্ত হল তাঁর জীবনে। সে জীবন থেকে নাগরিকতার কৃত্রিম আবরণ খসে পড়ল। কৃষক-জীবনের বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হলেন তিনি। ভূমিদাসদের সঙ্গে জমিদার শ্রেণীর বিরোধ মিটাবার জন্য রাশিয়ায় একটি নতুন আইন পাশ হয় ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে। এই আইনটির নাম Emancipation Act বা মুক্তি আইন। এই আইন অনুসারে জমিদার এবং কৃষকদের মধ্যে মধ্যস্থতা করবার জন্য একটি প্রশাসক বা ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সৃষ্টি হয়। টলস্টয় সে পদে বৃত হলেন। এই পদ গ্রহণ করে কৃষক জীবন-সমস্যার অভ্যন্তরে প্রবেশ করবার সুযোগ পেলেন তিনি। শোষিত কৃষক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতির ফলে তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি বিস্তৃত হল তাঁদের প্রতি। আভিজাত্যের খোলস ছেড়ে কৃষক জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন যোগ করে নতুন জীবনসত্যের সন্ধান পেলেন টলস্টয়।

পল্লী উন্নয়ন-প্রয়াস

শুধু রচনায় এবং বক্তৃতায় সহানুভূতি প্রকাশ নয়, পল্লী জীবনের

মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কৃষক সন্তানদের জন্য সম্পূর্ণ অভিনব ধরনের একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন টলস্টয়। শিশুদের জন্য নতুন আদর্শের পুস্তক রচনা এবং প্রকাশের ব্যবস্থাও করলেন। নব-উপলব্ধ সাম্যবাদী চেতনার অভিব্যক্তি দানের উদ্দেশ্য 'ইয়াস্নায়া পলিয়ানা' নামে একখানি পত্রিকার সম্পাদনাও শুরু করলেন তিনি। এই ব্যয়সাধ্য এবং অভিনব প্রয়াসের ভিত্তিতে ছিল সভ্যতার কৃত্রিম মানকে অস্বীকার এবং সরল প্রকৃতির কৃষক সন্তানদের স্বাভাবিক জ্ঞানের উচ্চতর মূল্যের ওপর ঐকান্তিক বিশ্বাস। এই অকৃত্রিম জীবন-প্রত্যয় উত্তরকালে তাঁর শিল্প-চিন্তার ওপরও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

অন্তর্জীবনে সংকট

টলস্টয়ের বহির্জীবনের মত অন্তর্জীবনও ছিল এ সময় খুবই দ্বন্দ্বময়। এই দ্বন্দ্বের ফলে একটি জটিল মানসিক সংকটের সম্মুখীন হলেন তিনি। এ সংকটের অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বপূর্ণ কাজ এবং বহু উৎসাহে আরব্ধ স্কুল পরিচালনার কাজ ছেড়ে দিলেন তিনি। সুদীর্ঘ পনের বৎসর অতিক্রান্ত হবার পূর্বে তাঁর এই যন্ত্রণাময় অন্তর্জীবনের সংকট পরিণামমুখী হয়নি। দীর্ঘকাল-ব্যাপ্ত যে জীবন-জিজ্ঞাসা তাঁর সমস্ত চিত্তকে অধিকার করেছিল তা হল এই : কোন পথে গেলে জীবনের পরম প্রাপ্তি ঘটবে?—সে কি ভোগের পথে, না ত্যাগের পথে? এই আভ্যন্তরীণ সংকটের সময় তাঁর জীবনে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর থেকে ষোল বৎসরের কম বয়স্কা বিদগ্ধ নাগরিক সমাজের সুন্দরী কন্যা সোফি-কে (সোনিয়া) (Sophie Behrs) ভালোবেসে বিয়ে করলেন তিনি। টলস্টয়ের দ্বন্দ্বময় জীবনে এই বিবাহ নিঃসন্দেহে আনন্দের বার্তা বহন করে এনেছিল। তবে তাঁর আত্মিক সংকটকে একেবারে দূরীভূত করতে পারেনি। কিছুকালের জন্য স্থগিত রেখেছিল মাত্র।

টলস্টয়ের সাহিত্যকর্ম

টলস্টয়ের বিচিত্রধর্মী মূল্যবান সাহিত্যকর্ম তাঁর আবর্তসংকুল

জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মনে হয় তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনবৃত্তে এ দুটি যেন একে অপরের হাত ধরাধরি করে চলেছে। অর্ধ শতাব্দীরও বেশী সময় তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিকাল বিস্তৃত। সে সাহিত্যে একজন জীবন-সচেতন মননশীল ভাবুকের জীবন-চিন্তার ক্রম-সম্প্রসারিত রূপ যে কোন মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম পর্ব (১৮৫২-১৮৭৬)

টলস্টয়ের সৃজনধর্মী সাহিত্যকর্মের প্রথম পর্বের সময়সীমা ১৮৫২ থেকে ১৮৭৬ পর্যন্ত সুদীর্ঘ চব্বিশ বৎসর কাল বিস্তৃত। সৈন্য বিভাগে কাজ করার সময় ডায়েরী রচনা থেকেই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির শুরু। বিশ্লেষণের সাহায্যে আভ্যন্তরীণ জীবনের যান্ত্রিক গঠন এবং চেতনা-প্রবাহের রহস্যময় অর্ধ-উচ্চারিত অস্তিত্বের একটা পরিচ্ছন্ন বাচনিক সংজ্ঞা নির্দেশ ছিল এই ডায়েরী রচনার লক্ষ্য। আত্মজৈবনিক পদ্ধতিতে লিখিত তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'চাইল্ডহুড' (Childhood) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সাহিত্য-খ্যাতি সমগ্র রাশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। বাস্তব ঘটনা-নির্ভর হলেও টলস্টয় সুকৌশলে এই গ্রন্থে বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার এমন সামঞ্জস্যময় মিলন ঘটিয়েছেন যে গ্রন্থখানি উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। এই সামঞ্জস্যময় সমন্বয় ছাড়াও এ গ্রন্থের অপর যে বৈশিষ্ট্য রাশিয়ার পাঠক সমাজকে তাঁর প্রতি দুর্নিবার বেগে আকর্ষণ করেছিল, তা হল লেখকের নির্মম আত্মসমালোচনা। চব্বিশ বৎসর বয়সে লেখা এই আত্মজৈবনিক গ্রন্থে লেখক অকপট স্বীকারোক্তির সাহায্যে যে আত্মপরিচয় তুলে ধরেছেন,—তা সত্যান্বেষী নির্ভীক ব্যক্তিত্বেরই পরিচায়ক। এই আত্মসমালোচনা আরও বিস্তৃত হয়েছে পরবর্তী আত্মজৈবনিক গ্রন্থ 'বয়হুড' (১৮৫৩-৫৪) এবং 'ইয়ুথ' (১৮৫৬)-এ। বাল্যকাল থেকে যৌবন পর্যন্ত যে স্খলন-পতন-ত্রুটি, আত্মগর্ব, অবিনয়, যশোলিপ্সা টলস্টয়ের ব্যক্তি-জীবনকে প্রবল ভাবে আলোড়িত করেছিল, সন্ধানী তীব্র আলোক নিক্ষেপ করে সেগুলিকে তিনি নিজে দেখেছেন এবং একান্ত বিশ্বস্ততায় পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। এই

তিনখানি আত্মজৈবনিক গ্রন্থের মধ্যে রাশিয়ার পাঠক-সমাজ আবিষ্কার করল নিপুণ শিল্পকর্মের প্রচ্ছায়ে একজন সত্যসন্ধানী মানুষকে।

এই নির্মম আত্ম-সমালোচনার সাহায্যে আত্ম-আবিষ্কারের সর্বশেষ দলিল ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'মাই কনফেশন' নামক আত্মজৈবনিক গ্রন্থ। এক দিকে স্ব-জীবনে অনুষ্ঠিত সমস্ত পাপকর্মের স্বীকৃতি, অপরদিকে পাপ-পীড়িত অন্তরের মর্মান্তিক হাহাকার এবং গভীর অনুশোচনা এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু। যে মানসিক দ্বন্দ্ব এবং আত্মিক সংকট জীবনের প্রথম থেকে তাঁকে ছায়ার মত অনুসরণ করেছে তার চূড়ান্ত রূপ টলস্টয়ের আত্মজৈবনিক শেষ গ্রন্থ 'মাই কনফেশন'। এ গ্রন্থে-টলস্টয় সম্পূর্ণ রূপান্তরিত মানুষ। জীবনের সমস্ত গ্লানি এবং দ্বন্দ্ব-সংকটের আবর্তকে পশ্চাতে ফেলে এ গ্রন্থে তিনি আধ্যাত্মিক উপলব্ধির রাজ্যে উপনীত। সমস্ত দোষ-দুর্বলতার স্বীকৃতি, পাপকর্মের জন্য অন্তরবিদীর্ণ হাহাকারের পর সত্যের উজ্জ্বল আলোকশিখা দেখে মনের বিপুল প্রশান্তি বর্ণনায় অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বলে কেউ কেউ এই মহাগ্রন্থকে সন্ত অগাস্টিনের 'কনফেশন' গ্রন্থের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই তুলনা খুবই সঙ্গত বলেই মনে হয়। এ গ্রন্থে শিল্পী-ব্যক্তিত্বকে পশ্চাতে ফেলে আত্ম-শুদ্ধ জীবন সাধকের চরিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে।

'চাইল্ডহুডে'র পরে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের বিমর্ষ অভিজ্ঞতার পটভূমিকায় লিখিত হয় 'স্কেচেস ফ্রম সেবাস্তোপোল' (১৮৫৪-৫৫)। এই গ্রন্থ টলস্টয়ের সাহিত্যখ্যাতিকে আরও বিস্তৃত করে দিল। এই রেখাচিত্র-গুলিতে মানবজীবনের আদর্শ বিষয়ে তাঁর আন্তরিক চিন্তাসমূহ সর্বপ্রথম অভিব্যক্তি লাভ করেছে। এই রেখা-চিত্রগুলি তিন ভাগে বিভক্তঃ 'সেবাস্তোপোল ইন ডিসেম্বর (১৮৫৪-৫৫)' সেবাস্তো-পোল ইন মে' (১৮৫৫) এবং সেবাস্তোপোল ইন আগস্ট' (১৮৫৫)। যুদ্ধের এই রেখাচিত্রগুলিতে নিম্নপদস্থ সাধারণ সৈনিকদের শৌর্যবীর্য, সাহস এবং সরলতার গুণগানে তিনি মুখর এবং সঙ্গে সঙ্গে উচ্চপদস্থ

সৈনিকদের স্বার্থপরতা, সংকীর্ণচিত্ততা এবং অর্থলোভকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন টলস্টয়। যুদ্ধ এবং যুদ্ধকালীন জীবন বর্ণনা টলস্টয়ের প্রিয় বিষয় হলেও এই রেখাচিত্রগুলিতে টলস্টয় যুদ্ধের ভয়াবহতা, মানুষের হিংসা প্রবৃত্তি এবং অনর্থক নরহত্যার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম লেখনী ধারণ করেন। হিংসার বিপরীত চিত্র হিসেবে এই রেখাচিত্র-গুলির স্থানে স্থানে তিনি স্থাপন করেছেন সৌন্দর্য-মাধুর্যে পূর্ণ শান্তিময় প্রকৃতিজগতকে। বোঝাতে চেয়েছেন, মানুষের প্রকৃত শৌর্য-বীর্যের পরিচয় নরহত্যায় নয়, সাহসিক আত্মোৎসর্গে। এ ছাড়া সত্যোপলব্ধির যে মহৎ প্রেরণায় টলস্টয় উত্তর-জীবনে ঋষিত্বের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, সে সত্য-উপাসনার আন্তরিক ব্যাকুলতা প্রকাশে এই রেখাচিত্রধর্মী কাহিনীগুলি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। সমকালীন রাশিয়ার মনীষী ব্যক্তিমাত্রই সত্যাদর্শের প্রতি টলস্টয়ের এই অকৃত্রিম অনুরাগকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে পরিণত শিল্পী-জীবনে টলস্টয় তাঁর মহৎ উপন্যাস 'ওয়র এণ্ড পীস'-এ হিংসাশ্রয়ী যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম এবং শান্তির অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তাকে কেন্দ্র করে মানব জীবনের যে শাশ্বত আদর্শ স্থাপন করেন, তার সূত্রগুলি বীজাকারে প্রথম দেখা দিয়েছিল ক্রিমিয়া যুদ্ধের অভিজ্ঞতাভিত্তিক এই সামরিক জীবনের রেখাচিত্রগুলিতে।

জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন : সাহিত্যকর্ম

সামরিক জীবনেও মানুষে মানুষে পার্থক্য, হিংসায় উন্মত্ত মানুষের ধ্বংসশীল প্রবৃত্তি সত্যপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ টলস্টয়কে যুদ্ধের চাকরীর প্রতি বিমুখ করে তুলল। অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় সৈন্যবিভাগের মর্যাদাপূর্ণ চাকরী ছেড়ে তিনি ফিরে এলেন জন্মভূমি ইয়াস্নায়া পলিয়ানায়। চাকরী জীবনে এবং চাকরী ত্যাগের কিছুকালের মধ্যে আরও কতগুলি গল্প-উপন্যাস রচনা করলেন তিনি। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'দি কশাক্স' (১৮৫৪) 'দি রেইড', 'দি উড

কাটিং', 'নোটস অব এ বিলিয়ার্ড মার্কার' 'টু হুসার্স, (১৮৪৬), 'এ ল্যাণ্ড লর্ড্স মর্নিং,' 'থ্রি ডেথ্স' (১৮৫৯), 'ল্যুসেন' (১৮৫৭), 'আলবার্ট' (আলর্বেৎ) এবং 'দি ফ্যামিলি হ্যাপিনেস'। এগুলির মধ্যে 'দি কশাক্স' এবং 'দি ফ্যামিলি হ্যাপিনেস' টলস্টয়ের তৎকালীন মানসিকতা এবং জীবনের সঙ্গে জড়িত বলে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। 'দি কশাক্স' উপন্যাসে ওলেনিন-এর ব্যর্থ প্রেমের বেদনার মধ্যে যে সত্য উঁকি দিয়েছে তা টলস্টয়ের সে সময়কার জীবন-উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সে উপলব্ধি হল, নাগরিক সমাজের সংস্কারাচ্ছন্ন মন নিয়ে আদিম সারল্যের প্রতিমূর্তি গ্রামীণ মনকে জয় করা যায় না। এ উপন্যাসে প্রকৃতি-প্রভাবিত জীবনেরই জয় ঘোষণা করা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সভ্য মানুষের ব্যর্থতা, নীচতা এবং বর্বরতাকেও আক্রমণ করা হয়েছে।

টলস্টয়ের জীবনে ভাবসংকট

'দি কশাক্স' উপন্যাসেই প্রথম লক্ষ্য করা গেল, টলস্টয়ের অন্তর্জীবনে একটা ভাবসংকট তীব্র আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে। তার স্বরূপ হল, একদিকে চিন্তাবিচারহীন প্রকৃতি-প্রভাবিত সাধারণ জীবন, আর একদিকে যুক্তি ও নৈতিক জীবনের দাবী—কোন দিকে যাবেন তিনি ? টলস্টয়ের অন্তর্লোকে প্রকৃতিবাদী জীবনশিল্পী এবং আদর্শবাদী চিন্তানায়ক মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। সংস্কার-প্রভাবিত অভিজাত মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় যে তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন টলস্টয়, শিল্পনৈপুণ্যের সঙ্গে তার রূপ দিলেন তিনি 'টু হুসার্স' 'লুসের্ন' 'দি থ্রি ডেথ্স' এবং 'Kholstomer' (১৮৬১) প্রভৃতি গল্প কাহিনীতে। অভিজাত শ্রেণীর প্রতি ক্ষুরধার ব্যঙ্গ এই গল্পগুলিতে প্রধান স্থান অধিকার করেছে। আত্মজৈবনিক উপন্যাস 'ফ্যামিলি হ্যাপিনেস' (১৮৫৯)-এ একটি ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের সঙ্গে গ্রথিত হয়েছে। পরবর্তীকালে ব্যর্থ প্রেমের ট্র্যাজেডি রচনায় টলস্টয় যে অনন্যসাধারণ শিল্প-প্রতিভার পরিচয় দেন তার প্রথম হাতে খড়ি হয় এই 'ফ্যামিলি হ্যাপিনেস' উপন্যাসে।

টলস্টয়ের সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্যায়ের প্রায় সমস্ত রচনাই ব্যক্তিধর্মী। তবে জীবনচিন্তাশীল অন্তর্দর্শী চরিত্রেরও যে একেবারে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, এমন নয়। ওলেনিন এ ধরনের একটি চরিত্র। এ চরিত্রে টলস্টয়ের এই সময়ের জীবন চিন্তা শুধু নয়, জীবনই যেন প্রতিবিম্বিত। 'বয়হুড্' এবং 'ইয়ুথ'-এ (১৮৫৪, ৫৭) উপস্থাপিত অনেকগুলি চরিত্র টাইপ চরিত্র মাত্র। এই চরিত্রগুলির মধ্যে দেখা যায় কার্যকারণের মনঃসমীক্ষাগত যান্ত্রিকতা এবং ব্যক্তিত্ববোধের অস্তিত্বহীনতা। উদাহরণ স্বরূপ 'সেবাস্তোপোলে'র গল্পগুলির (১৮৫৫) উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কথা বলা যেতে পারে—যেখানে টলস্টয় ভয় এবং সাহসিকতার অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করেছেন মাত্র।

সাহিত্য জীবনের দ্বিতীয় পর্ব

সৃজনশীল সাহিত্যকর্মে টলস্টয় সব চাইতে বেশী সক্রিয়তা দেখিয়েছিলেন তাঁর সাহিত্য জীবনের দ্বিতীয় পর্বে। চৌত্রিশ বৎসর বয়সে ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুন্দরী আঠারো বৎসরের বিদূষী সোফিয়া বের্সকে বিয়ে করার পর তাঁর মানস-জগতে উল্লেখ্য পরিবর্তন ঘটে। তাঁর উদ্দাম অংসযত প্রবৃত্তি অনেকটা শান্ত হয়ে আসে। একজন দায়িত্বশীল গৃহস্থে পরিণত হন তিনি এই সময়ে। প্রিয় স্ত্রী সোফিয়া এবং তেরটি সন্তানের মধ্যে জীবিত ছয় জনের প্রতি তিনি ছিলেন পরম অনুরক্ত। (তের জনের মধ্যে ৭ জন মারা যায়। জীবিত ছিল চার পুত্র দুই এই কন্যা—এই ছয়জন)। পুত্রকন্যা, দাসদাসী এবং আশ্রিত-পরিজন নিয়ে টলস্টয় রীতিমত সাংসারিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর আভ্যন্তরীণ জীবন-সংকট স্বতঃস্ফূর্ত জীবন-পিপাসায় ক্রমশ শান্ত হয়ে এল। দাম্পত্য জীবনের শান্ত পরিবেশে তাঁর জীবনদর্শন হল: প্রত্যেক মানুষকে এমন ভাবে বাঁচতে হবে যাতে সে নিজের এবং পরিবারের জন্য বেশী কর্তব্য করতে পারে। জীবন এবং প্রকৃতি থেকে অধিকতর বিজ্ঞ হবার চেষ্টা মানুষ যেন না করে।

এই জীবন-দর্শন পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে 'ওয়র এণ্ড পীস'-এ। এই মহাকাব্যোপম ক্লাসিকধর্মী উপন্যাস রচনা শুরু হয় ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে। উপন্যাসখানি ছয় খণ্ডে সমাপ্ত। পৃষ্ঠা সংখ্যা অন্যূন দুই হাজার। বারবার কাটছাট এবং পরিমার্জনার পর লেখা সমাপ্ত হয় ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে। এই মহৎ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকর্মে সহায়তা করেছিলেন বিদূষী পত্নী সোফিয়া। নিজেও লেখিকা ছিলেন বলে আনন্দিত মনে স্বামীর এই পরিশ্রমসাধ্য সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করেছিলেন তিনি।

বিয়ের পর টলস্টয় বহু বছর ইয়াস্নায়া পলিয়ানায় পরম সুখ-সমৃদ্ধির মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেন। ঐশ্বর্যপূর্ণ পৈতৃক বাসগৃহ তাঁর সাহিত্যযজ্ঞের সাধনপীঠ হয়ে ওঠে। বৈচিত্র্যের জন্য বৎসরের কোন কোন সময় তিনি মস্কোতে কিংবা ভল্‌গার অপর পারে নিজের জমিদারিতে বাস করতেন। জমিদারির ও ক্রমবর্ধমান কৃষিকর্মের আয় এবং প্রকাশিত বইগুলির রয়ালটি থেকে এ সময় এত বেশী পরিমান অর্থ তাঁর হাতে আসছিল যে স্বচ্ছলভাবে পরিবার প্রতিপালনে তাঁর কোন ভাবনাই ছিল না। শান্তিপূর্ণ গৃহপরিবেশে, প্রেমময়ী পত্নীর উষ্ণ অন্তরের সান্নিধ্যে সাময়িকভাবে আভ্যন্তরীণ জীবন-সংকটমুক্ত টলস্টয় বিস্তৃত দেশ-কাল এবং ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পটভূমিকায় 'ওয়র এণ্ড পীস'-এর মত বৃহদায়তন যে উপন্যাস রচনা করেন তা শুধুমাত্র রুশ সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর উপন্যাস-জগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে সর্বজন-স্বীকৃত। মতান্তরের অবকাশ থাকলেও টলস্টয়ের কোন কোন সমালোচক 'ওয়র এণ্ড পীস'-কে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। বস্তুতপক্ষে ভয়াবহ সামরিক রণাঙ্গন এবং শান্তরসাস্পদ গৃহাঙ্গনের পটভূমিকায় এত সার্থক উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিল্পকর্ম টলস্টয়ের সমগ্র সাহিত্যে আর নেই।

উপন্যাসে মননশীলতা : ওয়র এণ্ড পীস

যে আভ্যন্তরীণ জীবন-সংকটের সংঘাতে টলস্টয়ের মন ক্রমশ

পীড়িত হচ্ছিল, তার প্রথম মুক্তি ঘটে ক্লাসিকধর্মী উপন্যাস 'ওয়র এণ্ড পীস'-এ। সাত বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে টলস্টয় এই মহা-উপন্যাস রচনা সমাপ্ত করেন। ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে সাম্রাজ্যলোলুপ নেপোলিয়ানের বর্বর আক্রমণে রাশিয়ার জনজীবনে যে প্রচণ্ড বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়, তার বিক্ষুব্ধ পটভূমিকায় রচিত হয় এই মহৎ উপন্যাস। এই বৃহদাকার উপন্যাসে সংহত রূপ পেয়েছে রাশিয়ার সমাজ, তার যুদ্ধ, অজস্র মানুষ এবং ইতিহাস। শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবন-চিন্তা এই উপন্যাসে সমাজ, দেশ এবং বৃহত্তর মানবহিত-চিন্তার বেগবান স্রোতে প্রবাহিত। তথ্য, তত্ত্ব, ব্যক্তি, যুগ, দর্শন—সমস্ত কিছুর সমন্বয়ে বিচিত্র মানবজীবনের ঐকতান সৃষ্টি হয়েছে এই উপন্যাসে। পররাজ্যলোভীর বর্বর আক্রমণে একটি বিধ্বস্ত দেশের চিত্র এই উপন্যাসে যেমন বিশ্বস্ত সজীবতায় অঙ্কিত হয়েছে, তেমনি মানবজাতির উজ্জীবন স্বপ্নে বিভোর লেখকের ব্যক্তিমনেরও প্রক্ষেপ ঘটেছে এই উপন্যাসে। লেখকের অন্তরে নব-উন্মেষিত নীতিবাদও এই উপন্যাসে প্রথমে সার্থকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হলে অভিজাত সমাজ-নির্যাতিত কৃষকও যে বিদ্রোহচেতনার পরিচয় দিতে পারে, সে অভাবিত সত্যকেও লেখক শিল্পরূপ দিয়েছেন এই উপন্যাসে। বিপ্লবী সাম্যবাদী নেতা লেনিন বলেছেন, টলস্টয়ের এই কৃষক বিদ্রোহের চিত্র রাশিয়ার মানবতাবিরোধী ভূমিদাস-প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র ইন্ধন জুগিয়েছিল। বিদ্রোহী কৃষকদের এবং বিপ্লবী নিহিলিস্টদের প্রতি নৈতিক সমর্থন জানানোর জন্য টলস্টয় অত্যাচারী জারের কোপে পড়েন। যে সংগঠিত চার্চ জারের স্বৈরতন্ত্রের সমর্থক, সে চার্চকও প্রকৃত খ্রীস্টধর্ম-বিরোধী বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। এ কারণে প্রচলিত চার্চের কর্তারা টলস্টয়ের ওপর খড়গহস্ত হয়ে ওঠেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সমাজজীবনে মানুষে মানুষে পর্বতপ্রমাণ পার্থক্য টলস্টয়ের মানবপ্রেমিক অন্তরকে এই সময় এত গভীরভাবে আলোড়িত করে যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে তিনি চৌর্যের সামিল বলে

অনুভব করেন। নিজে অগাধ সম্পত্তির মালিক বলে তিনি নিজেকেও আত্মসমালোচনা থেকে রেহাই দেননি। মানবসাম্যের এই মহান উপলব্ধি তাঁকে ব্যক্তিগত বিপুল সম্পত্তির মোহ ত্যাগে অনুপ্রাণিত করেছিল। 'ওয়র এণ্ড পীস' উপন্যাসে দেখা যায়, পিটার নামক চরিত্রটি তাঁর অর্থলোলুপ প্রথমা পত্নীকে স্বেচ্ছায় জমিদারির অর্ধেক অংশ লেখাপড়া করে দিয়েছেন।

ওয়র এণ্ড পীস-এ টলস্টয়ের সাহিত্যিক বাস্তবতাবোধ চরম লক্ষ্যে উপনীত। এই বাস্তবতাবোধ সত্যবোধেরই নামান্তর। উপন্যাসের বৃহৎ সংখ্যক চরিত্রের কোনটি অস্পষ্ট নয়—সব চরিত্রই সজীব রক্তমাংসের মানুষ বলে মনে হয়। শুধু বহির্জগতে সে মানুষগুলির অস্তিত্ব অনুভূতিবেদ্য। স্ত্রী চরিত্রগুলি বিশেষ তৎপর্যপূর্ণ। উপন্যাসের কেন্দ্রবর্তী চরিত্র নাটাশা। এই চরিত্রে টলস্টয়ের জীবনদর্শন বাস্তব চেতনায় প্রতিফলিত। বাস্তবপক্ষে এ চরিত্র যেন মানবজাতির স্বভাবভিত্তিক চেতনাজগতের কেন্দ্রীভূত সারাংশ। পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলির মত এই উপন্যাসে লেখকের ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ স্থূল নয়। প্রিন্স আনদ্রে এবং পিয়েরী নামে দুটি ব্যক্তিনিরপেক্ষ চরিত্রে লেখকের সত্তা রূপান্তরিত হয়েছে। রুশীয় এবং ইউরোপীয় ইতিহাসের বিস্তৃত পটভূমিকায় বহু চরিত্রের সমাবেশে উপন্যাসটি যেন শিল্পে রূপান্তরিত বাস্তব জীবনের দর্পণ। নির্যাতিত জীবনের ভয়াবহতা এই উপন্যাসে নির্মম বাস্তবতায় প্রতিবিম্বিত হলেও মানবপ্রেমিক শিল্পীর আশাবাদের চিহ্নও এখানে স্পষ্ট। মানব জীবনের ওপর জীবন-দেবতার মঙ্গলময় প্রভাব উপলব্ধির ফলে জীবনের সেই ভয়াবহতা পশ্চাদ্‌পটে পড়ে গেছে। এই মহান উপন্যাস রচনা কালেই মঙ্গলচেতনায় উদ্বুদ্ধ টলস্টয়ের জন্মান্তর ঘটে। কৃষক এবং ভূমিদাসদের শ্রমনির্ভর কঠোর জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে মিশিয়ে দিলেন তিনি। কায়িক শ্রম তাঁর সুখলালিত জীবনে প্রথমে অসহ্য মনে হলেও ক্রমে ক্রমে তিনি সয়ে নিলেন। প্রেম নির্ভর জীবনই যে সৎ,

শোষণহীন আদর্শ জীবনের প্রতিনিধি—এই মহৎ উপলব্ধি তাঁর ভাববিক্ষুব্ধ অন্তরে এনে দিল পরম প্রশান্তি। 'ওয়র এণ্ড পীস' আধুনিক প্রগতিবাদী জীবন-চেতনায় উদ্বুদ্ধ উপন্যাসের আকারে মহাকাব্য।

'ওয়র এণ্ড পীস'-এর পর পিটার দ্যা গ্রেটকে নিয়ে আর একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা শুরু করেও টলস্টয় শেষ করতে পারেননি। এই অসামর্থ্যের কারণ, উপন্যাসের প্রস্তাবিত নায়কের প্রতি তাঁর অন্তরে জাগ্রত অপ্রতিরোধ্য বিরাগ।

মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস : আনা কারেনিনা

ওয়র এর পীস-এর পরে টলস্টয়ের শিল্পীসত্তার মহত্তম প্রকাশ ঘটে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'আনা কারেনিনা'য় (Anna Karenina)। এই উপন্যাস আত্মপ্রকাশ করে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে। নারী মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম রহস্য উদ্‌ঘাটনে, নিয়তি-তাড়িত জীবনের সকরুণ ট্র্যাজেডি বর্ণনায় এই উপন্যাস বিশ্বসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই উপন্যাসে ভোগী অভিজাত সমাজ এবং মাটির কাছাকাছি কর্মক্লিষ্ট অথচ প্রশান্তিময় কৃষক জীবনের বিপরীত চিত্র যে অনন্যসাধারণ সহানুভূতি এবং নৈপুণ্যের সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে তা যেন টলস্টয়ের দ্বিধাবিভক্ত মনেরই বাস্তব আলেখ্য। যে আভ্যন্তরীণ জীবন-সংকটের যন্ত্রণায় টলস্টয়ের মন ছিল বহুকাল পীড়িত, সে যন্ত্রণামুক্ত নতুন জীবনের হাতছানি দেখা যায় এই উপন্যাসের শেষাংশে। লেখক যেন বলতে চেয়েছেন, প্রবৃত্তি-তাড়িত জীবনে যে তীব্র জ্বালা সঞ্চারিত হয় তার দহন অনির্বাণ। অপরপক্ষে জীবনে অনবিল শান্তি লভ্য—প্রকৃতির সান্নিধ্যে, কায়িক শ্রমসাধ্য কৃষিকর্মে এবং ঈশ্বরের নিকট ঐকান্তিক আত্মসমর্পণে। আনা কারেনিনায় আনা—ভ্রেন্‌স্কির প্রবৃত্তি-তাড়িত উদ্দাম জীবনযাত্রার বিপরীতে শ্রমজীবী কৃষক লেভিন এবং তাঁর স্ত্রীর শান্তিময় পরিতৃপ্ত জীবনের আলেখ্য অংকন করে মনীষী উপন্যাসিক টলস্টয় যেন এই ইঙ্গিতই দিতে চেয়েছেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে লিখিত বহুজন-নন্দিত 'ওয়র এণ্ড পীস' এবং 'আনা কারেনিনা'য় টলস্টয়ের শিল্পী-জীবনের শুধুমাত্র মহত্তম অভিব্যক্তি ঘটেনি-বিপুল খ্যাতি-প্রতিপত্তির সঙ্গে এই উপন্যাস দুখানি তাঁকে প্রচুর অর্থও এনে দিয়েছিল। টলস্টয় এখন কেবলমাত্রে রাশিয়ায় নয়, অনুবাদের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের জনপ্রিয় উপন্যাসিক। বিবাহের কুড়ি বৎসরের মধ্যে বইয়ের রয়ালটি বাবদ লক্ষ লক্ষ রুবল অর্জিত হওয়ায় পারিবারিক জীবনে টলস্টয়ের সুখ-সমৃদ্ধির আর সীমা রইল না। এই অতিরিক্ত আয় ছাড়াও তাঁর বিশাল জমিদারির এবং কৃষি খামারের আয় তো ছিলই। সামাজিক স্থিতির দিক থেকে টলস্টয় রাশিয়ার বিত্তবান সমাজে একটি অগ্রগণ্য আসনের অধিকারী হলেন।

ব্যক্তিত্বের সংকট এবং জীবনে রূপান্তর

ঐশ্বর্য বিত্ত সুখ সম্পদের উচ্চ শীর্ষে আরোহণ করেও টলস্টয়ের মনে কিন্তু শান্তি নেই। বিশ্বজোড়া সাহিত্যিক খ্যাতি-প্রতিপত্তি তাঁর অশান্ত মনে তৃপ্তি দিতে পারল না। সত্তরের দশকের দিকে তাঁর মানসিকতায় যে শুধুমাত্র দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন ঘটল তা নয়, বিরাট ভূমিকম্পের মত একটা গভীর পরিণামমুখী ব্যক্তিত্বের সংকটও তাঁর সমগ্র সত্তাকে আলোড়িত করল। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের দিকে যে চিন্তাবিচারহীন সুখসমৃদ্ধ পারিবারিক জীবন যাপনে তিনি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, সেই জীবন সম্পর্কে ক্রমশ বড় রকমের অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন টলস্টয়। মৃত্যুচিন্তা অপ্রতিরোধ্য আবিষ্টতায় তাঁর মন অধিকার করল। জীবনে ধর্মনৈতিক সার্থকতার জন্য একটা আবেগাকুল আকাঙ্ক্ষা অনুভব করলেন তিনি। প্রথমে রক্ষণশীল বিশ্বাসের দিকে ঝুঁকলেন। কিন্তু তাঁর যুক্তিবাদী মন প্রচলিত ধর্মের নিয়ম-নীতি, উপবাস প্রভৃতি গ্রহণ করতে পারল না। চার্চের প্রথাসিদ্ধ ধর্মকে তিনি অস্বীকার করলেন। গসপেলের মর্মার্থ মন্থন করে গড়ে তুললেন নতুন খ্রীস্টধর্ম। নবপরিকল্পিত এই ধর্মমতবাদ থেকে আধিভৌতিক এবং অনৈতিক উপাদান ছেঁটে দিলেন। অনুভব

করলেন, খ্রীস্টের পরম বাণী বিধৃত নিম্নলিখিত কথাগুলির মধ্যে (ম্যাথু ৫, ৩৯): 'মন্দকে তুমি বাধা দিও না।' এই অপ্রতিরোধ মতবাদ পরবর্তীকালে Tolstoyism নামে পরিচিতি লাভ করে।

টলস্টয়ের জীবনীকারেরা বলেন, বিপুল ঐশ্বর্যময় পারিবারিক সুখশান্তিপূর্ণ জীবন থেকে বৈরাগ্যময় ধর্মজীবনের দিকে মোড় নেবার পটভূমিকায় আছে সত্তরের দশকে রাশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের ক্যারালিয়েফ নামক গ্রামে তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। সেই গ্রামের অধিবাসী ধর্মভীরু মোলোচানদের বাইবেল-প্রচারিত সহজ খ্রীস্টধর্মপ্রীতি তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। এই মোলোচানেরা চার্চের আনুষ্ঠানিক খ্রীস্টধর্মে ছিল বিশ্বাসহীন। ধর্মবিশ্বাসের মত তাঁদের জীবনধারাও ছিল সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। এদের বাহুল্যহীন জীবনের সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকেই টলস্টয়ের জীবন থেকে জাগতিক সুখ-সম্ভোগ এবং খ্যাতি লাভের মোহময় আবরণ ক্রমশই খসে পড়ল। দুর্নিবার বেগে তাঁর মন আকৃষ্ট হল সর্বমোহমুক্ত সহজ মানবধর্ম এবং ঈশ্বরের প্রতি। যীশুর সরল জীবন, সত্যলাভের জন্য সর্বদুঃখ বরণ এবং জীবন বিসর্জন টলস্টয়ের অনুভূতিশীল মনের ওপর বিস্তার করল অনতিক্রমণীয় প্রভাব। জীবনে পরোৎকর্ষ লাভের জন্য বাইবেলোক্ত যীশুর পাঁচটি নির্দেশ (অক্রোধ, অনাসক্তি, ধৈর্য, অপ্রতিরোধ এবং নির্বিশেষ করুণা) অনুসরণ তখন থেকে টলস্টয়ের প্রধান কৃত্য হয়ে দাঁড়াল।

টলস্টয়ের অন্তর্জীবনের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল তাঁর সাহিত্যধর্মেরও রূপান্তর। সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল কল্পনাপ্রবণ শিল্পী ক্রমশ রূপান্তরিত হলেন জীবনের পরম সত্যসন্ধানী জীবন-শিল্পীতে। টলস্টয়ের জীবনে রূপান্তরের দুটি স্তর অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রথম, দেহধর্মী জীবনচেতনা সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক নৈরাশ্য এবং বিরাগ; দ্বিতীয়, একান্তভাবে রাহস্যিক এবং অপ্রকাশ্য জীবন-অভিজ্ঞতাকে যুক্তিবাদী এবং পারম্পর্যযুক্ত মতবাদে পরিণত করবার পরবর্তী প্রয়াস। 'এ কনফেশন' (১৮৭৯-তে লিখিত, ১৮৮২-তে

সংশোধিত এবং ১৮৮৪-তে প্রকাশিত) বইখানিতে টলস্টয় তাঁর গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বময় ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক কাহিনী অকপটে বিবৃত করেছেন—যা পূর্বেই উল্লেখিত। এ ছাড়া টলস্টয়ের প্রাথমিক এবং উল্লেখযোগ্য নৈরাশ্যের স্তরটি প্রচণ্ড শক্তিমত্তার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে খণ্ডিত একটি গ্রন্থে—যা তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়—The Memoirs of a Madman (১৮৮৪) নামে। The Death of Ivan Illyich (১৮৮৬) এবং Master and Man (১৮৯৫) নামক বৃদ্ধকালে রচিত কল্পনানির্ভর দুটি উল্লেখ্য রচনার ভিত্তিতেও সেই একই অভিজ্ঞতা।

এ সমস্ত ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতাভিত্তিক রচনা ছাড়াও ১৮৮০ থেকে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে টলস্টয়ের সৃষ্টিধর্মী রচনার মধ্যে পড়ে 'হাউ ম্যাচ ল্যাণ্ড এ ম্যান নীড্স্' (১৮৮৬) নামক গল্প-সংগ্রহ, ১৮৮৬ তে প্রকাশিত 'দি পাওয়ার অব ডার্কনেস' নামক বিখ্যাত নাটক, ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'দি ক্রয়ট্জার সোনাটা' নামক উপন্যাস, ১৮৮৬-তে প্রকাশিত 'দি ফ্রুট্স অব এনলাইটেনমেন্ট' নামক নাটক, ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে 'দি ডেভিল' (উপন্যাস) এবং ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'রেজারেকশন' নামে বিখ্যাত উপন্যাস। শেষ পর্যায়ের এই সমস্ত গল্প, উপন্যাস এবং নাটকে টলস্টয় ভোগাকাঙ্ক্ষাময় অশুভ প্রবৃত্তির ওপর সন্ধানী আলো নিক্ষেপ করেছেন—এটা সত্য ; কিন্তু এই অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন-দৃশ্য প্রতিফলনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল অন্ধকারের ওপারে আলোকিত জীবনরূপকে ফুটিয়ে তোলা।

'দি ডেথ অব ইভান্ ইলিচ' নীতিগর্ভ উপন্যাস হলেও জীবন-বাস্তবতা বা আদর্শবর্জিত নয়। ক্যান্সার রোগাক্রান্ত ইভান ইলিচ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ফেলে-আসা জীবনের ওপর দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন। সে দৃষ্টি মোহমুক্ত, সত্যসন্ধানী। মৃত্যুর পূর্বে সে দৃষ্টির সাহায্যে তিনি অনুভব করেছেন, সযত্ন পরিকল্পনায় জীবনকে যেভাবে তিনি সাজিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন—তা স্বার্থমগ্ন ও অর্থহীন। উপন্যাসের আবহকে বিষণ্ন করে তুলেছে ব্যাধিভাবনা ও মৃত্যুচিন্তা। উপন্যাসে পরিব্যাপ্ত লেখকের বিমর্ষ জীবনচিন্তা সত্ত্বেও অতি-তীক্ষ্ণ

সমাজ-সমালোচনা উপন্যাসের বাস্তব ভিত্তি রচনার সহায়ক হয়েছে। 'ক্রয়টজার সোনাটা' মুখ্যত প্রেমোপন্যাস হলেও বিবাহ সম্পর্কে টলস্টয়ের ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে শিল্পরূপ দেওয়া হয়েছে এই উপন্যাসে। পরিণীতা নারীর জীবন অপেক্ষা কুমারী-জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হয়েছে এ উপন্যাসে। মনে হয়, এই মনোভাব বাইবেলের প্রভাবজাত। বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে এ উপন্যাসে যে তীক্ষ্ণ সমালোচনা দেখা যায় তা নারী-বিদ্বেষী দার্শনিক সোপেনহাওয়ারের প্রভাবজাত হওয়াও অসম্ভব নয়। ব্যক্তিগত উপলব্ধির শিল্পরূপ হিসেবে ক্রয়ট্জার সোনাটার উৎকর্ষ বহুজন-স্বীকৃত।

কেউ কেউ মনে করেন, 'দি ডেভিল' এবং 'দি পাওয়ার অব ডার্কনেসের' ঘটনাবৃত্তের সঙ্গে টলস্টয়ের স্ব-জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য আছে। এই উপন্যাস এবং নাটক মানুষের দুর্নিবার লালসা ও লাম্পট্যের কাহিনী-কেন্দ্রিক। যৌন অনুভূতির চিত্রায়ণ এই উপন্যাস ও নাটকের প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। উভয় ক্ষেত্রেই নারীকে দেখানো হয়েছে পুরুষের অনির্বাণ কাম-লালসার সামগ্রী হিসেবে। স্বেচ্ছাচারী জীবনে নারীকে উপভোগ করার পর তার শেষ চিহ্ন পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন করে দেবার সাহায্যে নাটকটিতে যে 'মবিড' পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, টলস্টয়ের খুব কম রচনাতেই তা লক্ষ্য করা যায়। তবে নাটকে নারীদেহ-লোভাতুর লম্পটের মনে যে পাপবোধের প্রকাশ ঘটেছে, উপন্যাসে সে অনুভূতির অস্তিত্ব অপেক্ষাকৃত কম। অনেকের ধারণা, টলস্টয়ের প্রাক্-বিবাহ জীবনের উচ্ছৃঙ্খল যৌন-জীবনের সঙ্গে 'দি ডেভিলের' সাদৃশ্য থাকায় জীবৎকালে উপন্যাসখানি তিনি লুকিয়ে রেখেছিলেন। সেটি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে।

শিল্পী-জীবনে নবজন্ম

টলস্টয়ের শিল্পী-জীবনে নবজন্মের সূচনা হয় ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে। যে জটিল আত্মিক এবং আধ্যাত্মিক সংকট ইতিপূর্বে তাঁর অশান্ত অন্তরকে প্রবল ভাবে আলোড়িত করে তুলেছিল, সে সংকট থেকে মুক্তি খুঁজে পেলেন তিনি আতপদগ্ধ অন্তরের

অনুশোচনায়। এই অগ্নিশুদ্ধ শিল্পী-জীবনের ব্যাপ্তিকাল টলস্টয়ের মৃত্যুর পূর্বকালীন শেষ ত্রিশ বৎসর। এই কালের জীবনচেতনা পূর্ববর্তী পঞ্চাশ বৎসরের জীবনবোধ থেকে পৃথক। এই পর্বে তাঁর আত্মশুদ্ধ জীবন-উপলব্ধি পরিণত শিল্পরূপ পেয়েছে 'রেজারেকশন' উপন্যাসে (প্রকাশকাল ১৮৯৯—১৯০০)। কোন কোন সমালোচকের মতে টলস্টয়ের সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে রেজারেকশনের স্থান সর্বোচ্চে। এ উপন্যাসে সুতীক্ষ্ণ সমাজ সমালোচনা, সুপরিব্যাপ্ত এবং সুগভীর মানবপ্রেম সজীব চেতনায় যে মননশীল শিল্পরূপ লাভ করেছে টলস্টয়ের অপরাপর উপন্যাসে তা দুর্লভ। ব্যাপক জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ টলস্টয় এ কাহিনী সৃষ্টিতে শিল্পীমাত্র নন, জীবনের তত্ত্বসন্ধানী নীতিবাদী দার্শনিকও। জীবনের চরম সার্থকতা কি ভোগে, না যন্ত্রণাবিদ্ধ অনুতাপ ও আত্মশুদ্ধিতে?—এই প্রশ্নাত্মক জীবন-চিন্তা নতুন চেতনার জগতে জাগ্রত করেছে 'রেজারেকশন'-এর পরিণত শিল্পী টলস্টয়কে। অনুতাপের হোমানলে দগ্ধ নায়ক নেখল্যুদভের নবজন্মের কাহিনী বিবৃত হয়েছে এই ক্লাসিকধর্মী উপন্যাসে। নেখল্যুদভের চরিত্রে টলস্টয়-জীবনের আত্মপ্রক্ষেপ ঘটেছে—টলস্টয়ের কোন কোন জীবনীকার এবং সমালোচকের এই ধারণা যুক্তিহীন নয়। এ উপন্যাসে টলস্টয় প্রবৃত্তি-তাড়িত জীবনকে অস্বীকার করেন নি, তবে সে জীবনকে চরম মর্যাদা দেন নি। ভোগাকাঙ্ক্ষাপঙ্কিল জীবনের ঊর্ধ্বে যন্ত্রণাবিদ্ধ আত্মশুদ্ধ জ্যোতির্ময় জীবনের আভাস দিয়ে 'রেজারেকশন' উপন্যাসে তিনি যে সামগ্রিক জীবনবোধের সন্ধান দিয়েছেন, সেই গভীর জীবন-চেতনাই 'রেজারেকশনে'র শ্রেষ্ঠত্বের মূলে। De Tocquerille-এর মত টলস্টয়ও যেন এ উপন্যাসে বলতে চেয়েছেন,—Remember that life is neither pain nor pleasure ; it is serious business, to be entered upon with courage and in a spirit of self sacrifice.

এই মহত্তম জীবনবোধের জন্য কোন কোন সমালোচক 'রেজা-রেকশন'-কে শিল্পসৃষ্টি হিসেবে 'ওয়র এণ্ড পীস' থেকেও উচ্চতর স্থান দিয়ে থাকেন।

রেজারেকশনের পূর্বে লিখিত কয়েকটি কাহিনী এবং নাটকেও টলস্টয়ের তীব্র তীক্ষ্ণ সমাজ-সমালোচনা প্রবল আবেগে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কৃষক-জীবনভিত্তিক নাটক 'পাওয়ার অব ডার্কনেস'-এর কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'ফ্রুটস অব এনলাইটেনণ্ট' মিলনান্তিকায় সমাজের খেপামিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'দি লিভিং কর্পস' নাটকে সমাজের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার উত্থিত হয়েছে। 'ফাদার সিয়েগি' 'দি ফলস্ কুপন' এবং 'হাজি মুরাৎ (মৃত্যুর পর ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত) ছিল তাঁর বৃদ্ধ বয়সের প্রিয় সৃষ্টি এবং এগুলি ছিল তাঁর বিবেচনায় সৎ-শিল্পের উদাহরণ। এ ধরনের সৃষ্টি উচ্চতম ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত না করলেও ভ্রাতৃত্ববোধের জগতে নিশ্চিত আবেদন সৃষ্টি করবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

সাহিত্য সৃষ্টির শেষ পর্যায়ে টলস্টয় যে নীতিবাদী আদর্শ -প্রচারক তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু নাটকে, উপন্যাসে, ছোটগল্পে তাঁর বাস্তব জীবনবোধ ছিল বরাবরই অব্যাহত। ধর্মীয় বিশ্বাসগত বিশুদ্ধিবাদকে উত্তরকালের শিল্পসৃষ্টিতে প্রাধান্য দিলেও যৌন চেতনার অনিবার্য বাস্তবতাকে তিনি কখনও অস্বীকার করেন নি। এই জীবন-বাস্তবতার ঐকান্তিক স্বীকৃতির জন্যই শিল্পী-জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত রচিত তাঁর গল্প-উপন্যাসের আবেদন ছিল সজীব।

ছোটগল্প

ছোটগল্প রচনায়ও টলস্টয়ের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। তাঁর অধিকাংশ ছোটগল্প রচিত হয় সাহিত্যজীবনের প্রথম এবং শেষ পর্বে। 'দি রেইড' 'দি উড কাটিং' 'টু হুসার্স' 'এ ল্যাণ্ড্লর্ডস মর্নিং' 'ল্যুসের্ন' 'আলবার্ট' (আল্বের্ৎ) প্রভৃতি ছোটগল্প তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বে যথেষ্ট খ্যাতি আনয়ন করে। তবে শেষ পর্যায়ে লিখিত 'টুয়েন্টি থ্রি টেল্স' ছোটগল্পকার হিসেবে টলস্টয়কে অবিস্মরণীয় খ্যাতির অধিকারী করেছে। এই গল্পগুলি মুখ্যত নীতিধর্মী, বাইবেলের গল্পগুলির (প্যারাবেল) আদর্শে অতি সহজ সরল ভাষায় লিখিত।

গল্পগুলির মূল উপাদান শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিন জীবন। শ্রমজীবী জীবনকেন্দ্রিক এই নীতিধর্মী গল্পরচনার প্রেরণার উৎসেও ছিল জনগণ-কল্যাণ। সহজ ভঙ্গীতে সরল জীবন নিয়ে উপদেশমূলক গল্প রচনা করায় টলস্টয় অনেকের নিকট সমালোচনার শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, জটিল জীবন-সমস্যামূলক উপন্যাসে উত্তুঙ্গ শিল্পপ্রতিভার পরিচয় দিয়ে উত্তরকালে রচিত নীতিধর্মী ছোটগল্পগুলিতে টলস্টয় সমুচ্চ শিল্পমান থেকে বিচ্যুত হয়েছেন।

এ সমস্ত বিরূপ সমালোচনাই খুব সম্ভব পরিণত জীবনশিল্পী টলস্টয়কে শিল্পের স্বরূপ এবং মান সম্পর্কীয় বিস্তৃত আলোচনায় প্রণোদিত করে। সুদীর্ঘ পনের বৎসর কাল শিল্পের স্বরূপ সন্ধানে তিনি পাশ্চাত্যের সাহিত্য-শিল্প এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগৎ মন্থন করেন। শিল্পের সর্বজন গ্রাহ্য মান কি হওয়া উচিত—এ জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় তিনি ক্লান্তিহীন উদ্যমের পরিচয় দেন। এই অবিচ্ছিন্ন প্রয়াসের ফলে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কীয় গ্রন্থ "হোয়াট ইজ আর্ট ?" (What is Art ?)। এই গ্রন্থ পৃথিবীর শিল্পতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিল্পতত্ত্ব বিষয়ে বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনার জন্য গ্রন্থখানি যথাযথ রূপে রাশিয়ায় প্রকাশের সুযোগ পায়নি। প্রতিক্রিয়াশীল সরকারী আধিকারিক টলস্টয়ের অনেক মূল্যবান মতামত সেন্সারশিপের কাঁচি চালিয়ে ছেঁটে দেয়। টলস্টয় মর্মাহত হন। পরে অবশ্য টলস্টয়ের অবিকৃত মতামত সহ এইখানি অনুবাদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং মৌলিক চিন্তার জন্য পৃথিবীর শিল্পামোদী মহলে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। এইলমার মড্ কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত বইখানি লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রী হয়। পাঠকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য বারে বারে বইখানির পুণ-মুদ্রণের প্রয়োজন হয়। এই গ্রন্থধৃত টলস্টয়ের নীতিবাদী এবং লোকহিতবাদী শিল্পাদর্শ কলাকৈবল্যবাদী শিল্পরসিক মহলে তীব্র সমালোচনার বস্তুতে পরিণত হয়। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী বলে বহু-সমালোচিত টলস্টয়ের শিল্পা-

দর্শের ভেতর এমন কতগুলি চিরন্তন ভাব-সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়,— যা এ যুগের সৌখীন আর্ট-বিলাসীদের চিন্তা-বহির্ভূত। কালজয়ী শিল্পের লক্ষণ বিচারে টলস্টয় যে সংক্রমণশীলতা, বিষয়বস্তু-গৌরব, সৎ-অনুভূতি, ধর্মীয় চেতনা-প্রসূত সার্বজনীন মানবপ্রেমের কথা বলেছেন— তা সকল যুগের সাহিত্য-প্রয়াসীদের নিকট অভ্রান্ত দিক-নির্দেশক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকার মত। শিল্পাদর্শের উক্ত তাৎপর্যপূর্ণ মান প্রয়োগে প্রবৃত্ত হয়ে টলস্টয় আমাদের বর্তমান শিল্প-সাহিত্যের বহু নিদর্শনকে শুধু বাতিল করে দেননি, শেকসপীয়রের অমর সৃষ্টিকর্মেরও বিরূপ সমালোচনা করবার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। নিজস্ব বিখ্যাত শিল্পকর্মও তাঁর নির্মম সমালোচনা থেকে বাদ পড়েনি। যে 'ওয়র এণ্ড পীস' এবং 'আনা কারেনিনা' লিখে তিনি বিশ্বের কথা-সাহিত্য-জগতে খ্যাতির শীর্ষে-আরোহণ করেছিলেন, পরিণত শিল্পভাবনায় সেগুলিকে মনে হয়েছে তাঁর অভিজাত বিত্তবানদের অবসরভোগ্য শিল্পকর্ম। তাঁর পরিণত বিবেচনায় ধর্মভাবনায় অনুপ্রাণিত, মনুষ্যত্বের উদ্বোধক, বিশ্বভ্রাতৃত্বের সম্প্রসারক সৃষ্টিকর্মই উৎকৃষ্ট শিল্প বলে বিবেচিত হবার যোগ্য। এ পর্যায়ের উৎকৃষ্ট সাহিত্য হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসি, ঈশপের 'ফেবেল্‌স,' 'ডন কুইক্‌জোট,' 'রবিনসন ক্রুশো', 'মলিয়ের'-এর নাটক, ডিকেন্সের উপন্যাস, হুগোর 'লে মিজারেবল', এবং মোপাসাঁর কোন কোন গল্পকে। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের পরবর্তীকালে রচিত 'রেজারেকশন', 'টোয়েনটি থ্রী টেলস' প্রভৃতি রচনাকেও তিনি সচেতনভাবে উক্ত শিল্পাদর্শে গড়ে তুলবার প্রয়াস পান।

টলস্টয়ের শিল্পাদর্শ একান্তভাবে আপসহীন, মানুষের শাশ্বত ধর্ম -বোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেই নির্মম শিল্প-বিচারে আদি গ্রীক নাট্যকার এসকাইলাস, সফোক্লিস, এবং পরবর্তীকালে প্রদীপ্ত প্রতিভাবান বলে স্বীকৃত শুধুমাত্র শেকসপীয়র নন,—দান্তে, গ্যেটে, স্তাঁদাল, বালজাক এবং আধুনিক য়ুরোপীয় বহু খ্যাতনামা কাহিনীকার ও কবি —সবই বাতিল। শেকসপীয়রের নাটক বিশ্বনন্দিত হলেও টলস্টয়ের

মতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিজাত জীবনকেন্দ্রিক, এবং বিলাসী ধনিক শ্রেণীর মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে রচিত। এ কারণে তাঁর নাটকের ঘটনা-কেন্দ্রে এত উদ্ভট কল্পনা, অকারণ হানাহানি, এবং রক্তপাত। এ পর্যায়ের নাটক তাঁর বিবেচনায় প্রশংসাযোগ্য হতে পারে না। আধুনিক কবি-শিল্পীরা তাঁর মতে, শুধুমাত্র কৃত্রিম পণ্যের পসরা সাজিয়ে জনমনকে বিভ্রান্ত করছেন। সুতরাং তাঁদের সৃষ্টিতে শিল্পবস্তু বলে কিছু নেই, থাকতে পারে না। যে আনন্দ-সৃষ্টিকে আধুনিক শিল্পের প্রধান লক্ষ্য বলে বিবেচনা করা হয়, সেই আনন্দবাদী শিল্পাদর্শের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন টলস্টয় তাঁর 'হোয়াট ইজ আর্ট' ?—এ। তাঁর মতে যে শিল্প সর্বজনবোধগম্য, চিত্তের উদ্বোধন ঘটাতে সক্ষম,—সেই ধর্মাদর্শ-অনুপ্রাণিত শিল্পই শিল্পীর অনুশীলনের বিষয় হওয়া উচিত।

টলস্টয়ের ধর্মবোধ

এবার টলস্টয়ের সদা-আন্দোলিত জীবনে নব-প্রবুদ্ধ ধর্মবোধের প্রসঙ্গে আসা যাক।

টলস্টয়ের বৈচিত্র্যময় জীবন অবিরাম চলার ছন্দে আবর্তিত। দীর্ঘকাল-ব্যাপ্ত জীবনে কোথাও তিনি থেমে থাকেন নি। তাঁর জীবন-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মবোধও হয়েছে বিবর্তিত। নিরন্তর বিবেকের সংঘাতে অভিনব ধর্মপ্রত্যয়ের জগতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তিনি। অন্তরবেদ্য ঈশ্বরমুখী ধর্মবোধ থেকে মানবমুখী ধর্মবোধের জগতে তাঁর মানসিক বিবর্তনরেখা খুবই স্পষ্ট। মস্কোর একটি বস্তি অঞ্চল পরিদর্শনের সময় শ্রমিক সমাজের দুঃখ দুর্দশার যে উৎকট রূপ তাঁর চোখের সামনে অনাবৃত হয়, তার পরের থেকেই তাঁর ধর্মবোধ প্রত্যক্ষ ভাবে সমাজচিন্তা প্রভাবিত হয়।

টলস্টয়ের বিশিষ্ট ধর্মবোধ বিধৃত হয়েছে What I believe এবং A short Exposition of Gospel নামক দুইখানি গ্রন্থে। এই গ্রন্থ দুইখানিতে ধর্মের যে স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত তা প্রথাসিদ্ধ কোন আনুষ্ঠানিক ধর্ম নয়,—মানুষের বোধের জগতে স্বাভাবিক আলোকের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বর যে সর্বোচ্চ মঙ্গল এবং যুক্তির প্রতীক—তা

অন্তর্নিহিত চেতনার সাহায্যে মানবচিত্তে উদ্‌ভাসিত হয় বলে তাঁর বিশ্বাস। ধর্ম টলস্টয়ের নিকট অধিবিদ্যাগত কোন তত্ত্ব নয়, জাগতিক নিয়মের অবয়বান্বিত কোন মূর্তিও নয়—তাঁর ধর্ম বিশুদ্ধ মানবকেন্দ্রিক। মানুষের লক্ষ্য যে সুখ অর্জন—এটা তিনি বিশ্বাস করতেন। তবে সে সুখ অর্জনের উপায় যে সৎ-কর্ম, সার্বজনীন মানবপ্রেম, লোভের ক্ষুধাতুর লালসা এবং ক্রোধের কবল থেকে মুক্তি—এ বিষয়ে তাঁর মনে কোন দ্বিধা ছিল না। সর্বপ্রকার হিংসা মাত্রই তাঁর মতে বর্জনীয়। টলস্টয়ের দৃঢ় প্রত্যয়,—শুধুমাত্র যুদ্ধ নয়, রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে মানুষকে বাধ্য করাও অপরাধের কাজ। বল প্রয়োগের দ্বারা প্রতিরোধ কোন উচ্চতর জীবনাদর্শ লাভে সহায়তা করে না বলেই তাঁর বিশ্বাস। যে বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতি হিংসা ও ঘৃণার জন্ম দেয়, তা নির্যাতিতের প্রতি ভালোবাসার উৎস থেকে উৎসারিত হলেও মন্দ। টলস্টয়ের একান্ত প্রত্যয়, সমাজ-উন্নয়নের একমাত্র উপায় মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসা। সমাজ-সাম্যের জন্য বল প্রয়োগের নীতি তাঁর মতে ত্যাজ্য। সম্পত্তির যে মালিকানা লোভ এবং লালসার পরিতৃপ্তি সাধন করে, মানুষকে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠায় উত্তেজিত করে, তাঁর মতে তা শুধু মন্দ নয়, পাপ। টলস্টয়ের বিশ্বাস, হিংসার উৎসেও মানুষের লোভ এবং লালসা। দরিদ্রকে শোষণ করে ধনী সম্প্রদায় শুধুমাত্র একটা দূষিত এবং কৃত্রিম সভ্যতা গড়ে তোলে নি, নিজেদের স্বার্থে এমন মিথ্যা মূল্যবোধের সৃষ্টি করেছেন—যার থেকে মুক্তি পাওয়া প্রয়োজন। টলস্টয়ের বিবেচনায় দরিদ্রেরাও দাসত্বের পীড়নে নীতিভ্রষ্ট। তবে তাদের স্বাভাবিক সৎ-প্রবৃত্তি বিশুদ্ধতা-ভ্রষ্ট হয়নি। তাঁর বিবেচনায় দরিদ্রদের ব্যক্তিসত্তা ধনীদের কৃত্রিম সংস্কৃতি দ্বারা বিকৃত হয়ে যায়নি। টলস্টয় শুধু মানুষের প্রতি মানুষের হিংসাপ্রবৃত্তি মুক্ত হবার কথা বলেন নি, পশুহত্যা,—এমনকি মাদকদ্রব্য বর্জনও তাঁর শিক্ষার (Tolstoyism) অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আদর্শ জীবন এবং আদর্শ সমাজ ভাবনায় টলস্টয় নিঃসন্দেহে স্বপ্নদর্শী। কিন্তু সমাজ-সংস্কারক তিনি নন। সমাজ ব্যবস্থার

উন্নয়নের জন্য কোন বাস্তবধর্মী প্রস্তাবও তিনি উপস্থিত করেননি। প্রচলিত অর্থে যাকে সংস্কার বলা হয়, তার ওপর তাঁর কোন আস্থা ছিল না। সুখী শান্তিপূর্ণ জীবন একমাত্র অকৃত্রিম খ্রীস্টধর্ম অনুশীলনের দ্বারাই লভ্য বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। প্রকৃত খ্রীস্টান তাঁর মতে তিনিই—যিনি অপরের শ্রমের ওপর নির্ভরশীল হন না এবং রাষ্ট্রের নির্দেশ সত্ত্বেও হিংসাত্মক কাজে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। ভূমি সংক্রান্ত সমস্যার এক আদর্শবাদী সমাধানের প্রতিও ইঙ্গিত করে গেছেন টলস্টয়। পাশ্চাত্ত্য ধনতন্ত্র প্রভাবিত শিক্ষাকে তিনি যেমন অস্বীকার করেছিলেন তেমনি অস্বীকার করেছিলেন জার সরকারের মানবতাবিরোধী স্বৈরতন্ত্রকেও। এই সরকার-বিরোধিতার জন্য টলস্টয়কে যে মূল্য দিতে হয়েছিল, তা কারো অবিদিত নয়।

আধুনিক সভ্যতার চরম স্বার্থান্বেষী এবং বিধ্বংসী ক্রিয়াকলাপ প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল টলস্টয়ের মনে। তিনি অনুভব করেছিলেন, আধুনিক সভ্যতার ভিত্তিভূমিতে এই যুগের দলবদ্ধ মানুষের বলদর্পী লুণ্ঠন, দস্যুতা ও হত্যার বিভীষিকা—যার ভদ্র নাম দেওয়া হয়েছে যুদ্ধ। রাষ্ট্রশক্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে তিনি দেখালেন, সে শক্তি বলপ্রয়োগের সাহায্যে প্রত্যেক মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে সংকুচিত করার যন্ত্র মাত্র। বস্তুতপক্ষে রাষ্ট্রশক্তি পশুবলেরই প্রতীক। সে শক্তির আনুগত্য কোন বিবেকবান মানুষ স্বীকার করতে পারেন না। প্রচলিত গতানুগতিক সমাজব্যবস্থা মুষ্টিমেয় বিত্তবান শক্তিমান ব্যক্তি কর্তৃক অগনিত বিত্তহীন অসহায় মানুষকে চিরকালের জন্য দাবিয়ে রাখার একটি সুচিন্তিত উপায় মাত্র। আইন আদালত বিচার-ব্যবস্থা প্রভাবশালী মানুষের কায়েমী স্বার্থ এবং বিচারহীন বৈষম্যকে স্থায়িত্ব দেবার কাজে নিয়োজিত। সৈন্য ও পুলিশবাহিনী মানুষে মানুষে এই বৈষম্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার কাজে ব্যাপৃত। বুদ্ধিবাদী বলে বিবেচিত শিল্পী-সাহিত্যিকেরাও সমাজের স্থিতাবস্থার সমর্থক। তাঁরা সভ্য নামধারী সামাজিক মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য নিজেদের শক্তিসামর্থ্য এবং শিল্পকর্মকে নিয়োগ করেন। যে পুরোহিত শ্রেণী

মানুষকে আধ্যাত্মিক জীবনের পথ দেখাবেন, কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, তারাও কোন সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মসংঘ বা চার্চের অঙ্গ হিসেবে রাষ্ট্রের সমস্ত মানবতাবিরোধী কাজকে সমর্থন করছে। শক্তিমদমত্ত কোন রাজ্য পররাজ্য আক্রমণ করলে ধর্মযাজক সম্প্রদায় তার বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ করেন না, বা নিজেদের প্রভাব খাটান না। একদিকে স্বৈরতন্ত্রী রাজশক্তি, আর একদিকে রাজশক্তির আশ্রয়পুষ্ট ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অবিছিন্ন সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন জীবনের শেষ পর্যায়ে টলস্টয়। সত্যান্বেষী দৃষ্টি এবং মোহমুক্ত মনের সাহায্যে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, সভ্যতার নামে সর্বত্র চলছে ভণ্ডামি, জবরদস্তি এবং অন্যায়-অবিচারের রাজত্ব। তাঁর বিবেচনায় বিবেকবান মানুষ মাত্রেরই উচিত সে সমাজশক্তি, পুরোহিতশক্তি এবং রাজশক্তির সর্বপ্রকার মানবতাবিরোধী নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো।

স্বৈরতন্ত্রী রাজশক্তি এবং সংস্কারাচ্ছন্ন পুরোহিত তন্ত্রের বিরোধিতায় টলস্টয়ের এই আদর্শবাদী জীবনচেতনার প্রভাব রাশিয়ায় খুব প্রসার লাভ করেনি। বস্তুতপক্ষে স্বদেশে তাঁর অনুবর্তীদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। তাঁর নিকট-সম্পর্কিত পরিজনেরা ছিল এই প্রসারিত মানবাদর্শ-বিরোধী। তবে বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁর এই আদর্শবাদী জীবনের প্রভাব স্বদেশের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। মানবমুক্তির একজন শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হিসেবে জীবনের শেষ পনের বা বিশ বৎসর তিনি ছিলেন বিশ্বের একজন বরেণ্য মানুষ। তাঁর আদর্শবাদী জীবনদর্শনের কথা স্বদেশ রাশিয়া ছাড়াও ছড়িয়ে পড়েছিল চীনে, ভারতবর্ষে, সমগ্র য়ুরোপে এবং আমেরিকায়ও। ভারতের সমকালীন মনীষীদের মধ্যে টলস্টয়-আদর্শ দ্বারা সব চাইতে বেশী প্রভাবিত হয়েছিলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (তখনও 'মহাত্মা' আখ্যা পাননি)। অখণ্ড সত্যলাভের জন্য গান্ধীজীর জীবন-সংগ্রাম, সমাজের অসহায় দরিদ্রের প্রতি অন্তরতম সহানুভূতি, অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য, কায়িক শ্রমের ওপর সার্বিক নির্ভরতা, আধুনিক যন্ত্রবিরোধিতা, সর্বপ্রকার অন্যায় অবিচার এবং নিষ্ঠুর পীড়নের বিরুদ্ধে

নির্ভীক সত্যাগ্রহ,—এ সমস্তই মহামানব টলস্টয় এবং অংশত মনীষী রাস্কিন-অনুপ্রাণিত। দক্ষিণ আফ্রিকায় জোহান্‌সবার্গের উপকণ্ঠে মহাত্মা গান্ধীর 'টলস্টয় ফার্ম' স্থাপন টলস্টয়ের প্রত্যক্ষ আদর্শ-প্রভাবিত। সে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য ছিল, সকলে একসঙ্গে মিলিত হয়ে প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং অন্যান্য বস্তু উৎপন্ন করবে এবং একত্রে ভোগ করবে। ব্রহ্মচর্য, সাম্য এবং প্রীতির মন্ত্রে তাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হত।

টলস্টয়ের অভিনব জীবনাদর্শ এবং কর্মপদ্ধতির প্রতি রুশ সরকার আদ্যন্ত ছিলেন সন্দেহপরায়ণ ও শত্রুভাবাপন্ন। রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে তাঁর কয়েকটি রচনা এবং রোমানফ বংশের প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণতম আক্রমণ বিদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। রাশিয়ায় প্রকাশিত টলস্টয়ের রচনা থেকে তাঁর শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর যুক্তিবাদী মতবাদের প্রতিক্রিয়ায় রুশ গির্জার বিচার -সভা তাঁকে মণ্ডলীচ্যুত করে। টলস্টয়ের মতানুবর্তীদের মধ্যে কেউ কেউ সৈন্য বিভাগে কাজ করতে অসম্মত হওয়ায় শুধু কারাদণ্ড ভোগ করেনি, অনেককে সাইবেরিয়াতে পর্যন্ত নির্বাসিত হতে হয়েছিল।

প্রসারিত মানবধর্মবোধ শেষ জীবনে টলস্টয়ের জন্মান্তর ঘটিয়েছিল। অন্তর্জগতের এই অমোঘ পরিবর্তন তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীতেও অনিবার্য রূপান্তর এনে দিয়েছিল। এই রূপান্তরের উৎস অবিমিশ্র মানবতাবোধ ছাড়াও ছিল সমুচ্চ নৈতিক আদর্শ এবং সমাজসাম্য সম্পর্কে নবজাগ্রত চিন্তা। সাহিত্যকে দেখতে লাগলেন তিনি সামাজিক প্রয়োজন এবং নৈতিক আদর্শের দিক থেকে। উচ্চবিত্ত সমাজের ভোগাকাঙ্ক্ষার অনুভূতি-সঞ্চারক সাহিত্যের ভেতর অবক্ষয়ের স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পেলেন তিনি। শুধুমাত্র সাহিত্যে নয়, শিল্পের বিভিন্ন বিভাগে অপসংস্কৃতির দুর্মর প্রভাব দেখে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবার প্রয়োজন অনুভব করলেন টলস্টয়। কেবলমাত্র সমকালীন বা পূর্ব যুগের সাহিত্যে মাত্র নয়,—সঙ্গীত, নাট্যশিল্প, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্পের সমস্ত বিভাগের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম,

পরিচয়ের ব্যাপ্তি ছিল বহুবিস্তারী, এবং অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ছিল সমৃদ্ধ। সে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এবং তীক্ষ্ণ মননশীলতার আলোকে তিনি উপলব্ধি করলেন, সমকালীন সাহিত্যিক এবং শিল্পীরা যে ফ্যাসান-বিলাসী শিল্প -সৃষ্টি নিয়ে মাতামাতি করেন, তা বৃহত্তর সামাজিক মানুষের নিকট শুধুমাত্র আবেদনহীন নয়, অপ্রয়োজনীয়ও। মানবতাবাদী জীবনশিল্পী টলস্টয় সাহিত্য-চিন্তার শেষ পর্যায়ে সেই ব্যাপক সংবেদনহীন এবং অবক্ষয়ী সাহিত্য-শিল্পের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন।

জীবনের শেষ পর্যায়

মহান শিল্পী টলস্টয়ের জীবনের শেষ পর্যায় একদিকে যেমন সংঘাত-মুখর এবং ট্র্যাজেডির বেদনায় গভীর, তেমনি মনুষ্যত্বের উচ্চতম শীর্ষে উত্তরণের মহিমায় জ্যোতির্ময়।

নিত্য-বিবর্তিত জীবনে ক্রমাগত মনুষ্যত্ব অনুশীলনের ফলে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, জীবনের চরম সার্থকতা ভোকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিতে নয়,—ত্যাগের মহত্ত্বে, সমাজের অগণিত শ্রমজীবী জনসাধারণের সঙ্গে নিজের জীবনকে মিশিয়ে দেবার উদার প্রয়াসের মধ্যে। জীবনের মহত্তম উপলব্ধি টলস্টয়ের সুখ-সমৃদ্ধি-সম্ভোগময় জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিল। 'শ্রমের সাহায্যে নিজের অন্ন সংস্থান করবে'—এই খ্রীস্টীয় উপদেশ আক্ষরিক অর্থে পালন করতে গিয়ে প্রতিদিন সকালে কৃষিকর্মে আত্মনিয়োগ করলেন তিনি। বিলাস-বহুল জীবনের মূল্যবান পোষাক পরিত্যাগ করে রুশ 'মুঝিকে'র মত সাদামাঠা কর্কশ পোষাক পরিধান করতে লাগলেন। জীবিকা সংস্থানের উপায় হিসেবে নিজের হাতে জুতো সেলাই করতে লাগলেন। ভূস্বামী জমিদারের জীবন পরশ্রম-পুষ্ট—এই বাস্তব উপলব্ধির ফলে অনভ্যস্ত কায়িক শ্রমকে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সাগ্রহে বরণ করে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না। প্রয়োজনাতিরিক্ত ভূমি এবং ধনসম্পত্তির মালিকানা চৌর্যের সামিল বলে অনুভব করায় পরিজনদের জন্য প্রয়োজনীয় জমি রেখে বাকী জমি প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চাইলেন তিনি। যে গল্প-উপন্যাস থেকে লক্ষ লক্ষ রুবল আয় হত, তার

গ্রন্থসত্ত্ব পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে চাইলেন দেশের অগণিত দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে। শুধু নিজের জীবনের নয়, পারিবারিক জীবনের বিলাস-প্রাচুর্যকে নির্মমভাবে ছেঁটে দিয়ে সাদাসিধে জীবনের এক পরিকল্পনা উপস্থিত করলেন তিনি পরিজনদের নিকট ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে।

এই আদর্শবাদী জীবনযাপন পরিকল্পনার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় প্রবল অশান্তির আগুন জ্বলে উঠল পরিবারের মধ্যে। মহত্তম উপলব্ধির ফলে যে সমস্ত কাজকে তিনি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৎ-কর্ম বলে বিবেচনা করেছিলেন, স্ত্রী সোফিয়ার নিকট সেগুলি মনে হল খেপামী। জীবনে সর্বাপেক্ষা আপন বলে তিনি যাদের মনে করতেন, তারা সকলেই ক্রমে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তাঁর জীবন থেকে—তাঁর আদর্শ উপলব্ধিতে সক্ষম একমাত্র ছোট মেয়ে আলেকজান্দ্রা ছাড়া। ইতিপূর্বে দুখবোর (১) (The Dukhobors) নামক স্বধর্মনিষ্ঠ ত্যাগব্রতী ধর্মসম্প্রদায়ের

দুখবোর—'দুখবোর' রাশিয়ার একটি প্রাচীন ধর্মীয় সম্প্রদায়। ধর্মচেতনায় এদের অবশ্যপাল্য কর্তব্য ছিল,—শুচিতা রক্ষণ, নিরামিষ ভোজন, তামাক ও মদ্য বর্জন, ব্যক্তিগত ধনসম্পদ সাধারণ তহবিলে অর্পণ এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ। শেষোক্ত কর্তব্য পালনের জন্য বাধ্যতামূলক সৈনিক বৃত্তি গ্রহণে অসম্মতি জানালে তারা সরকারী নির্যাতনের শিকার হন। রাশিয়ার জার প্রথম আলেক্সান্দর (১৮০১—১৮২৫) এদের ককেশাসে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছিলেন।

টলস্টয়ের জীবদ্দশায় দুখবোর পন্থীদের ওপর এক ভয়াবহ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়। ভেরিগিন নামে জনৈক দুখবোর নেতার আহ্বানে অনুপ্রাণিত হয়ে ককেশাস অঞ্চলের অধিবাসীদের একটি বড় অংশ তাদের ব্যক্তিগত অস্ত্র-শস্ত্র ধ্বংস করার এবং সেনাবাহিনীতে যোগ না দেওয়ার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২৮—২৯ জুনের রাত্রে দুখবোর পন্থীদের সমাবেশে অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হয় এবং সবাই সে আগুনে তাদের অস্ত্র সমর্পণ করেন। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য সম্রাট দ্বিতীয় নিকলাই (১৮৯৫—১৯১৭) তাদের বিরুদ্ধে তাঁর ভয়াবহ কশাক সেনা লেলিয়ে দেন। এই অবর্ণনীয় হত্যাযজ্ঞে দুখবোর পন্থীরা বিনা প্রতিরোধে আত্মাহুতি দান করেন। দুখবোরদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও ঘরবাড়ী ছারখার করা হয়। চার হাজার দুখবোরকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জেলে কয়েদ করা হয়। এই পৈশাচিক অত্যাচারের প্রতিবাদে টলস্টয় The parsecution of christians in Russia in 1895 নামে লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকায় বেনামে প্রবন্ধ লেখেন এবং পরে তাদের কানাডায় পুনর্বাসনে অর্থসাহায্য করেন। (দ্রষ্টব্য ডক্টর হীরাৎ মামুদ সম্পাদিত লেভতল্স্তোয়, পৃঃ ২৫৭)।

স্বপক্ষে অর্থোডক্‌স চার্চের বিচার সভা সিনোদ-এর এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করায় সে চার্চ তাঁকে ধর্মত্যাগী অভিযোগে ধর্মসংঘ থেকে বহিষ্কৃত করেন (১৯০১)। তাতেও সেই ধর্মান্ধ চার্চের প্রতিহিংসা নিবৃত্ত হয়নি। টলস্টয়ের আদর্শ-অনুপ্রাণিত দুখবোরদের দুই নেতা চার্টকভ ও বিরুকভকে (চের্ৎকোফ এবং বিরিউকফ) তারা সম্রাটের সাহায্যে দেশ থেকে নির্বাসনের ব্যবস্থাও করেন (১৮৯৮)। টলস্টয় এখন একা—প্রায় সম্পূর্ণ প্রিয়-সঙ্গহীন। তাঁর আদর্শ-অনুপ্রাণিত যে স্বল্পসংখ্যক বন্ধু-বান্ধব দেখা করতে আসতেন স্ত্রী সোফিয়া তাঁদের দেখতে লাগলেন প্রবল সন্দেহের চোখে। তীব্র সমালোচনার বিষ-জ্বালায় উত্যক্ত করে তুললেন তিনি বিশ্ববন্দিত আদর্শবাদী মানুষটিকে। এমনকি আইনের চোখে উন্মাদ প্রতিপন্ন করে স্বামীকে বিষয়-সম্পত্তির সমস্ত অধিকার থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত করার কথাও ভাবলেন তিনি। যাঁর মধুর সাহচর্যে ইয়াস্নায়া পলিয়ানার শান্তিময় বাসভবনে পঞ্চাশ বছর ধরে জীবনের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তিগুলি গড়ে তুলেছিলেন টলস্টয়, সেই গৃহ নরকের মত মনে হল তাঁর নিকট। একদিকে ত্যাগব্রতে উদ্বুদ্ধ টলস্টয় চাইছেন বিপুল বিত্তসম্পত্তির আয় দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে দেশের জনগণের জীবনের সান্নিধ্যে আসবেন, আর একদিকে স্ত্রী সোফিয়া অনবরত চাপ দিতে লাগলেন সমস্ত সম্পত্তি ট্রাস্ট করে ছেলেদের নামে লিখে দেবার জন্য। পারিবারিক বিরোধ এড়াতে টলস্টয় শেষ পর্যন্ত তাঁর সমস্ত সম্পত্তি (১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে লিখিত সমস্ত বইয়ের কপি-রাইট সহ) স্ত্রী এবং সন্তানদের হাতে তুলে দিলেন। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের পরে লিখিত তাঁর সমস্ত বইয়ের উপসত্ব ভোগ করবে জনসাধারণ—এই শর্ত তারা মেনে নিল। সেই বইয়ের বাবদ প্রাপ্ত অর্থ নিরন্ন জন-সাধারণ এবং রাষ্ট্রনির্যাতিত দুর্গতদের জন্য তিনি ব্যয় করতেও লাগলেন। এ ছাড়া দুখবোরদের কানাডায় পুনর্বাসনে, নির্যাতিত ইহুদীদের সাহায্য এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত অসহায় মানুষের জন্যও তিনি স্বোপার্জিত অর্থ ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিলেন। দুখবোরদের কানাডায় পুনর্বাসনের জন্য তিনি দান করেছিলেন রিজারেকশন এবং ফাদার সিয়ের্গির বিক্রয়লব্ধ

আশি হাজার রুবল। কিন্তু সম্পত্তি ট্রাস্ট করে দেবার পর ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। যে আদর্শবাদী মানুষটি দরিদ্রের নিকটতম বন্ধু এবং নিবৃত্তির প্রবক্তা, সমস্ত সম্পত্তি ট্রাস্ট করে দেবার পর দেখা গেল, স্ত্রী-সন্তানদের অভিভাবকত্বে তাঁকেই বাস করতে হচ্ছে অভিজাত জীবন-প্রাচুর্যের মধ্যে। নিজের বাসগৃহে তিনি এমন সমস্ত লোক-পরিবৃত হয়ে জীবন যাপনে বাধ্য হলেন,—যাঁরা তাঁর মত সমর্থন করেনা, অথচ তাঁকে পূজো করে।

এই অস্বাভাবিক জীবন-পরিবেশে টলস্টয় প্রতিটি দিন হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করেছিলেন তিনি। তবু আন্তরিক ভালোবাসার প্রেরণায় আদর্শ-বিরোধী স্ত্রীকে স্ব-পথে আনয়ন করবার আশা একেবারে ত্যাগ করলেন না। স্ত্রীর সঙ্গে সংঘাত শুরু হবার পর থেকে আলাদা ঘরে শোবার ব্যবস্থা করেছিলেন বৃদ্ধ টলস্টয়। একদিন গভীর রাত্রে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় টের পেলেন, স্ত্রী সোফি ঘরে ঢুকে বাক্স খুলে কি যেন খুঁজছেন। টলস্টয় বুঝতে পারলেন, স্ত্রীর সন্ধানের লক্ষ্য তাঁর তৈরী সম্ভাব্য কোন উইল—যার সাহায্যে টলস্টয় তাঁর সমস্ত সম্পত্তির কোন অংশ দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারেন।

বহুকালের জীবনসঙ্গিনী স্ত্রীর সঙ্গে নিত্যনিয়ত সংঘর্ষের ফলে টলস্টয়ের মন এমনিতেই সংসারের প্রতি তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু হীন সন্দেহপ্রবণতা প্রভাবে রাত্রির অন্ধকারে স্ত্রীর এই গোপন কার্যকলাপ তাঁর মুক্তিপ্রয়াসী মনে বিষ ঢেলে দিল। প্রথম বিবাহিত জীবনের মধুরতম দিনগুলিতে যে টলস্টয় প্রিয়তমা স্ত্রীর নিকট নিজের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের কত গোপন কথা নির্দ্বিধায় উন্মুক্ত করেছেন, সেই স্ত্রীর এই সন্দেহপ্রবণতা তাঁর প্রীতিপূর্ণ বক্ষে শেলের আঘাত হানল। কিছুকাল পূর্ব থেকেই টলস্টয় বিলাস-বৈভবপূর্ণ পৈতৃক ভবন ত্যাগ করে অপর কোথাও গিয়ে জনগণের সঙ্গে বাস করবার গোপন ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করছিলেন। স্ত্রীর এই হীন সন্দেহপ্রবণ কার্যকলাপের পর তিনি সযত্ন-লালিত এই গোপন বাসনাকে কার্যক্ষেত্রে রূপ দিতে আর দ্বিধা

করলেন না। গভীর রাত্রেই গৃহত্যাগের সংকল্প করলেন তিনি। বয়স তখন তাঁর ৮২ বৎসর। সময়টা ছিল অক্টোবরের এক শীতল রাত্রি। অত্যন্ত সংগোপনে গৃহত্যাগের ব্যবস্থা করলেন টলস্টয়। পারিবারিক বিরোধী পরিবেশে তাঁর মহৎ আদর্শের সমর্থক ছিলেন প্রিয় চতুর্থ কন্যা সাশা (আলেক্জান্দ্রা)। বৃদ্ধ পিতার এই চরম সিদ্ধান্তের কথা শুনে তিনি বিচলিত হলেন। তথাপি গোপনে তিনি প্রিয় পিতার নিরুদ্দেশ যাত্রার সমস্ত আয়োজনে সমাপ্ত করে দিলেন। তাঁর এই একক যাত্রার সঙ্গী হলেন দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু গৃহ-চিকিৎসক। ভোর রাত্রের দিকে বিশ্বস্ত কোচোয়ান নিয়ে নিজের ঘোড়ার গাড়ীতে তিনি বেরিয়ে পড়লেন নিরুদ্দেশের পথে। পশ্চাতে পড়ে রইল বহুকালের স্মৃতি-বিজড়িত সেই প্রসাদোপম পৈতৃক বাসভবন—যে ভবনে কেটে গেছে সুখে দুঃখে আবর্তিত জীবনের কত বৎসর! এই ভবনে বসে জীবনের বিভিন্ন সময়ে তিনি জগদ্বিখ্যাত কত সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য রচনা করেছেন, শিল্পের আদর্শ সম্পর্কে ভেবেছেন, অসহায় দরিদ্র জনগণের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্য কত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। মহানিষ্ক্রমণের পূর্বে স্ত্রীকে ছোট্ট দুটি কথায় জানিয়ে গেলেন, তাঁর খোঁজ করবার চেষ্টা বৃথা। তিনি আর ফিরবেন না। গৃহত্যাগের পর সে চিঠি পেয়ে স্ত্রী সোফিয়া আত্ম-হত্যার চেষ্টা করলেন। সফল হলেন না। পরে অনুতপ্ত চিত্তে স্বামীর আদর্শের অনুবর্তিনী হবার আশ্বাস দিয়ে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখলেন। কিন্তু কোথায় পাঠাবেন সে চিঠি?

এদিকে হিমশীতল নভেম্বরের শেষ রাত্রির অন্ধকার চিরে টলস্টয়ের ট্রেন ছুটে চলেছে। সে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের এক রাত্রি বেলার কথা। সমস্ত জীবন ঐশ্বর্য-প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করেছেন টলস্টয়। পরিণত বার্ধক্যে এই আত্মনিগ্রহ সহ্য হলনা। শেষ নভেম্বরের প্রচণ্ড শীতে বিশালদেহী এই মহামানব ট্রেনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রায়জান সরকারের অধীন অস্টাপোভাতে (অস্তাপভ) উপনীত হবার পর গ্রামের ছোট একটি স্টেশনে তাঁকে নামানো হলে দেখা গেল,

তিনি দুরারোগ্য নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। প্রবল জ্বরে গায়ের তাপাঙ্ক উচ্চ সীমায়। অসাড় অর্ধ চেতনাচ্ছন্ন মানুষটিকে সকলে ধরাধরি করে সেই অখ্যাত গ্রামের স্টেশন মাস্টারের অফিস ঘরে শুইয়ে দিলেন। পরে স্থানারস্তিত করা হল সেই রেলকর্মীর ক্ষুদ্র বাসগৃহে।

খবরটা জানাজানি হতে দেরী হল না। মস্কো থেকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারেরা এলেন। ইয়াস্নায়া পালিয়ানা থেকে ডাক্তার নিয়ে স্ত্রী-পুত্র -কন্যারা উপস্থিত হলেন সেই অখ্যাত স্টেশনে। মানব-দরদী জীবন-শিল্পী, শ্রমিকের অকৃত্রিম বন্ধু এই জগৎ-বিখ্যাত মানুষটিকে শেষ দর্শনের জন্য দলে দলে মানুষ ছুটল অস্টাপোভা স্টেশনের দিকে। এ যেন গভীর ধর্মচেতনায় আবেগাকুল মানুষের তীর্থযাত্রা! অনুতপ্তা স্ত্রী সোফিয়াকে ডাক্তারেরা তাঁর স্বামীর শয্যাপার্শ্বে যেতে অনুমতি দিলেন না—পাছে মুমূর্ষু রোগীর কোন মানসিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত সোফিয়ার আগ্রহাতিশয্যে যখন তাঁকে স্বামীর নিকট যেতে দেওয়া হল, তখন টলস্টয় সংজ্ঞা-হারা। স্বামীর সঙ্গে শেষ বাক্য বিনিময়ের কোন সুযোগ পেলেন না তিনি। সুচিকিৎসার বন্দোবস্তের কোন ক্রটি রাখা হয়নি। তবু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সকল চেষ্টা বিফল করে রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃজনধর্মী সাহিত্যিক, শোষিত নির্যাতিত দরিদ্রের অকৃত্রিম বন্ধু, আধুনিক বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহামানব টলস্টয় একটি অখ্যাত পল্লীর অজ্ঞাত রেলকর্মীর ক্ষুদ্র আবাস-গৃহে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। এ বেদনাদায়ক মৃত্যু ঘটল গৃহ থেকে মহানিষ্ক্রমণের কয়েকটি দিন পরে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের ২০শে নভেম্বর তারিখে (নতুন ক্যালেণ্ডারের মতে)।

মনে প্রশ্ন জাগে, একি বর্তমান শতাব্দীর একজন মহামানবের মৃত্যু,—না একান্ত নিকট-আত্মীয় পরিজন এবং স্বার্থমগ্ন মানুষের সংকীর্ণতায় যন্ত্রণাবিদ্ধ একজন আদর্শবাদী মানুষের আত্মবিসর্জন?

যথাসময় ইয়াস্নায়া পলিয়ানার গৃহের সন্নিকটবর্তী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-পরিপূর্ণ বনের নির্জন পরিবেশে মহামতি টলস্টয়কে সমাধিস্থ করা হল। দুঃখের বিষয়, যিনি ছিলেন মাথার চুল থেকে পায়ের নখ

পর্যন্ত অকৃত্রিম খ্রীস্টান, তাঁর সমাধির সময় সংস্কারাচ্ছন্ন অর্থডোক্স চার্চের অসহযোগিতায় খ্রীষ্টীয় সমাধি দেওয়ার রীতি অনুসৃত হয়নি। মৃত্যুর পরে প্রচলিত ধর্মসংঘের বিরুদ্ধবাদী ধর্মযাজকেরা টলস্টয়ের পুণ্যস্মৃতির প্রতি যত উপেক্ষাই দেখাক না কেন, পৃথিবীর অসংখ্য টলস্টয়-অনুরাগীর নিকট ইয়াস্নায়া পলিয়ানায় তাঁর সমাধিক্ষেত্র এখনও পুণ্যতীর্থ! এমনও টলস্টয়ের জীবনাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত সমগ্র বিশ্বের মানুষ অন্তরের ভক্তিনম্র প্রণতি জানাবার জন্য সারা বৎসরব্যাপী এই সমাধিক্ষেত্রে সমবেত হন। সন্নিকটবর্তী স্মৃতি-বিজড়িত পৈতৃক ভবনটি এখন তাঁর রচিত অমূল্য গ্রন্থরাজি, পাণ্ডুলিপি এবং ব্যবহৃত অপরাপর বস্তুর সমাবেশে একটি উল্লেখযোগ্য স্মৃতি-সংগ্রহশালায় রূপান্তরিত।

টলস্টয়ের অনন্য ব্যক্তিত্বের যে দুইটি দিক এ যুগের পৃথিবীব্যাপ্ত তাঁর অনুরাগীদের মনে ভাস্বর দীপ্তি বিকীর্ণ করে তা হল: প্রথম, তাঁর স্ব-জীবনে উপলব্ধিজাত সাহিত্যের সৃজনধর্মিতা, দ্বিতীয়, অভিপ্রেত আদর্শলোকে পৌছাবার জন্য তাঁর আপসহীন অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম। বলা বাহুল্য, এই দুইটি অভিব্যক্তির মধ্যে টলস্টয়ের গতানুগতিকতা-বর্জিত বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বই যেন সজীব রূপ লাভ করেছে। Schlegel সাহিত্যকে যে Immortality of Speech বলে অভিহিত করেছেন, তা টলস্টয়ের সাহিত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। টলস্টয়ের বক্তব্য অমর, যেহেতু তা ছিল তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব-প্রভাবিত,—যে ব্যক্তিত্ব ছিল জীবনের সকল পরিস্থিতিতে সত্যানুসন্ধিৎসায় অটল। আদর্শকে বাস্তবে রূপদান করা মানুষ মাত্রেরই পক্ষে কঠিন কাজ—এ সত্য টলস্টয়ের অজ্ঞাত ছিল না। তবে আদর্শ লাভের জন্য সকল প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামই যে ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের অনন্যোপায়—এই সত্য টলস্টয়ের মত খুব কম জীবনশিল্পীই উপলব্ধি করেছিলেন। Life is a continuous struggle towards perfection—এই মনীষী-উক্তি টলস্টয়ের সংগ্রামী জীবনে পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করেছিল। সত্য ও শ্রেয় লাভের জন্য অবিচ্ছিন্ন জীবন-সংগ্রাম টলস্টয়ের ব্যক্তিত্বে

যে দৃপ্ত পৌরুষ সঞ্চার করেছিল, সার্ধ শত বৎসর পরও তার মহিমা অম্লান। আশা করা অহেতুক নয় যে, অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের জন্য তাঁর ব্যক্তিত্ব-মহিমা কালজয়ী হবে।

বর্তমান যুগে টলস্টয়ের সবল ব্যক্তিত্ব-প্রভাব এবং ভাবীকালে সে সে ব্যক্তিত্বের যথাযোগ্য স্থান নির্ণয়ে এ আশাবাদী বাক্য উচ্চারণ করার পরও টলস্টয়ের জীবন-স্বরূপ টলস্টয়-পাঠকের নিকট রহস্যই থেকে যায়। এ সম্পর্কে একজন চিন্তাশীল লেখক সাম্প্রতিক কালে যে মন্তব্য করেছেন তা উদ্ধারযোগ্য। তিনি লিখেছেনঃ

'টলস্টয়ের আধুনিক জীবনীকার আঁরি ত্রোইয়ার (Henry Troyat) হাজার পৃষ্ঠার বিপুলায়তন গ্রন্থটি পাঠ করার পরে টলস্টয়কে কি আমরা আরও সত্যতর এবং নিবিড়তর করে জানি? অনেক কাছের থেকে দেখি নিশ্চয়ই প্রায় সম্পূর্ণ জীবনটার অনবগুণ্ঠিত ছবি। তবু যেন টলস্টয়-রূপ রহস্যটি দুর্জ্ঞেয়ই থেকে যায়। খণ্ড খণ্ড ভাবে তার জীবনের অজস্র ফোটো-চিত্র যেন দেখি আমরা, অসংখ্য ঘটনার ছায়াচিত্রই বলতে গেলে। কিন্তু সেই আত্মিক ঐক্যসূত্রটি, সেই কেন্দ্রগত এক—যা বাইরে বহু-বিচিত্র হয়ে উঠেছে, সেই অন্ধকার ঘরের রাজাকে কেউ কি দেখতে পারে? যে টলস্টয় কেবলি বিবর্তিত হচ্ছেন, কেবলই হতাশায় ভুগছেন, আবার সহসা প্রাণের আবেগে হাউইর মত জ্বলতে জ্বলতে ঊর্ধ্বলোকে ছুটছেন, কোন প্রেরণা তাঁকে মদ ও জুয়ার আত্মহননের পথে ঠেলে দিচ্ছে, আবার তার বিপরীত আবেগে কৃচ্ছ্র সাধনার আর এক প্রান্তে নিয়ে আসছে, কী যে তাঁকে স্থির থাকতে দিচ্ছেনা,—না বিলাসী জীবনের কোলে, না সামারা'র বাসকিরদের সঙ্গে রূঢ় স্বাস্থ্যোজ্জ্বল প্রাণসার আদিম জীবনের বুকে; অমিত খ্যাতি, যশ, প্রতিষ্ঠা ও বিত্তের শিখর-চূড়াতেও কে তাঁর সব কিছু বিস্বাদ করে দিচ্ছে, কানে কানে জীবনের চরমতম প্রশ্ন—জীবন কি, সত্য কি, ঈশ্বর কি, ধর্ম কি,—উচ্চারণ করে বারংবার তাঁকে ব্যাকুল ও অস্থির করছে? সেই অন্তরতম রহস্যময় সত্তাটি—এই শত সহস্র খণ্ড চিত্রের মধ্যে, চিঠিপত্র, দিনলিপি, স্মৃতিকথার স্তূপের মধ্যে, তেমনি রহস্যই থেকে যায়।

…সব কবিসত্তাই দুর্জ্ঞেয় রহস্য। তাঁদের নিজের কাছেও সে রহস্য সম্যক উন্মোচিত হয় না। তবু তাঁরা অনুভবে সে সত্যকে প্রত্যক্ষ করেন মাঝে মাঝে। এবং আপন সৃষ্টিতে আপন গভীরতম সত্যকে উদ্‌ভাসিত করেন। সৃষ্টির আলোকেই বরং তাঁদের চেনা যায়—জীবনীগ্রন্থে ধরা পড়েন না তাঁরা। যা পড়ে তা দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্রের কাহিনী, কিম্বা ইয়াস্নায়া পলিয়ানার নিকোলাস ও মেরী টলস্টয়ের পুত্রের জীবনবৃত্ত। কিন্তু সেই রহস্যময় কবি-পুরুষেরা ঘটনার ভিড়ে যান হারিয়ে।

—'কবিরে পাবেনা কবির জীবন চরিতে'—এই সত্য অনেক পরিশ্রমের শেষে অমেরা আবিষ্কার করি।'

—তীর্থরেণু দাস, 'টলস্টয়-প্রসঙ্গ'
আলেখ্য, ৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা.
পৃঃ ২১৬-২১৭।

এই হল টলস্টয়-জীবনের অনির্ণেয় রহস্যময় রূপ। কালের দূরত্বে বসে আমরা সেই কীর্তি-ভাস্বর পরম রহস্যময় মহাজীবনের প্রতি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকি!

দ্বিতীয় অধ্যায়
টলস্টয়ের শিল্পজিজ্ঞাসা

পৃথিবীর শিল্পতাত্ত্বিকদের মধ্যে মনীষী টলস্টয় অন্যতম। শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর মূল্যবান ভাবনা জগৎব্যাপী শিল্পামোদী মহলে নতুন চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। তাঁর শিল্প-ভাবনার সঙ্গে সকলে একমত হবেন এমন আশা করা যায় না। আধুনিক বুদ্ধিমুক্তির যুগে তাঁর কোন কোন শিল্প-চিন্তাকে সংস্কারাচ্ছন্ন, এমনকি রক্ষণশীল মনে হবে। কিন্তু এই মননশীল শিল্পতাত্ত্বিক তাঁর শিল্পভাবনাকে এমন কতকগুলি অখণ্ডনীয় যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আধুনিক সংস্কারমুক্তির যুগেও যার মূল্য অস্বীকার করা শক্ত। টলস্টয়ের শিল্পচিন্তা বিষয়ে একটা বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষযোগ্য। শিল্পাদর্শ সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান সিদ্ধান্তগুলি কোন পুঁথিগত বিদ্যা থেকে আহৃত নয়। স্ব-জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং মৌলিক চিন্তা-উৎসারিত বলে তাদের মধ্যে এমন সজীবতা এবং দৃঢ়তা আছে—যা কেতাবী শিক্ষালব্ধ শিল্পচিন্তায় পাওয়া যায় না।

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে থেকে দীর্ঘকাল ব্যাপী টলস্টয়ের শিল্পচিন্তা বিভিন্ন বিষয়ের আশ্রয়ে বিকাশ লাভ করে। এই দীর্ঘ কালসীমায় তাঁর শিল্প-ভাবনা দশটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে। সে প্রবন্ধ গুলি 'হোয়াট ইজ আর্ট'? (What is Art?) নামে গ্রন্থবদ্ধ হয়ে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে। গ্রন্থধৃত তাঁর শিল্পচিন্তা এত স্বাধীন এবং স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত যে, রুশ সরকারী অধিকারিক কিছু কিছু পরিবর্তন না করে সেগুলি প্রকাশের অনুমতি দেননি। এতে টলস্টয়ের ক্ষোভের সীমা ছিল না। 'হোয়াট ইজ আর্টে'র ভূমিকায় সরকারী অধিকারিকের এই স্বৈরাচারী কর্মের বিরুদ্ধে টলস্টয়ের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ আছে। টলস্টয়ের সহযোগিতায় মূল রুশ ভাষা থেকে গ্রন্থটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন মিঃ এইলমার মড্। এই অনুবাদ-কর্মে টলস্টয়ের শিল্প সম্পর্কীয় মতামত যথাযথ ভাবে ব্যক্ত হওয়ায় টলস্টয় আন্তরিক সন্তোষ

প্রকাশ করেছিলেন। World's Classic Series-এ মিঃ মডের "What is Art and Essays on Art" নামে এই বিখ্যাত অনুবাদটি প্রকাশিত হয় ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই অনুবাদগ্রন্থ সমগ্র বিশ্বের শিল্পজিজ্ঞাসুদের নিকট অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে রুচিবিকৃতি এবং আদর্শহীনতা প্রকট হয়ে উঠেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে টলস্টয়ের আদর্শবাদী শিল্পভাবনার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নয়।

শিল্পতাত্ত্বিক হিসেবে টলস্টয়ের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর শিল্পসংজ্ঞা নির্ণয়ের মধ্যে। তাঁর মতে শিল্পী-উপলব্ধ অনুভূতি অপর মনে সঞ্চারিত করাই শিল্প। শিল্পের মধ্যে শিল্পীর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট উচ্চারিত।

নিজের অনুভূতিকে অপর মনে পৌছিয়ে দেওয়াকে টলস্টয় বলেছেন Infection বা সংক্রমণ। টলস্টয়ের মতে এই সংক্রমণের ক্ষমতাই শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিল্প সৃষ্টির উৎকর্ষও নির্ভরশীল এই সংক্রমণ-শক্তির ওপর। অর্থাৎ পাঠক দর্শক বা শ্রোতা যে পরিমাণে শিল্পী-উপলব্ধ অনুভূতি দ্বারা সংক্রমিত হন, শিল্পীর শিল্পসৃষ্টি সে পরিমাণে সার্থক। শিল্পীর অনুভূতির উৎসে কল্পনাও থাকতে পারে। তবে সে কল্পনাজাত অনুভূতি অকৃত্রিম হওয়া দরকার।

টলস্টয়ের মতে শিল্পোৎকর্ষের প্রধান সহায় 'ফর্ম'-এর যাথার্থ্য। অনু-ভূতির অকৃত্রিমতা এবং ফর্ম-এর যথার্থ্য ছাড়াও শিল্পোৎকর্ষের মান মুখ্যত নির্ভরশীল মানবজাতির পক্ষে তা কি পরিমাণে হিতকর—সে বিচারের ওপর। টলস্টয় ছিলেন একান্তভাবে মানবতাবাদী শিল্পী। তাঁর মতে জীবনের প্রত্যেকটি কর্তব্যকর্মের মত শিল্পকর্মেরও একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকা উচিত। সে উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে মানব জাতির মঙ্গল সাধন-প্রয়াস। তাঁর বিবেচনায় মানবহিতের লক্ষ্য নিয়ে সৃষ্ট শিল্পই উৎকৃষ্ট, মানুষের ক্ষতিকারক শিল্প নিকৃষ্ট।

এখানেই আধুনিক শিল্পীর শিল্পবোধের সঙ্গে টলস্টয়ের শিল্প-উপলব্ধির পার্থক্য। আধুনিক শিল্পীর মতে সৌন্দর্য সৃষ্টি, রম্যতা সৃষ্টি এবং উপভোগ্যতা উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মের একমাত্র মানদণ্ড—শিল্পকর্ম মানব জাতির পক্ষে

হিতকর কিনা তা শিল্পীর বিবেচ্য নয়। অপর পক্ষে টলস্টয়ের দৃঢ় প্রত্যয়, মানব জাতিকে প্রগতির পথে এগিয়ে নেবার বাহন হিসেবে শিল্প বিজ্ঞানের মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

টলস্টয় অনুভূতির যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন, তাও বেশ স্বাতন্ত্র্য-পূর্ণ। তাঁর মতে 'যা ধর্মীয় বোধ থেকে উৎসারিত তাই অনুভূতি।' 'সহজ অনুভূতি' প্রভাবে একজন কৃষক সন্তানও শিল্প চেতনাসম্পন্ন হতে পারে আবার এ পর্যায়ের অনুভূতির অভাব ঘটলে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিও শিল্পচেতানাহীন হতে পারেন। শিল্পের সত্য বাস্তব সত্য থেকে পৃথক বস্তু। শিল্পের সত্য কল্পিত বিষয়—এমনকি অদ্ভুত কোন বস্তুকে কেন্দ্র করেও গড়ে উঠতে পারে।

টলস্টয়ের দৃষ্টিতে শিল্পরাজ্য ব্যাপক। 'হোয়াট ইজ আর্ট'-এর অন্তর্ভুক্ত 'এমিয়েলস জর্নাল' প্রবন্ধে (১৮৯৩) তিনি বলেছেন, 'দার্শনিক, উপদেশাত্মক এবং শৈল্পিক—বিভিন্ন পর্যায়ের সাহিত্যে পারস্পরিক সঙ্গতি থাকতে পারে।

টলস্টয়ের শিল্প-মতবাদ মুখ্যত মানবহিত এবং মানুষের প্রয়োজন বোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। নীতি এবং ধর্মবোধের অবস্থান শিল্পের-ভিত্তিতে থাকা অপরিহার্য হলেও শিল্পের অন্যতম লক্ষ্য যে আনন্দসৃষ্টি —এ বিষয়ে তাঁর মনে কোন দ্বিধা ছিল না। 'হোয়াট ইজ আর্ট'-এর অন্তর্গত 'বিদ্যালয়ের বালকেরা এবং শিল্প' (১৮৬১) নামক প্রবন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, —'মাত্র প্রয়োজনের জন্যই সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব নয়, প্রয়োজন ব্যতীত সৌন্দর্য নামক বস্তুরও অস্তিত্ব আছে। এবং শিল্প হল সে সৌন্দর্য'। সৌন্দর্য বলতে টলস্টয় অবশ্য বুঝতেন নৈতিক সৌন্দর্য এবং মঙ্গল।

টলস্টয়ের মতে যা মানব জীবনের মঙ্গল পথের নির্দেশক, তাই শিল্পের সত্য। শুধুমাত্র জীবন-যন্ত্রণা এবং সে যন্ত্রণা থেকে মুক্তির বর্ণনা শিল্পের সত্য নয়। যে রচনা জীবনের ভালোমন্দের নির্দেশ দিতে পারে না, তাকে শিল্পের সত্য বলা যায় না। টলস্টয়ের উপলব্ধিতে সত্য সার্বজনীন এবং আবহমান কাল-প্রবাহিত। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়, যে রচনায়

সেই শাশ্বত সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না, তা যতই সুন্দর হোক না কেন, তাকে শিল্প-রচনা বলা যায় না।

'এমিয়েলস জর্নাল' বিষয়ক প্রবন্ধে টলস্টয় আরও বলেছেন, আত্ম-প্রকাশের জন্য গভীর এবং ঐকান্তিক প্রয়াসই শ্রেষ্ঠ শিল্পের লক্ষণ।

শিল্পসৃষ্টির বিষয়বস্তু সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা ব্যক্ত করেছেন টলস্টয় উক্ত গ্রন্থের 'সেমিনভের কৃষক গল্পের ভূমিকা' (১৮৯৪) প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য, শ্রেষ্ঠ শিল্পের বিষয়বস্তু হবে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়। জীবনের অভিনব দিকের উদ্‌ঘাটন শিল্পসৃষ্টির অপরিহার্য অঙ্গ। উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টির জন্য প্রয়োজন ফর্মের সঙ্গে বিষয়বস্তুর পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য।

'Introduction to the Works of Guy De Maupassant' (1894) প্রবন্ধে মোপাসাঁর শিল্পপ্রতিভা নির্ণয় প্রসঙ্গে টলস্টয় এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন, বিষয়ের সঙ্গে শিল্পীর নৈতিক সম্পর্কের অভাব ঘটলে শিল্পসৃষ্টি কখনও উৎকর্ষ লাভ করে না। নৈতিক সম্পর্কের অভাব বলতে টলস্টয় বোঝাতে চেয়েছেন,—ভালোমন্দের পার্থক্য সম্পর্কে শিল্পীর জ্ঞানের অভাব। মোপাসাঁর Une Vie নামক উপন্যাসকে টলস্টয় হুগোর Les Miserables-এর পরে ফরাসী সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। যেহেতু এই উপন্যাসের মর্মগত বিষয়ের সঙ্গে লেখকের যথার্থ অর্থাৎ নৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান। এই অপূর্ব সৃষ্টির রূপকর্মের সৌন্দর্যের সঙ্গে লেখকের সহমর্মিতা যুগপৎ আত্ম-প্রকাশ করেছে বলে টলস্টয়ের বিশ্বাস। তাঁর মতে শিল্পকর্ম হিসেবে এ উপন্যাস উৎকৃষ্ট, যেহেতু এ উপন্যাসে লেখক অন্যায় এবং অশুভকে ঘৃণা করেছেন এবং মঙ্গলকে ভালোবেসেছেন।

টলস্টয়ের একান্ত প্রত্যয়, বিষয়বস্তুর প্রতি লেখকের ঔদাসীন্য, দ্রুততা, অবাস্তবতা এবং নৈতিক আদর্শের অনুপস্থিতি শিল্পমানের অবনয়ন ঘটায়। Une Vie উপন্যাসে শিল্প-সার্থকতা লাভের পর মোপাসাঁ তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে শিল্পাদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন উল্লেখিত কারণে। টলস্টয় মোপাসাঁর শিল্পাদর্শ-বিচ্যুতির যে কারণ

গুলির উল্লেখ করেছেন, শিল্পসৃষ্টি মাত্রেরই মানের অবনয়ন সম্পর্কে তা সমান ভাবে সত্য। তিনি বলেছেন, লোকরঞ্জক রচনার জন্য মোপাসাঁর প্রচুর অর্থলাভ এবং প্রকাশক, সংবাদপত্র, পাঠক-পাঠিকা—বিশেষত পাঠিকা মহলে তাঁর উপভোগ্য উপন্যাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোপাসাঁকে তাঁর শিল্পাদর্শ-ভ্রষ্ট করেছে। এই চাহিদা মেটাতে মোপাসাঁর রচনায় এসেছিল অপরিহার্য দ্রুততা এবং তদনুষঙ্গী কৃত্রিমতা। জনমনোরঞ্জন প্রধান লক্ষ্য হওয়ায় ইন্দ্রিয়পরায়ণতার অনাবৃত উদ্ঘাটনই তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলির বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়—বিশেষ ভাবে Notre Coeur এবং Jvette-তে। এগুলির নৈতিক ভিত্তি খুবই শিথিল। Notre Coeur—এ যৌন মিলনের যে আনন্দানুভূতির কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে লেখক যেন একাত্ম। যে সম্ভোগ-বিলাসী ফরাসী সমাজে মোপাসাঁ এবং তাঁর অনুবর্তীরা বাস করতেন, তাঁরা সৌন্দর্য বলতে বুঝতেন—সুন্দরী যুবতী এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নগ্ন নারীর সৌন্দর্য এবং সে পর্যায়ের নারীর সঙ্গে যৌন সংযোগ। খ্রীষ্টীয় উপলব্ধিজাত সৌন্দর্যের আদর্শ গ্রহণ না করে তাঁর সমকালীন সৌখীন সমাজের দেহগত সৌন্দর্যের আদর্শ গ্রহণ করায় মোপাসাঁর মত উচ্চ মানের শিল্পীর শেষ পর্যায়ের উপন্যাসগুলি শিল্পাদর্শ বিচ্যুত হয়ে জনমনোরঞ্জক পণ্য সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে।

টলস্টয় মনে করেন, উপন্যাস মানব জীবনের সামগ্রিক শিল্পরূপ বলে সকল ঔপন্যাসিকেরই ভালমন্দ নীতি-দুর্নীতি সম্পর্কে স্বচ্ছ এবং দৃঢ় প্রত্যয় থাকা প্রয়োজন। জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন, সুনির্দিষ্ট এবং যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ঘটলে উচ্চমানের শিল্পসৃষ্টি কখনই সম্ভব হয় না। আপাতরম্য এবং জনগণ প্রশংসিত হলেও তা উৎকৃষ্ট শিল্প-সৃষ্টির পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয় না।

মোপাসাঁর ছোটগল্পগুলি মুখ্যত নৈতিক অনুভূতির প্রেরণায় লিখিত হয়েছিল বলে সেগুলির শিল্প-সার্থকতা সর্বজন-স্বীকৃত। উপন্যাসে বাস্তবতা সৃষ্টি প্রয়াসে নরনারীর দৈহিক সম্পর্ককে ঐকান্তিক প্রাধান্য দেওয়ায় মোপাসাঁ যে ট্র্যাজিক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা একটি

নিঃসঙ্গতার অবস্থা। অন্তর্জগতে মিথ্যার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে তাঁর অন্তরে একটি আত্মিক জন্ম-যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল। তাঁর ছোট গল্পগুলিতে এই জন্ম-যন্ত্রণাই অভিব্যক্তি পেয়েছে।

টলস্টয়ের মতে শিল্পীর অন্তর্নিহিত এই আত্মিক জন্ম-যন্ত্রণা শিল্প সার্থকতা লাভের প্রধান উপায়।

শিল্প কি, অ-শিল্পই বা কি, তুচ্ছ এবং অসৎ শিল্প থেকে সৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের পার্থক্য কোথায়—এই জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে টলস্টয় প্রথমে কয়েকটি শিল্প-মতবাদের উল্লেখ করেছেন ঃ

প্রথম,—উদ্দেশ্যমূলক শিল্প। অর্থাৎ সে বস্তুই শিল্প নামের যোগ্য —যার বিষয়বস্তু গুরুত্বপূর্ণ, প্রয়োজনীয়, মঙ্গলমুখী, নৈতিক এবং উপ দেশাত্মক। এই মতানুযায়ী সৌন্দর্যের প্রচ্ছায়ে অলংকৃত ধর্মীয়, নৈতিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়বস্তুও শিল্প।

দ্বিতীয়,—নান্দনিক বা কলাকৈবল্যবাদী মতে শিল্পের অস্তিত্ব নির্ভরশীল তার প্রকাশ-সৌন্দর্যে। শিল্প-কৌশলের সাহায্যেই সৌন্দর্য-সৃষ্টি সম্ভব। আনন্দপ্রদ অনুভূতি সৃষ্টিই এই পর্যায়ের শিল্পের লক্ষ্য।

তৃতীয় - বাস্তবের যথাযথ প্রতিফলনের মধ্যেই শিল্পের অস্তিত্ব। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বা সৌন্দর্য সৃষ্টির স্থান এ পর্যায়ের শিল্পে গৌণ।

টলস্টয়ের বিশ্বাস, এই সমস্ত পরস্পরবিরোধী এবং বিচ্ছিন্ন শিল্প-মতবাদ শিল্প এবং অ-শিল্পের মধ্যে বিভেদ-রেখা টানতে অক্ষম। অপরপক্ষে কোন কোন শিল্প-মতবাদ তুচ্ছ এবং অমঙ্গলজনক ভাববস্তুকে শিল্পের পরিধিতে নিয়ে এসে শিল্পরাজ্যের সীমা প্রসারিত করেছে।

তা হলে প্রশ্ন ওঠে, সৎ এবং শ্রদ্ধেয় শিল্পকর্মের সঙ্গে অ-সৎ এবং অশ্রদ্ধেয় শিল্পকমের পার্থক্য কোথায়? প্রকৃত শিল্পকর্মের পরিচয় কী?

এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে টলস্টয় শিল্পের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য এবং লক্ষ্য সম্পর্কে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা সর্বকালে মূল্যবান বিবেচিত হবার যোগ্য।

টলস্টয়ের মতে শিল্প একটি বিশেষ মানসক্রিয়া, সে ক্রিয়ার লক্ষ্য

বৈষয়িক প্রয়োজন সাধন নয়,—বরং মানুষের মনে সেই জাতীয় আনন্দের সৃষ্টি—যা আত্মার সমুন্নতি বিধান করে এবং উত্তরণ ঘটায়। শিল্পক্রিয়া অপরাপর ক্রিয়া থেকে পৃথক। যেহেতু 'শৈল্পিক তৃপ্তি' বিধানই সে ক্রিয়ার একমাত্র লক্ষ্য। শিল্পীর তীব্র অনুভূতি শিল্পকর্মে রূপলাভ করলেই তিনি আনন্দ অনুভব করেন। শিল্পী-মনের সে আনন্দ অপর চিত্তেও সঞ্চারিত হয়। এই সঞ্চরণ-ক্রিয়া অপর কর্ম থেকে পৃথক,—যেহেতু তা গুরুত্বপূর্ণ এবং মানব সমাজের পক্ষে হিতকর। যে ক্রিয়া মানুষকে অমঙ্গলের দিকে প্রলুব্ধ করে তাকে টলস্টয় শিল্পকর্ম বলে স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে যে মানস-ক্রিয়া মানুষের মানস-দিগন্ত প্রসারিত করে, অধ্যাত্ম-সম্পদ বৃদ্ধি করে—তা মানবজাতির মূলধন।

টলস্টয়ের মতে প্রকৃত শিল্পসৃষ্টির জন্য নিম্নোক্ত গুণগুলি অপরিহার্য :

প্রথমত, শিল্পের বিষয়বস্তু হবে অভিনব এবং মানব সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয়, শিল্পরূপ হবে সর্বজনবোধগম্য।

তৃতীয়, শিল্পসৃষ্টির উৎসে থাকবে শিল্পীর অন্তর্নিহিত কোন সন্দেহ নিরসনের প্রয়াস।

যে সৃষ্টিতে উক্ত যে কোন একটি গুণের অভাব ঘটে তাঁর মতে তা শিল্পকর্মই নয়।

প্রয়োজনীয় বলতে টলস্টয় লক্ষ্য করেছেন সে সমস্ত মঙ্গলজনক বা নৈতিক বিষয়কে,—যা সর্ব-সাধারণের পক্ষে সমান গুরুত্বপূর্ণ। অ-মঙ্গল এবং অ-নৈতিক তাঁর মতে সেই বস্তু—যা মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে এবং বিচ্ছিন্নতাজনিত যন্ত্রণা বৃদ্ধি করে। যাকে মানুষ পূর্বে বোঝেনি বা ভালোবাসেনি তাকে বুঝতে এবং ভালোবাসতে শেখাকেই তিনি বলেছেন 'গুরুত্বপূর্ণ।' অভিব্যক্তির সর্বোচ্চ সীমা রূপকর্মের সর্বজনবোধগম্যতায়। টলস্টয়ের উপলব্ধিতে সে বস্তুই সুন্দর যা স্বচ্ছ, সংহত এবং সুনির্দিষ্ট। যে সৃষ্টি অস্পষ্ট, অসংহত এবং অনির্দিষ্ট তা রূপকর্মের নিম্নতম সীমায় অবস্থিত।

বস্তুর যথাযথ প্রকাশকেই টলস্টয় সাহিত্যের বাস্তব বলে স্বীকার করেন নি। শিল্পীর আত্মার জগতে যা সঞ্চরমান, তাঁর মতে তাই বাস্তব। একমাত্র সত্যবোধের দ্বারাই বাস্তবতার ধারণা সৃষ্টি হয়।

বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিল্পীর আন্তরিক সংযোগেই হয় উচ্চাঙ্গের শিল্পসৃষ্টি। সেই সংযোগ কৃত্রিম বা মিথ্যা হলে শিল্পসৃষ্টির মান নিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে।

টলস্টয়ের বিবেচনায় নিম্নোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্যের অভাব ঘটলে সে শিল্প অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য ঃ

১) যে শিল্পের বিষয়বস্তু গুরুত্বহীন।

২) যে শিল্প বহিরঙ্গের সৌন্দর্যবঞ্চিত।

৩) যে শিল্পের অভিব্যক্তি গভীর আন্তরিকতাবর্জিত।

টলস্টয় মনে করেন, শিল্পকর্মের মূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে তিনটি দিক থেকে ঃ

১) যে শিল্পকর্মের বিষয়বস্তু সুন্দর, তবে আন্তরিকতাহীন।

২) যে শিল্পের বিষয়বস্তু মূল্যবান কিন্তু যার অভিব্যক্তির সৌন্দর্য এবং আন্তরিকতার পরিমাণ কম।

৩) যে শিল্পকর্মের বিষয়বস্তু দীন, অথচ যা সুন্দর এবং আন্তরিক।

বিভিন্ন যুগের শিল্প-অভিব্যক্তিতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে ঃ

১) ক্লাসিক্যাল যুগে বিষয়বস্তুর তাৎপর্যের ওপর দাবি ছিল বেশী।

২) মধ্যযুগে সৌন্দর্যের দাবি বৃদ্ধির সঙ্গে তাৎপর্য এবং আন্তরিকতার দাবি হ্রাস পেতে থাকে।

৩) বর্তমান যুগে সৌন্দর্য ও তাৎপর্যের দাবিকে নিম্নে স্থান দিয়ে আন্তরিকতা ও সত্যাশ্রয়িতার দাবির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

শিল্পমূল্য বিচারে আজকাল বিষয়বস্তু বা ফর্মের সৌন্দর্য অথবা শিল্পীর আন্তরিকতা কিংবা সত্যাশ্রয়িতার ওপর জোর দেওয়া হয়। একটি মাত্র বৈশিষ্টের ওপর জোর দেওয়ায় বিভিন্ন শিল্প-মতবাদ জন্ম নিয়েছে। শিল্পের সামগ্রিক তাৎপর্য-উপলব্ধিহীন সৃজনকর্ম চলতে

থাকায় এ যুগে শিল্পের নামে যা সৃষ্টি হচ্ছে—টলস্টয়ের মতে তা মূর্খতা বা আবর্জনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

টলস্টয় মনে করেন, নিম্নোক্ত তিনটি শিল্প-বৈশিষ্ট্যকে পৃথক করে দেখবার ফলেই শিল্প জগতের মান অবনমিত হচ্ছে :

প্রথম, উদ্দেশ্যমূলক শিল্পে শুধুমাত্র নৈতিক বিষয়বস্তুর ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি এবং আত্মিক গভীরতাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে।

দ্বিতীয়, কলাকৈবল্যবাদী মতে শুধুমাত্র ফর্ম-এর সৌন্দর্যকেই শিল্পের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে।

তৃতীয়, বিষয়বস্তু তুচ্ছ এবং কুৎসিৎ হওয়া সত্ত্বেও তার সঙ্গে শিল্পীর সম্পর্ক আন্তরিক বা সত্যাশ্রয়ী হলে এবং সৃজনকর্মে ফর্ম-এর সৌন্দর্য অল্পবিস্তর দেখা গেলেই তাকে শিল্পসৃষ্টি বলা হচ্ছে।

টলস্টয়ের একান্ত প্রত্যয়, অভিনব বস্তুর গুরুত্ব উপলব্ধির জন্য শিল্পীমনে জ্ঞানের সঞ্চয় থাকা দরকার। শিল্পীর বিচ্ছিন্ন স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক জীবনচর্যা ঐ উপলব্ধির পরিপন্থী। উপলব্ধির জন্য শিল্পীকে সাধারণ মানব-জীবনের অংশ গ্রহণ করতে হবে।

টলস্টয় মনে করেন, উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টির জন্য শিল্পীকে লোভ এবং অহংকারের উর্ধ্বে উঠতে হবে। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্য নিয়ে তিনি শিল্প রচনায় অগ্রসর হবেন না, একমাত্র অন্তরের তাগিদেই তিনি শিল্প রচনায় মনোযোগী হবেন।

আধুনিক অধিকাংশ শিল্পীর ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে টলস্টয় বলেছেন, তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিনব কোন অনুভূতির আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করতে রাজী নন। তাঁরা লোকপ্রিয় সাময়িক বিষয়কে শিল্পসৃষ্টির উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং আয়াসসাধ্য কলা-কৌশলের সাহায্যে সে বিষয়টিকে শৈল্পিক রূপ দেন। যে জীবনদৃষ্টির সাহায্যে তারা শিল্প-রচনায় অগ্রসর হন তা গভীর চেতনা-উদ্ভূত নয়—তাৎক্ষণিক।

আধুনিক শিল্প রচনার এই প্রবণতা লক্ষ্য করে টলস্টয় মন্তব্য

করেছেন,—এ যুগে কারু-শিল্পের মত শিল্প জগতে উৎপাদন যান্ত্রিকভাবে বেড়েই চলেছে। শিল্প রচনার স্বীকৃত বৈশিষ্ট্যগুলি অনুসরণ না করে যা সৃষ্টি হচ্ছে টলস্টয় তাকে প্রকৃত শিল্প না বলে বলেছেন 'ছদ্ম শিল্প'।

টলস্টয় মনে করেন, ফরমায়েসী সৃজনকর্ম শিল্প নয়। শিল্প শিল্পীর অন্তর্নিহিত জীবনচেতনার অভিব্যক্তি—একটি আবির্ভাব (Revealation)—যা মানবজাতিকে প্রগতির পথে আকর্ষণ করে।

টলস্টয় বলেন, এ যুগে অজস্র অর্থ এবং অপরিমেয় শ্রমের সাহায্য জীবনের কৃত্রিমতার অভিব্যক্তি দানকেই শিল্প বলে ভুল করা হচ্ছে। এই ভ্রমাত্মক ধারণা থেকে মুক্তির জন্য শিল্পের স্বরূপ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণায় আসা প্রয়োজন। বিভিন্ন শিল্প-মতবাদীদের মধ্যে সাধারণভাবে এটা স্বীকৃত যে, যা সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তাই শিল্প। সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন ওঠে,—সৌন্দর্য কী?

টলস্টয়ের দৃষ্টীতে সৌন্দর্য

সুক্ষ্ম বিশ্লেষণের সাহায্যে টলস্টয় দেখিয়েছেন, যা আমাদের দর্শনিন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধান করে তাই সুন্দর। 'ভাল' শব্দটির অর্থব্যঞ্জনার মধ্যেও সুন্দরের ধারণা অন্তর্নিহিত। সমস্ত য়ুরোপীয় ভাষায় 'সুন্দর' শব্দ 'চমৎকারিত্ব', 'সহৃদয়তা' অর্থও প্রকাশ করে। রুশ ভাষায় 'সৌন্দর্য' শব্দটি যে অর্থ অর্জন করেছে তা হল 'ভাল'। টলস্টয় বলেন, মঙ্গলবিশিষ্ট সৌন্দর্যের যে ধারণা এ যুগের নন্দনতত্ত্বের ভিত্তি ও লক্ষ্য—সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টল প্রভৃতি থেকে প্লটিনাস পর্যন্ত প্রাচীনদের সে ধারণা ছিল না।

টলস্টয়ের বিবেচনায় সৌন্দর্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত রুচির প্রশ্নও জড়িত এবং এই রুচিনির্ভর সৌন্দর্য চেতনা শিল্পজগতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। এই বৈচিত্র্য সৌন্দর্য এবং শিল্প সম্পর্কে নিত্য নতুন মতবাদের জন্ম দিয়েছে —যা মোহময় বিভ্রান্তিতে পূর্ণ এবং অনেক ক্ষেত্রে স্ব-বিরোধী। কেউ কেউ নন্দনতত্ত্বের রাহস্যিক ভিত্তি খোঁজেন, আবার কেউ কেউ রুচির প্রশ্নে সৌন্দর্যের বিচার করেন। সাম্প্রতিক কালে শরীরতত্ত্বের নিয়মপদ্ধতির মধ্যেও সৌন্দর্যের উৎস খোঁজা হচ্ছে। সালি (Sulby) প্রমুখ আর এক

দল নন্দনতাত্ত্বিক সৌন্দর্যের ধারণাকে সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়ে শিল্পকে কোন স্থায়ী বস্তু অথবা চলমান ক্রিয়ার সৃষ্টি বলে অভিহিত করেছেন।

সৌন্দর্য এবং শিল্পরাজ্যের এই গহন অরণ্যে প্রবেশ করলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় বলে সৌন্দর্য এবং শিল্পের একটি পরিচ্ছন্ন সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন টলস্টয়।

তিনি বলেছেন, শিল্প এবং সৌন্দর্যের বস্তুমুখী সংজ্ঞাকে অস্বীকার করলে সৌন্দর্যের নন্দনতাত্ত্বিক সংজ্ঞা দুটি মৌলিক ধারণার দিকে আমাদিগকে চালিত করে। প্রথম, সৌন্দর্য এমন বস্তু যার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। দ্বিতীয়, সৌন্দর্য ব্যক্তি-অনুভূত এক ধরনের আনন্দ যার সঙ্গে বস্তুগত সুযোগ-সুবিধা লাভের কোন সম্পর্ক নেই।

সৌন্দর্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ধারণা শুধুমাত্র পাশ্চাত্ত্যের মননশীল দার্শনিকদের মধ্যে নয়, সে ধারণা বহু ব্যাপ্ত, বিশেষ করে প্রবীণদের মধ্যে।

দ্বিতীয়ত, আনন্দই যে সৌন্দর্য—এই মত মুখ্যত ইংরেজ নন্দনতাত্ত্বিকদের কাছে প্রিয়। হালফিল তরুণেরা এই মতের অনুগামী।

উক্ত মতের প্রেক্ষিতে টলস্টয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, সৌন্দর্যের দুটির বেশী সংজ্ঞা হতে পারেনা। প্রথমটি, রাহস্যিক—যা সৌন্দর্যকে উচ্চতম সম্পূর্ণতা অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। এই সংজ্ঞা অদ্ভুত,—অনস্তিত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি ব্যক্তিধর্মী বলে খুবই সহজ এবং বোধগম্য। এই মত অনুসারে আনন্দদায়ক বস্তুমাত্রই সুন্দর। বলা বাহুল্য, এই আনন্দ লভ্য কোন বৈষয়িক লাভে নয়, চিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত তৃপ্তিতে।

অর্থাৎ একদিকে সৌন্দর্যকে খুবই রাহস্যিক এবং উচ্চ স্তরের বস্তু হিসেবে দেখা হয়। অপর দিকে সৌন্দর্য নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ ছাড়া কিছু নয়।

সৌন্দর্যের আত্মগত এবং বস্তুবাদী প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে টলস্টয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, সৌন্দর্যের উভয় ধারণা একই বস্তু—যাকে বলা যেতে পারে শিল্প-উপভোক্তাদের এক ধরনের আনন্দ। অর্থাৎ যা চিত্তে আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক না করে মানসিক তৃপ্তি বিধান করে—তাই সৌন্দর্য। সৌন্দর্যের বস্তুতগ কোন সংজ্ঞা নেই। শিল্প সৌন্দর্যের উদ্বোধক

এবং সৌন্দর্য সেই বস্তু যা লালসা উদ্রেক না করে মানসজগতে আনন্দবোধ জাগ্রত করে।

এমন অনেক গ্রন্থ আছে যেগুলিতে নৈতিকতার দাবি স্বীকৃত না হলেও শিল্পসৃষ্টি হিসেবে উৎকৃষ্ট বিবেচিত। যেমন, শেকসপীয়রের রোমিও ও জুলিয়েট, গ্যেটের উইলহেল্‌ম মেইস্টার (Wilhelm Maister)। এ কারণে গুরুত্বের দাবিকে টলস্টয় শিল্পের ভিত্তি হওয়া উচিত বিবেচনা করেছেন। তাঁর বিবেচনায় এই ভিত্তির ওপর শিল্প-সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হলে ভাল হয়।

টলস্টয় আরও বলেন, রসনার তৃপ্তি যেমন খাদ্যের গুণ বিষয়ক সংজ্ঞা নির্ণয়ের ভিত্তি হতে পারেনা, তেমনি যে সৌন্দর্য শুধুমাত্র আমাদের তৃপ্তি দান করে, তা কোন ক্রমে শিল্প-সংজ্ঞার ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না।

শিল্পের লক্ষ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি, সৌন্দর্য আনন্দ দান করে, শৈল্পিক আনন্দ উৎকৃষ্ট এবং মূল্যবান বস্তু—এগুলি আদৌ কোন শিল্প সংজ্ঞা নয় বলে টলস্টয়ের সুচিন্তিত অভিমত। তিনি মনে করেন, এ সমস্ত মন্তব্য তালগোল পাকিয়ে প্রচলিত শিল্পকে সমর্থন করার একটা উপায় মাত্র।

সুতরাং শিল্প বিষয়ক বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচিত হলেও এ পর্যন্ত কোন শিল্প-সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়নি। টলস্টয়ের মতে এর একমাত্র কারণ, সৌন্দর্যের ধারণার ওপরেই শিল্প-বিষয়ক ধারণার ভিত্তি গড়ে উঠেছে।

॥ দুই ॥

শিল্পের সংজ্ঞা নির্ণয়ে টলস্টয় অপরাপর শিল্প-তাত্ত্বিকের চাইতে স্বতন্ত্র দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। ত'র মতে সংক্রমণ শক্তিই (Power of Infection) শিল্পসংজ্ঞার ভিত্তি হওয়া উচিত। যেহেতু সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যক্তিমন যখন অপর মনের দ্বারা সংক্রমিত হয় তখনি হয় শিল্পের জন্ম।

যে অনুভূতির সাহায্যে শিল্পী অপরকে সংক্রমিত করেন, পরিমানভেদে তা খুব তীব্র বা খুব মৃদু, খুব গুরুত্বপূর্ণ বা খুব তুচ্ছ বা খুব উত্তম—নানা ধরনের হতে পারে।

শিল্পী-অন্তরে যে অনুভূতি জাগ্রত হয় অপর অন্তরে তা সঞ্চার করাই হল শিল্পের ক্রিয়া। সুতরাং শিল্পীর অন্তরজাত অনুভূতি অপর মনে সঞ্চারিত হওয়াকে বলা যেতে পারে শিল্প।

সঞ্চরণ-ক্রিয়া কোন বিশেষ যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। যুগ থেকে যুগান্তরের দিকে তার গতি অব্যাহত। শিল্পী স্ব-যুগের মানুষের মনে যেমন প্রবেশাধিকার পান, তেমনি পান অপর যুগের মানুষের মনেও। শিল্প বিভিন্ন যুগের মানুষের মধ্যে মিলন-সেতু রচনায় সাহায্য করে।

সংক্রমণ শক্তির অভাব ঘটলে মানুষে মানুষে ঘটে বিচ্ছিন্নতা—যার পরিণতিতে মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় পারস্পরিক বৈরিতা।

শিল্পের মাধ্যমে পারস্পরিক সংক্রমণ ঘটে বলে মানুষের জীবনে শিল্পক্রিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

টলস্টয় সব চাইতে বেশী জোর দিয়েছেন ধর্মীয় চেতনা-উৎসারিত অনুভূতির ওপর। সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রভৃতি পূর্ব যুগের মনীষীরা শিল্পকে এ ভাবে দেখেছিলেন। হীব্রু ভবিষ্যৎ-বক্তারা, প্রাচীন খ্রীস্টানেরা এবং মুসলমানেরাও শিল্পকে এ ভাবে দেখে থাকেন। ধর্মপ্রবৃত্তিসম্পন্ন কৃষক জনসাধারণও শিল্পকে এভাবে বুঝে থাকেন।

শিল্পের ধর্মীয় উৎসকে স্বীকার করে কোন কোন প্রাচীন ধর্মাবলম্বী শিল্পের অপরাপর উৎসকে সরাসরি অস্বীকার করেছেন। শিল্পের ধর্মীয় চরিত্রের ওপর প্রাধান্য দেওয়ায়-কোন প্রকার শিল্প-বিকৃতির ভয়ে তাঁরা ভীত হতেন।

এই যুগের আনন্দবাদী শিল্প-প্রেমিকদের ভয়, পাছে তারা শিল্পসম্ভব কোন প্রকার আনন্দ উপভোগ থেকে বঞ্চিত হন। এই ভয়ের অনুভূতির প্রভাবেই তারা যে কোন প্রকার শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

টলস্টয় মনে করেন, শেষোক্ত ভুল প্রথম ভুল থেকে অনেক বেশী স্থূল এবং পরিণামও অনেক বেশী মারাত্মক।

টলস্টয়ের দৃষ্টিতে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট শিল্প

শিল্পের মোটামুটি সংজ্ঞা নির্দেশের পর টলস্টয় উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট শিল্পের পার্থক্য নির্ণয় করেছেন।

টলস্টয়ের মতে যে শিল্প জনসাধারণের মঙ্গলার্থে ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন

দেবার প্রেরণা জোগায়, কিংবা পূর্বপুরুষদের গৌরব বৃদ্ধি এবং ঐতিহ্য রক্ষার জন্য আনন্দানুভূতির অভিব্যক্তি দেয়, —সে শিল্পই উৎকৃষ্ট। যে অকৃত্রিম অনুভূতিজাত শিল্পসৃষ্টি বাসনাকে তীব্র করে তোলে, তা অসৎ-শিল্প।

টলস্টয়ের মতে ধর্মীয় চেতনা যেমন শিল্পের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ণয়ের মানদণ্ড, তেমনি শিল্প-সঞ্চারিত অনুভূতিরও মূল্য নির্ণয় করে। প্রকৃত খ্রীস্টীয় ধর্মাদর্শের অনুসরণই তার মতে ধর্মচেতনা গির্জা-প্রভাবিত যে ধর্ম-চেতনা পরবর্তীকালে বিত্তবান শ্রেণীর মানুষের জীবনে বিকৃতি এনে দিয়েছিল, তা প্রকৃত ধর্মচেতনা নয়। কালক্রমে অভিজাত সমাজে শিল্পের যে পুনরুজ্জীবন ঘটল—সে শিল্প ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্মীয় দৃষ্টি-ভঙ্গী-বর্জিত হওয়ায় তাদের সামনে শিল্পোৎকর্ষ বিচারের কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি ছিল না। এ অবস্থায় আনন্দ এবং সৌন্দর্যকেই তারা শিল্পোৎকর্ষ বিচারের চরম মানদণ্ড হিসেবে মেনে নিলেন। য়ুরোপীয় সমাজের অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা এভাবে প্রাচীন গ্রীকদের স্থূল জীবন-ধারণের যুগে ফিরে গিয়েছিলেন—যে ধারণাকে প্লেটো বহুকাল পূর্বে ধিক্কৃত করেছিলেন।

ভোগবাদী জীবন-ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরবর্তী কালে একটি শিল্প-মতবাদও গড়ে উঠল।

শিল্প বিবর্তনের এই ঐতিহাসিক ধারা বিশ্লেষণ করে টলস্টয় দেখিয়েছেন, অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে এভাবে যে শিল্প-মতবাদ গড়ে উঠল তা মুখ্যত সৌন্দর্যনির্ভর। সৌন্দর্যবাদী মতবাদের সমর্থনে শিল্প-তাত্ত্বিকেরা দাবি করলেন, প্রাচীন গ্রীকদেরও শিল্পোৎকর্ষ বিচারের ঐকান্তিক মাপকাঠি ছিল সৌন্দর্য।

শিল্প-বিচারের ঐতিহাসিক ধারা বিশ্লেষণের পর টলস্টয় শিল্পোৎকর্ষ সম্পর্কে নিজস্ব মতামত সংযোজন করলেন। তিনি দেখালেন, খ্রীস্টী দৃষ্টিতে সুন্দর বস্তু মাত্রই মঙ্গলধর্মী। প্রাচীন ভাষায় 'Ka-Okayaqia' নামে একটি সংযুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হত যার অর্থ 'সৌন্দর্য-মঙ্গল'। এই 'সৌন্দর্য-মঙ্গল' এক কালে ভারতীয় সমাজে যেমন, তেমনি ইয়ুরোপীয় সমাজেও সৌন্দর্যের উচ্চতম আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করত।

নন্দনতত্ত্বের বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে টলস্টয় দেখিয়েছেন, প্লটিনাসের পরে পনের শ' বৎসর পর্যন্ত নন্দনতত্ত্বের বিশেষ কোন চর্চা হয়নি। অষ্টাদশ শতব্দীতে বৌমগার্টেনের (Baumgartan) শিল্প-মতবাদে শিল্পতত্ত্ব নতুন রূপ পেল। এই উল্লেখ্য শিল্পতাত্ত্বিকের মতে যে তিনটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা শিল্পের প্রধান লক্ষ্য সেগুলি হল,— মঙ্গল, সৌন্দর্য এবং সত্য।

বৌমগার্টেন শিল্পের লক্ষ্য হিসেবে মঙ্গল, সৌন্দর্য এবং সত্যকে যে এক পর্যায়ে ফেলেছেন, টলস্টয় তার বিরোধী। তাঁর মতে সৌন্দর্য এবং মঙ্গলের ধারণা শুধু যে সাদৃশ্যহীন তা নয়, এই উভয় বস্তু, বিপরীতধর্মী। এই বক্তব্যের সমর্থনে টলস্টয় বলেন, সৌন্দর্য মানুষের প্রবৃত্তি জাগরণের মূলে। অপরপক্ষে মঙ্গলচেতনা জাগ্রত হয় প্রবৃত্তির ওপর জয়লাভের প্রভাবে।

টলস্টয় বলেন, আমরা যে পরিমানে সৌন্দর্যের নিকট আত্মসমর্পণ করি, সে পরিমানে মঙ্গল থেকে দূরে সরে যাই। শিল্পে সৌন্দর্যের প্রবক্তারা সাধারণত নৈতিক-আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের কথা বলে থাকেন। এটা শব্দ নিয়ে খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। আত্মার সৌন্দর্য বা মঙ্গলমিশ্রিত সৌন্দর্য বলতে সাধারণত যা বোঝায় তার সঙ্গে সৌন্দর্যের যে শুধু মিল নেই তা নয়, প্রথমোক্তটি বরং শেষোক্তটির বিরোধী।

তীক্ষ্ণ যুক্তির সাহায্যে টলস্টয় প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন, সৌন্দর্য ও সত্য মঙ্গলের সঙ্গে সম-অর্থ-সমন্বিত কোন ধারণা নয়, মঙ্গলের সঙ্গে তাদের মিল নেই, খাপও খায় না। সত্য সাধারণত বঞ্চনাকে অনাবৃত করে এবং বিভ্রমকে ধ্বংস করে বলে সৌন্দর্য-বিরোধী। অপরপক্ষে সৌন্দর্য রচনার প্রধান লক্ষ্য, বিভ্রম সৃষ্টির সাহায্যে মানব-মনকে সত্যের জগৎ থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া।

টলস্টয়ের একান্ত প্রত্যয়, সৌন্দর্য সত্য এবং মঙ্গল—একই মান দ্বারা পরিমেয় নয়। একটির সঙ্গে অপরটি সংযোগহীন। তবু যথেচ্ছ ভাবে এগুলিকে একত্র সংযুক্ত করা হয়। এই সংযোগ একটি অদ্ভুত মতবাদের ভিত্তিরূপে কাজ করেছে। এই মতবাদে সৎ-অনুভূতি-

সঞ্চারী উৎকৃষ্ট শিল্প এবং অসৎ অনুভূতি-সঞ্চারী নিকৃষ্ট শিল্পের ভেদ-রেখাকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। সে স্থলে শিল্পের অভিব্যক্তি সমূহের মধ্যে যেটি নিকৃষ্টতম—অর্থাৎ শিল্প শুধু উপভোগের জন্যই—এই মতবাদকে উচ্চতম শিল্পসৃষ্টির মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। অথচ ইতিহাসের সাক্ষ্য নিলে দেখা যায়, এই মতবাদের বিরুদ্ধে মানবতার সমস্ত প্রবক্তা মনুষ্যজাতিকে সাবধান করে দিয়েছেন।

সৌন্দর্য, সত্য এবং মঙ্গল সম্পর্কীয় ধারণাকে টলস্টয় তাঁর শিল্প-বিষয়ক আলোচনা থেকে বাদ দিয়েছিলেন। টলস্টয়ের অনুবাদক মড্ তাকে পুনরায় গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। যেহেতু তাঁর মনে হয়েছিল,—শিল্পের অন্যতম লক্ষ্য সৌন্দর্য সম্পর্কে টলস্টয়ের ধারণা নিয়ে লোকের মনে বিভ্রম সৃষ্টি হতে পারে। বাস্তবিকই টলস্টয়ের কোন কোন সমালোচক মূর্খের মত অভিযোগ করেছিলেন যে, 'সৌন্দর্যকে তিনি ঘৃণা করতেন'—যে অভিযোগের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই।

॥ তিন ॥

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষাণীর সাহায্যে টলস্টয় দেখিয়েছেন, গির্জা-অনুসৃত খ্রীস্টধর্মে আস্থা হারাবার ফলে রাশিয়ায় অভিজাত গোষ্ঠীর শিল্প দেশের বৃহত্তর জনসমাজের শিল্প থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। এই বিভাজনের ফলে দুই ধরণের শিল্পের অস্তিত্ব দেখা গেল,—জন-সাধারণের শিল্প এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের সৌখীন শিল্প। ক্রমশ সমগ্র দেশে খাঁটি শিল্প অবলুপ্ত হয়ে তার স্থান গ্রহণ করল সে প্রকরণের শিল্প—যা মানুষের ভোগের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে।

শিল্প জগতে এই বিবর্তন শিল্প-সংজ্ঞারও পরিবর্তন ঘটাল। শিল্পের সামগ্রিক পরিচয় অভিজাত গোষ্ঠীর শিল্পের মধ্যে, সে শিল্পই অকৃত্রিম এবং সার্বজনীন শিল্প—এমন একটা ধারণা শিল্পামোদী মহলে দৃঢ়বদ্ধ হল।

শিল্প-জগতের বাস্তব পরিস্থিতি পর্যালোচনার সাহায্যে টলস্টয় এই ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, মানব জাতির দুই তৃতীয়াংশ মানুষ (বিশেষ করে এশিয়া এবং আফ্রিকার অগণ্য মানুষ) অভিজাত গোষ্ঠীর সৌখীন শিল্প সম্পর্কে কোন প্রকার

অভিজ্ঞতা ছাড়াই বেঁচে থাকে এবং মৃত্যু বরণ করে। খ্রীষ্টীয় সমাজেও শতকরা এক জনের বেশী মানুষ এই শিল্পের স্বাদ গ্রহণে অসমর্থ। সমাজের অবশিষ্টাংশ নিরানব্বই জন শ্রমপীড়িত হয়ে বাঁচে এবং মরে। অথচ যে শিল্প তাদের কোন কাজে আসে না, সেই শিল্পসৃষ্টির জন্য তাদের শ্রমের অনেক পরিমান অংশ ব্যয়িত হয়। যন্ত্রশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পসৃষ্টি খাতে শ্রমজীবীর শ্রম বহুল পরিমানে হ্রাস পাবে বলে অভিজাত শ্রেণীর শিল্প-সমর্থকদের ধারণা। কিন্তু টলস্টয়ের দৃঢ় বিশ্বাস, শিল্পের উপকরণ সৃষ্টিতে সাধারণ শ্রমিক যতকাল ধনতন্ত্রের অশুভ প্রভাব থেকে মুক্তি পাবে না, ততকাল মার্জিত সর্বজনগ্রাহ্য শিল্প-সৃষ্টির সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত।

টলস্টয়ের মতে সৌখীন শিল্প কোন মতেই সামগ্রিক শিল্পের প্রতিভু হতে পারে না। যেহেতু সেই শিল্প জনসাধারণের নিকট সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। উচ্চবিত্ত অভিজাত গোষ্ঠীর মানুষের নিকট যে শিল্প আনন্দের খোরাক জোগায়, একজন শ্রমিকের নিকট সে আনন্দ দুরধিগম্য। অলস এবং ভোগপরায়ণ মানুষের মনে উপভোগ্য বস্তু যে অনুভূতি সঞ্চার করে, একজন শ্রমিকের মনে তা ঠিক বিপরীত অনুভূতিই সৃষ্টি করে। সুতরাং অভিজাত শ্রেণীর শিল্প কখনও সমগ্র জনসমাজের শিল্প হতে পারে না।

টলস্টয় বলেন, শিল্প যদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হয়, তবে তার আবেদনও হবে সার্বজনীন। তাঁর মতে আধুনিক অভিজাত গোষ্ঠীর শিল্প সর্বজনের অধিগম্য নয় বলে তাকে অত্যাবশ্যকও বলা যায় না, যথার্থ শিল্প বলাও সমীচীন নয়।

একমাত্র নির্বাচিত ব্যক্তিরাই শিল্প-উদ্ভূত আনন্দ উপভোগের অধিকারী—টলস্টয়ের মতে এই অভিমত পোষণ করেন' চতুর এবং দুর্নীতিপরায়ণ লোকেরাই। রোমান্টিকরা এবং নীটশের অনুবর্তীরা ছিলেন শিল্প-উপভোগের ক্ষেত্রে এই নির্বাচিতদেরই সমর্থক। এঁদের অভিমত, নির্বাচিত গোষ্ঠীর বহিরঙ্গনে অবস্থিত ব্যক্তিরা বর্বর পশুর মত উচ্চ পর্যায়ের মানুষের আনন্দ জোগাবার জন্য অবিচ্ছিন্ন কাজ করে যাবে। এদের দৃঢ় বিশ্বাস, শিল্প উপভোগ কেবলমাত্র অভিজাত শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট। শিল্পরাজ্যে এই বিচ্ছিন্নতাবাদীর দল পূর্বে যেমন ছিল, বর্তমানেও তেমনিই আছে।

টলস্টয়ের একান্ত প্রত্যয়, বৃহত্তর জনজীবনের প্রতি বিত্তবান শ্রেণীর এই হৃদয়হীনতা এবং একপেশে ধারণার পরিণতিতে আধুনিক শিল্প বিষয়বস্তুর দিক থেকে ক্রমশই যে শুধু দীন হয়ে পড়েছে তা নয়, - অহমিকার অনুভূতি, সুস্থ জীবনের প্রতি অসন্তোষ এবং সর্বোপরি যৌন আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে নিম্নাভিমুখী গতি লাভ করেছে।

শিল্পজগতের এই বিকৃতি অনিবার্যভাবে শিল্পকে দুর্বল করেছে। যে শিল্পের পরিধি ছিল সীমাহীন, বিচিত্র, যে শিল্প ছিল গভীরতাধর্মী এবং ধর্মীয় বিষয়বস্তুর উপযুক্ত সেই উচ্চ মান থেকে আধুনিক শিল্প বিচ্যুত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, একটি গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ লক্ষ্যে থাকায় শিল্প তার রূপমূর্তির সার্বজনীনতা হারিয়ে কৃত্রিম ও অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। তৃতীয়ত, শিল্প শুধু স্বাভাবিক চরিত্রভ্রষ্ট হয়নি, পুরোপুরি কৃত্রিম এবং মস্তিষ্কপ্রসূতও হয়ে পড়েছে।

শিল্প বিকৃতির প্রথম পরিণতি টলস্টয়ের মত বিবেচনায় বিষয়বস্তুর দৈন্য। টলস্টয়ের মতে যথার্থ শিল্পের অস্তিত্ব নিহিত যথাযথ অনুভূতি সঞ্চারের মধ্যে। অভিজাত শ্রেণীর শিল্পসৃষ্টি প্রথাসিদ্ধ আনন্দ দানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। টলস্টয়ের বিবেচনায় মানুষের সম্ভোগ-প্রবৃত্তি চির পুরাতন, গতানুগতিক এবং বৈচিত্র্যহীন। মানুষের উপভোগের সীমা প্রকৃতি-নির্ধারিত। ধর্মীয় চেতনা উদ্ভূত অনুভূতি সজীব বলে এই পর্যায়ের চেতনা-প্রভাবিত শিল্পরাজ্যের কোন সীমা নেই। উদাহরণ স্বরূপ টলস্টয় উল্লেখ করেছেন, প্রাচীন গ্রীকদের ধর্মীয় উপলব্ধি প্রভাবিত হোমার এবং ট্র্যাজিকধর্মী লেখকদের রচনায় অভিব্যক্ত অভিনব, গুরুত্বপূর্ণ, এবং অনন্ত বৈচিত্র্যময় অনুভূতির কথা। ধর্মীয় অনুভূতি-প্রভাবিত সিয়িহুদীদের রচনায়, মধ্যযুগের কবিদের কাব্য, এমনকি ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি সঞ্জাত (যাকে বলা যায় প্রকৃত খ্রীষ্টীয় ধর্মীয় অনুভূতি) আধুনিকদের রচনায়ও এই উচ্চ শিল্পদর্শের প'রিচয় পাওয়া যায়।

টলস্টয়ের ঐকান্তিক বিশ্বাস, সম্ভোগের লালসা, জীবনের অভিজ্ঞতা রূপদানের আকাঙ্ক্ষা, বৃহত্তর জন-জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা এবং প্রত্যয়ের অভাব সমাজের অভিজাত শ্রেণীর লোকেদের এমন এক প্রকরণের শিল্প সৃষ্টিতে প্রণোদিত করেছে—যা অত্যন্ত গুরুত্বহীন বিষয় দ্বারা পুষ্ট।

টলস্টয়ের মতে এ যুগের অভিজাত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে তিন ধরনের অনুভূতির প্রকাশ অত্যন্ত স্পষ্টঃ—অহমিকার অনুভূতি, যৌন আকাঙ্ক্ষার অনুভূতি এবং অবসন্নতার অনুভূতি। সে তুলনায় কঠোর জীবন সংগ্রামে লিপ্ত শ্রমিক মানুষের জীবনে যে অন্তহীন বৈচিত্র্য এবং অনুভূতির সন্ধান পাওয়া যায়, তা তুলনাহীন।

টলস্টয় বলেন, উক্ত তিন পর্যায়ের অনুভূতির মধ্যে যা নিম্নতম বলে পরিগণিত হবার যোগ্য,—অর্থাৎ ইন্দ্রিপরায়ণতাই (যা পশুজীবনেরও সাধারণ ধর্ম) সাম্প্রতিক কালে শিল্পকর্মের মুখ্য বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বোক্কাচিও থেকে মার্চেল প্রিভোস্ট (Marcel Pre'vost) পর্যন্ত লেখকদের উপন্যাস এবং কাব্য কবিতায় যৌনভিত্তিক প্রেমের অনুভূভিরই প্রাধান্য। অভিনয়ে, এমনকি সঙ্গীতে এবং রোমান্সেও মানুষের উৎকট লালসার জাগরণই প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফরাসী চিত্রশিল্পে নগ্ন নারী মূর্তির প্রাধান্য। আধুনিক ফরাসী কবিতায়ও নগ্নতারই বর্ণনা। ফরাসী উপন্যাসগুলিতে প্রধানত যৌনতা সম্পর্কীয় লালসা উদ্দীপক বর্ণনারই ছড়াছড়ি। লেখকেরাও যৌনতা বাতিকগ্রস্ত। এদেরই ব্যাপক অনুসরণ চলছে য়ুরোপ ও আমেরিকার শিল্পজগতে।

টলস্টয়ের মতে প্রাচীন যুগের (যেমন গ্রীক শিল্পীদের কিংবা য়িহুদী ধর্মগুরুদের) শিল্প সর্বজনবোধগম্য বলেই হয়েছিল সার্বভৌম আবেদন-সম্পন্ন। অপর পক্ষে আধুনিক শিল্প একপেশে এবং সমাজের একটি মাত্র শ্রেণীর পরিতৃপ্তি সাধনে নিয়োজিত। এর অনিবার্য পরিণতিতে আধুনিক শিল্পে অস্পষ্টতা, রহস্যময়তা, দুর্বোধ্যতা এবং ব্যতিক্রমী স্বভাব আত্মপ্রকাশ করেছে। শিল্পের উৎকর্ষ বিচারে এগুলিকে শুধু যে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে তা নয়,—যাথার্থ্যহীনতা, লক্ষ্যহীনতা, এমনকি স্বতঃস্ফূর্তিহীন কৃত্রিমতাকেও এ যুগে শিল্পসৃষ্টির মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে।

আধুনিক শিল্পসৃষ্টির এই প্রবণতাকে টলস্টয় অভিহিত করেছেন শিল্পের ক্ষয়িষ্ণুতা (decadence) বলে।

উদাহরণ সংযোজন করে টলস্টয় দেখিয়েছেন, ফরাসী কবি বদলেয়ার, ভেরলেন, মাল্লার্মে প্রভৃতির কবিতায় এই অস্পষ্টতা এবং হেঁয়ালিরই প্রাধান্য। এই 'অস্পষ্টতা মতবাদ' নতুন গোষ্ঠীর কবিদের মধ্যে একটি অন্ধ বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল।

টলস্টয়ের বিবেচনায় আধুনিক কবিতার অস্পষ্টতা এবং দুর্বোধ্যতার উৎসে কবি-অনুভূতির কৃত্রিমতা। আধুনিক কবিগোষ্ঠীর প্রধান বলে মান্য বদলেয়ারের কাব্যে স্থূল অহংচেতনা একটি মতবাদে উন্নীত। কবিতায় নৈতিকতার পরিবর্তে তিনি ধোয়াটে সৌন্দর্য কল্পনা এবং কৃত্রিম সৌন্দর্যকে স্থাপন করেছেন ভেরলেনের জীবন-সম্পর্কীয় ধারণা টলস্টয়ের মতে দুর্বল অসচ্চরিত্রতায়, নৈতিক নপুংসকত্বের স্বীকৃতিতে এবং প্রতিমা (Image) উপাসনায়। বদলেয়ার এবং ভেরলেন—উভয়েরই কলাকৌশল আন্তরিকতা এবং সারল্য বর্জিত। তাঁদের কাব্যের অন্তর্নিহিত কৃত্রিমতা যেমন সুস্পষ্ট তেমনি, সদম্ভ মৌলিকতার দাবী এবং অহমিকাও সীমাহীন।

কাব্য-কবিতায় এই বিকৃতির কারণ নির্ণয়ে টলস্টয় বলেন, যে সমাজে আন্তরিকতাহীন কৃত্রিম এই সমস্ত কবি বাস করতেন, সে সমাজে শিল্প কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হত না—বিবেচিত হত আমোদ-জনক বস্তু হিসেবে। বক্তব্যের ওপর জোর না দিয়ে এই শ্রেণীর আধুনিক কবি কাব্যকে আঙ্গিক সর্বস্ব করে তুলেছিলেন। কারণে তাঁদের কাব্য ক্ষয়িষ্ণু হয়ে উঠেছিল বলে টলস্টয়ের বিশ্বাস। এ প্রাজ্ঞ অভিমত নিশ্চয়ই বিবেচনাযোগ্য।

টলস্টয় বলেন, কাব্যের আঙ্গিকে অভিনবত্ব সৃষ্টির দিকেই শুধু বদলেয়ার এবং ভেরলেনের লক্ষ্য ছিল না, কাব্যকে পাঠক সমাজে আকর্ষণীয় করে তুলবার উদ্দেশ্যে অশ্লীল বর্ণনা এবং চিত্রের সমাবেশ করতেও তাঁরা দ্বিধা করেন নি। কৃত্রিম শিল্প সৃষ্টির জন্যই তাঁরা আধুনিক পাঠক এবং সমালোচক সমাজে অভিনন্দিত হয়েছিলেন বলে টলস্টয়ের ধারণা। তাঁর মতে কেবলমাত্র বদলেয়ার এবং ভেরলেনের ক্ষেত্রে নয়, সমস্ত ক্ষয়িষ্ণু লেখকের জনপ্রিয়তার উৎসও খুঁজতে হবে কৃত্রিম বহিরঙ্গ-প্রসাধিত তাঁদের শিল্পসৃষ্টির মধ্যে।

নিপুণ সমীক্ষার সাহায্যে টলস্টয় যুরোপের বিভিন্ন দেশের শিল্প-সৃষ্টির দুর্বোধ্যতার একটি খতিয়ান দিয়েছেন। তাঁর মতে মালার্মের কবিতা শুধুমাত্র দুর্বোধ্য নয়, অনেক ক্ষেত্রে অর্থহীন' মেটারলিঙ্কের কবিতা এবং গান সম্পর্কেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য। রেগনিয়ার, গ্রিফঁ্যা, ভেরহ্যারান, মোরিয়া প্রভৃতি তরুণ কবিদের কবিতাও এ জাতের। শুধুমাত্র ফরাসী দেশে নয়, জার্মানী, সুইডেন, নরওয়ে, ইতালি এবং রাশিয়াও একই ধরনের কবিতা সাময়িক পত্রে মুদ্রিত এবং প্রভূতত শ্রম ও অর্থব্যয়ে গ্রন্থবদ্ধও করা হয়। এ পর্যায়ের কাব্য-কবিতার পাঠক সংখ্যা খুবই সীমিত। দুর্বোধ্য চিত্রশিল্প, সঙ্গীত, নাটক প্রভৃতির জন্যও এভাবে অজস্র অর্থব্যয় এবং বহু সংখ্যক লোকের শ্রম ব্যয়িত হয়েছে। চিত্র-শিল্পের দুর্বোধ্যতা কবিতার চাইতেও বেশী। সঙ্গীত ও নাটকেও সেই একই দুর্বোধ্যতা আত্মপ্রকাশ করায় এ যুগের সঙ্গীত ও নাটক খুবই ক্লান্তিকর মনে হয়।

টলস্টয়-সমালোচকেরা বলেন. যেহেতু তাঁর রুচি-প্রবৃত্তি উনিশ শতকের প্রথম ভাগের শিক্ষায় গঠিত, সে কারণে তিনি নতুন যুগের শিল্প রচনার বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে পারেন নি। এই অভিযোগ স্বীকার করে নিয়ে টলস্টয় বলেছেন, নবযুগের শিল্প তাঁর নিকট দুর্বোধ্য। তাঁর মতে এ যুগের ক্ষয়িষ্ণু শিল্পের চাইতে অতিক্রান্ত যুগের স্বীকৃত শিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এই যে, সে শিল্প ছিল অধিক সংখ্যক লোকের নিকট সুবোধ্য।

টলস্টয় মনে করেন, শিল্পীর ব্যতিক্রমী (Exclusive) স্বভাব বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ যুগের শিল্প অধিকতর পরিমানে দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। আধুনিক শিল্পের গতিই হল ক্রমিক দুর্বোধ্যতার দিকে। এ কারণে সে শিল্প খুবই সীমিত সংখ্যক লোকের নিকট বোধগম্য এবং সে সংখ্যাও ক্রম ক্ষীয়মান। আত্মপক্ষ সমর্থনে আধুনিক শিল্পী বলেন, যদি কেউ তাঁদের সৃষ্টিকর্মের অর্থোদ্ধার করতে না পারেন, সেটা তাদের অক্ষমতা। ব্যতিক্রমী শিল্প সমর্থনে তাঁরা বলেন, জটিল যুগ-জীবনের প্রতিভাস বলে আধুনিক শিল্প অনুশীলন-সাপেক্ষ। অনুশীলনের সাহায্যে এই শিল্পচর্চায় অভ্যস্ত হলে তবেই সে শিল্পের মর্মোদ্ধার

সম্ভব। উত্তরে টলস্টয় বলেছেন, মানুষ কোন বস্তুতে—এমনকি নিকৃষ্ট বস্তুতেও অভ্যস্ত হতে পারে। বাস্তব ক্ষেত্রে এরূপ ঘটেও থাকে। টলস্টয়ের দৃঢ় প্রত্যয়, যাকে আমরা সর্বোচ্চ শিল্প বলে স্বীকার করি, তা সর্বজনচিত্তে সংবেদন সৃষ্টিতে সমর্থ। যেমন Genesis-এর মহাকাব্য, খ্রীস্টের জীবন কাহিনী নিয়ে রূপক গল্প, লোক-উপকথা, পরীর গল্প, লোক সঙ্গীত প্রভৃতি। তাঁর মতে উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম সকল মানুষের বোধগম্য এবং ব্যক্তিনির্বিশেষে তা সকল মানুষকে সংক্রমিত করে। তাঁর বিবেচনায় সে শিল্পকর্মই উৎকৃষ্ট যার ভেতর সকলের প্রবেশাধিকার আছে এবং প্রত্যেক মানুষের নিকট যা সুবোধ্য।

সুতরাং কোন শিল্পকর্ম যদি দর্শক বা শ্রোতার চিত্তকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়, সে শিল্প নিকৃষ্ট এবং শিল্পপদবাচ্য নয় বলে। টলস্টয় বলেন, ইলিয়াড, ওডেসি, আইসাকের কাহিনী সমূহ, জেকব এবং জোশেফ, হিব্রু অবতারগণ এবং যীশুখ্রীস্টের জীবন কাহিনী নিয়ে রূপক গল্প, শাক্য মুনির কাহিনী, বেদের স্তোত্র সমূহ,—শুধুমাত্র পাঠকচিত্তে সমুচ্চ অনুভূতি সঞ্চারক নয়, সকলের নিকট সুবোধ্যও। পূর্ব যুগের এমন ধরনের মানুষের কাছেও এগুলি সুবোধ্য ছিল -- যারা আমাদের শ্রমিকদের চাইতেও ছিল স্বল্প-শিক্ষিত। ধর্মীয় অনুভূতি-সঞ্জাত বিষয়বস্তু কখনও কোন যুগের মানুষের নিকট দুর্বোধ্য হতে পারে না। যেহেতু ধর্মীয় অনুভূতির আবেদন সকল যুগের মানুষের নিকট সমান। এবং সেই অনুভূতি সকল যুগে একই প্রকৃতির।

উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে টলস্টয় সিদ্ধান্ত করেছেন, -উৎকৃষ্ট, মহৎ, সর্বজনীন ধর্মীয় চেতনাসম্পন্ন শিল্প খুব ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর আত্মভ্রষ্ট মানুষের নিকট দুর্বোধ্য হতে পারে,—জনগণের নিকট অবশ্যই নয়। তাঁর বিবেচনায় যে শিল্প বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নিকট দুর্বোধ্য তা নিকৃষ্ট অথবা শিল্পপদবাচ্যই নয়। আন্তরিক অনুভূতির সাহায্যে অপর মনকে সংক্রমণ যদি শিল্প সৃষ্টির লক্ষ্য হয়, তবে শিল্পে দুর্বোধ্যতার প্রশ্ন ওঠে না। শিল্পী যদি শিল্পকর্মের মাধ্যমে অপর মনে অনুভূতি সঞ্চারে অক্ষম হন, তবে তাঁর শিল্পকর্ম সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

এ যুগের আঙ্গিক-সর্বস্ব শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে টলস্টয় বলেন,

দুর্বোধ্য থেকে অধিকতর দুর্বোধ্যতার ক্রমান্বয়ী গতির ফলে সে শিল্প এমন স্তরে পৌঁছাবে—যখন তার কোন অস্তিত্বই থাকবে না।

॥ চার ॥

টলস্টয়ের ঐকান্তিক বিশ্বাস, সাম্প্রতিক কালে অভিজাত গোষ্ঠীর শিল্প বিষয়বস্তুর দিক থেকে যেমন ক্রমশ দীন থেকে দীনতর এবং দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে, তেমনি শিল্পের বৈশিষ্ট্য পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে।

শিল্পের স্থান গ্রহণ করেছে শিল্পের অনুকৃতি। বিষয়বস্তুর দিক থেকে মূল্যহীন, আঙ্গিক-সৌন্দর্যের (ফর্ম) দিক থেকে অপকৃষ্ট এবং উত্তরোত্তর দুর্বোধ্য হওয়ায় আধুনিক শিল্প আদর্শ-বিচ্যুত হয়েছে। ফলে শিল্পের নামে এ যুগে যা সৃষ্টি হচ্ছে তা মেকী শিল্প।

শিল্প শিল্পীর অন্তরোদ্ভূত। তার উৎস শিল্পীর অকৃত্রিম আবেগের জগতে—যে আবেগ অপর অন্তরে সঞ্চারিত করতে তিনি উৎসুক। অপর পক্ষে ব্যতিক্রমী শ্রেণীর শিল্প সৃষ্টির উৎসে অন্তর্নিহিত কোন আবেগের প্রেরণা থাকে না—আমোদের দাবি মেটাতেই সাধারণত সে শিল্প সৃষ্টি হয়। এ পর্যায়ের মনোরঞ্জক শিল্পের জন্য অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিরা যথেষ্ট মূল্যও দিয়ে থাকেন। এ পরিস্থিতিতে অভিজাত শ্রেণীর দাবি পূরণের দিকে লক্ষ্য রেখে শিল্পীকে শিল্পের অনুকরণ সৃষ্টির জন্য অনেক উপায়ও উদ্‌ভাবন করতে হয়। টলস্টয়ের মতে সে উপায়গুলি হল (১) ধার করা (২) অনুকৃতি (৩) চমকসৃষ্টি (৪) কৌতূহল সৃষ্টি।

প্রথম ক্ষেত্রে দেখা যায়, আধুনিক শিল্পী অনেক সময় পূর্বতন কোন শিল্পিত বিষয়বস্তুকে সামগ্রিক বা বিচ্ছিন্নভাবে ধার করে থাকেন, এবং সেগুলির পুনর্গঠন কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে টুকিটাকি কিছুর সংযোগ করেন,—যাতে তা কোন অভিনব সৃষ্টির রূপ লাভ করে। এ পর্যায়ের সৃষ্টি বক্তব্যহীন। পূর্বতন রচনার স্মৃতিনির্ভর কতগুলি পরিবর্তনের সাহায্যে এ ধরনের পুনর্গঠন কর্মে শৈল্পিক ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয় মাত্র। অনুকৃত এ পর্যায়ের শিল্পসৃষ্টি প্রত্যাশিত শিল্প সংক্রমণ (Infection) ঘটাতে সমর্থ হয় না। শিল্পী অপরের উপলব্ধিকে সুকৌশলে নিজের

বলে চালিয়ে না দিয়ে নিজস্ব উপলব্ধিকে অপর অন্তরে সঞ্চারিত করতে পারলেই হয় শিল্প সংক্রমণ। টলস্টয়ের অভিমত, আধুনিক শিল্পজগতে ধার-করা বিষয়বস্তুর পুনর্গঠনের প্রাধান্যই দেখা যাচ্ছে এবং সে অনুকৃত বস্তু যদি শিল্পকর্মের আঙ্গিক-সম্মত হয় তবে তা জনসাধারণের নিকট শিল্পকর্মের স্বীকৃতি পাচ্ছে।

বর্ণনায় ফেনানো (ইংরেজীতে যাকে বলা হয় detail) হলো অনুকৃত শিল্পের একটা বড় লক্ষণ। আধুনিক উপন্যাসে, ছোটগল্পে, নাট্যশিল্পে, চিত্রশিল্পে এবং সঙ্গীতেও এই 'ডিটেলে'র সাহায্যে অনুকৃতি-প্রয়াস লক্ষ্য করেছিলেন টলস্টয়।

আধুনিক শিল্প-রচনায় চমক সৃষ্টি করা হয় মুখ্যত বিপরীত বস্তু বা ভাবের সুকৌশল সন্নিবেশের সাহায্যে। ভয়ঙ্করের সঙ্গে কোমল, সুন্দর এবং কুৎসিৎ, উচ্চকণ্ঠ এবং নিম্নকণ্ঠ, অন্ধকার এবং আলো, খুব সাধারণ এবং খুব অসাধারণের একত্র সন্নিবেশের মধ্যে এই শিল্প-কৌশল নিহিত। সাহিত্যে, নাট্যকর্মে, চিত্রশিল্পে, এমন কি সঙ্গীতেও এই চমক সৃষ্টির দ্বারা সাধারণ পাঠক, দর্শক এবং শ্রোতার মনকে আকর্ষণ করার প্রয়াস এ যুগে সব সময় দেখা যায়।

জটিল কোন প্লট সৃষ্টির সাহায্যে পাঠক, দর্শক বা শ্রোতার মনে অতৃপ্ত কৌতূহল জাগিয়ে তোলা মেকী শিল্পের চতুর্থ লক্ষণ। ইংরেজী এবং ফরাসী উপন্যাসে এই পদ্ধতি বহুল ব্যবহৃত। বর্তমানে এই পদ্ধতির স্থান গ্রহণ করেছে বাস্তবতা নামে আর একটি বৈশিষ্ট্য। জীবনে যে সমস্ত চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে তাকে বাস্তবতার নামে চালিয়ে দেওয়া হয়। এই চমকপ্রদ ঘটনাসমূহ পাঠক-মনে তীব্র কৌতূহল সৃষ্টি করে। এই সুকৌশল কৌতূহল সৃষ্টিকেই শিল্পসৃষ্টির মর্যদা দেওয়া হয় বলে টলস্টয়ের ধারণা।

টলস্টয়ের সুচিন্তিত অভিমত,—অনুকরণ, বাস্তবতা সৃষ্টি-কৌশল এবং চমকসৃষ্টি প্রয়াস—কোনটিই শিল্পসৃষ্টির সহায়ক নয়। যেহেতু অনুকরণের মধ্যে শিল্পীর উপলব্ধিগত অনুভূতির প্রকাশ নেই। দ্বিতীয়ত, বাস্তবতা বস্তুর বহিরঙ্গ-রূপাশ্রয়ী। তার মধ্যে বস্তুস্বরূপের পরিচয় থাকেনা। তৃতীয়ত, চমক সৃষ্টির দ্বারা কোন আন্তরিক অনুভূতি সৃষ্টি

সম্ভব নয়। তা শুধুমাত্র স্নায়ুর ওপর ক্রিয়া করে মাত্র। জনসাধারণের মধ্যে শিল্পের ধারণা এত নিম্নমানের যে, এই শারীরিক ক্রিয়াকেই তারা শিল্পকর্ম বলে ভুল করে। কবিতায়, চিত্রে, নাটকে, এমনকি সঙ্গীতেও এইরূপ শারীরিক প্রভাবজাত উত্তেজনাকে এই যুগের সাধারণ মানুষ শিল্পের মর্যাদা দেয়।

শিল্পের অন্যতম লক্ষ্য, শিল্পী-উপলব্ধ অনুভূতিকে অপর চিত্তে সঞ্চারিত করা। কিন্তু অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশে উদ্ভূত কৌতূহল শিল্প-উপভোক্তার মনকে ভিন্নমুখী করে সংক্রমণ ক্রিয়ায় বাধা দান করে। সুতরাং কৌতূহল সৃষ্টি শিল্পক্রিয়ার সঙ্গে শুধু সম্পর্কহীন নয়, তা শৈল্পিক প্রভাব-সৃষ্টির সহায়ক না হয়ে বরং বিপরীত শক্তিরূপে কাজ করে।

শিল্পী-উপলব্ধ অনুভূতি শিল্প সৃষ্টির অপরিহার্য উপাদান হলেও বর্তমানে দেখা যায়, শিল্পরাজ্যে এমন বস্তু তৈরী হচ্ছে যা শিল্পীর আন্তরিক উপলব্ধিজাত নয়, এবং তা এমন মনোহারী পণ্যবস্তুর মত—যা অবসরবিলাসী অভিজাত বিত্তবান সমাজের চিত্ত বিনোদন কার্যে ব্যাপৃত। বস্তুতপক্ষে এরা শিল্পী নন, শিল্পের কারিগর মাত্র। শিল্প সৃষ্টির জন্য শিল্পীকে অবশ্যই কতগুলি শর্ত পূরণ করতে হয়। প্রথম, তাকে স্ব-যুগের জীবন-ধারণার সর্বোচ্চ স্তরে পৌছাতে হবে। দ্বিতীয়, তাকে অপর অন্তরে অনুভূতি সঞ্চারের ক্ষমতা অর্জন করতে হবে, এবং তৃতীয়, কোন বিশেষ শিল্পরূপ সৃষ্টির জন্য তাকে প্রতিভাসম্পন্ন হতে হবে।

খাঁটি শিল্প সৃষ্টির সহায়ক এই সবগুলি শর্তের একত্র সমাবেশ খুব কম দেখা গেলেও মেকী শিল্প সৃষ্টির জন্য যে পরিমান কলাকৌশল জানা থাকা প্রয়োজন, তার সাক্ষাৎ সব সময় পাওয়া যায়। সে কৌশল অর্জন করা সম্ভব ধার করে, অনুকরণ করে, কিংবা চমকপ্রদ নির্মাণ কর্মের সাহায্যে পাঠকের ওপর মানসিক প্রভাব সৃষ্টির দ্বারা।

বস্তুতপক্ষে প্রতিভার যথার্থ অর্থ হল, ব্যক্তির চিন্তা এবং ধারণাকে প্রকাশ করার ক্ষমতা, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ খুঁটিনাটির দিকে নজর দেওয়া, স্মরণীয় বস্তুকে স্মরণ করা, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি চারুকলার রেখা, রূপ ও

রঙের পার্থক্য উপলব্ধির সামর্থ্য, সঙ্গীতে বিরতির পার্থক্য বোধ, ধ্বনি-পরম্পরাকে সজীব করে অপর অন্তরে সঞ্চারিত করার সামর্থ্য প্রভৃতি। এ পর্যায়ের ক্ষমতার অধিকারী হলে শিল্পী তাঁর স্ব-নির্বাচিত শিল্প-বিভাগে জীবনের শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে সৃষ্টি করে যেতে পারবেন এবং সে সৃষ্টি খাঁটি শিল্প বলে স্বীকৃতি পাবে।

মেকী শিল্প সৃষ্টির জন্য প্রত্যেকটি শিল্প-শাখায় এমন সমস্ত কৌশল এবং প্রস্তুত-প্রণালীর অস্তিত্ব আছে—যা আয়ত্ত করে শিল্পের কারিগরেরা অকৃত্রিম অনুভূতি এবং আবেগের প্রেরণা ছাড়াই তথাকথিত শিল্প সৃষ্টিতে সক্ষম হন। এই মন্তব্য কবিতা, ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, চিত্রশিল্প, সঙ্গীত-শিল্প সম্পর্কে সমান ভাবে প্রযোজ্য।

এ ভাবে মেকী শিল্পের উৎপাদন অব্যাহত গতিতে চলছে এবং সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা মেকী শিল্পকে প্রকৃত শিল্পের মর্যাদা দিচ্ছেন। খাঁটি শিল্পের স্থলে এই মেকী শিল্পের ব্যাপক প্রচলন হওয়ায় অভিজাত উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষের শিল্প সার্বজনীন শিল্প থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। শিল্প-রাজ্যের এই বিমর্ষ পরিণতি টলস্টয়ের নিকট মনে হয়েছে ভয়াবহ।

॥ পাঁচ ॥

প্রবীন শিল্পী টলস্টয়ের মতে শিল্পীর ব্যবসায়িক মনোভাব মেকী শিল্পসৃষ্টির অন্যতম কারণ। যতকাল পর্যন্ত শিল্প অবিভাজ্য ছিল, অর্থাৎ ধর্মীয় চেতনাসম্পন্ন শিল্পকেই একমাত্র শিল্প বলে বিবেচনা করা হত, ততকাল শিল্প ক্ষেত্রে মেকী দেখা যায় নি। কোন ক্ষেত্রে মেকী দেখা দিলে তা তীব্র সমালোচনার সামগ্রীতে পরিণত হয়ে দ্রুত বিলয় প্রাপ্ত হত।

কিন্তু শিল্পরাজ্যে বিভাজন দেখা দেবার পর অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ আনন্দ-সঞ্চারী যে কোন সৃষ্টিকর্মকে উৎকৃষ্ট শিল্প বলে অভিনন্দন জানালেন এবং সে শিল্পকর্মকে প্রভূত পুরস্কৃত করতে শুরু করলেন। এ প্রলোভনে বৃহৎ সংখ্যক শিল্পামোদী মানুষ এ পর্যায়ের শিল্প সৃষ্টিতে

আত্মনিয়োগ করলেন। এর অনিবার্য পরিণতিতে শিল্পকর্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্র প্রাপ্ত হয়ে পেশায় পরিণত হল।

পেশাদার শিল্পীদের শিল্পসৃষ্টির সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। এ কারণে শিল্পকর্মে অভিনব চমকপ্রদ চিত্তাকর্ষক বিষয়ের অবতারণা তাঁদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ক্লাসিকধর্মী শিল্প-স্রষ্টারা তাঁদের কালজয়ী শিল্পকর্মের জন্য শ্রমমূল্য তো পাননি, এমনকি বহু ক্ষেত্রে শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে নিজের নামও সংযুক্ত করেন নি। ফলে ক্লাসিক শিল্পকর্ম এবং পেশাদারী শিল্পকর্মের মধ্যে অনিবার্যত বিরাট পার্থক্য ঘটতে থাকে।

টলস্টয়ের মতে এ যুগে মেকী শিল্প প্রসারের দুটি কারণ খুবই প্রত্যক্ষ ঃ প্রথম, ব্যবসায়িকতা, দ্বিতীয়, বোধ-বিচার-শক্তিহীন পাণ্ডিত্যগর্বী সমালোচক কর্তৃক শিল্প-সমালোচনা।

টলস্টয় বলেন, অকৃত্রিম অনুভূতি-উৎসারিত শিল্পসৃষ্টি স্বতঃই অপর মনকে সংক্রমিত করে। এই প্রকরণের শিল্পকর্মের ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন হয় না। খাঁটি শিল্পকর্ম ব্যাখ্যার অতীত! স্বীয় উপলব্ধ অনুভূতি কথায় প্রকাশে অসমর্থ হলে খাঁটি শিল্পী শিল্প রচনার আশ্রয় নেন। শিল্পসৃষ্টি যদি অপর চিত্তসংক্রমণে ব্যর্থ হয়, তবে কোন ব্যাখ্যাই শিল্পকে সংক্রামক করে তুলতে পারে না। শিল্পসৃষ্টিকে মুখ্যত বুদ্ধির দ্বারা বিচার করা হয় বলে খুব কম মানুষ শিল্প-সংক্রমিত বা আবেগ-পীড়িত হন।

বস্তুতপক্ষে শিল্প যখন অবিভাজ্য অর্থাৎ শুধুমাত্র ধর্মীয় প্রেরণাজাত ছিল তখন শিল্প-সমালোচকের অস্তিত্বই ছিল না। পরবর্তীকালে ধর্মীয় চেতনাহীন উচ্চবর্গের এলিটধর্মী শিল্পকে কেন্দ্র করেই শিল্প-সমালোচনা বিকাশ লাভ করে। সুনির্দিষ্ট, সন্দেহাতীত কোন প্রকার আভ্যন্তরীণ বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা আয়ত্তে না থাকায় তাঁদের শিল্প-বিচারের মানদণ্ড ছিল বহির্জগতে প্রচলিত কোন ধারণা। সে সমালোচনার মানদণ্ড আপ্তবাক্যে ভরা এবং ঐতিহ্যনির্ভর। শিল্প-সংক্রমিত হবার যোগ্যতার অভাব হেতু এ পর্যায়ের সমালোচক মস্তিষ্ক-প্রসূত, নিত্য নতুন, তদ্ভাবিত শিল্পকর্মের প্রতি বেশী মনোযোগী হন, প্রশংসা করেন

এবং তা অনুকরণযোগ্য আদর্শ বলে মত প্রকাশ করেন। ঐ পর্যায়ের শিল্পকর্মের ব্যাখ্যার জন্য তাঁরা কতগুলি মতবাদের উদ্ভাবন করেন—যার মধ্যে সৌন্দর্য মতবাদ অন্যতম। বর্তমান যুগের প্রতিভাবান শিল্পীরাও এই মতবাদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিল্প রচনা করেন এবং এই সৌন্দর্য মতবাদীদের নিকট অনেক সময় আত্মসমর্পণ করেন।

সমালোচকদের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত ভণ্ড শিল্পীরা এভাবে মেকী শিল্পের প্রবেশ পথে ভিড় করেন।

শিল্প ব্যবসায়ে পরিণত হবার পর শিল্প শিক্ষার বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হল। টলস্টয়ের ঐকান্তিক বিশ্বাস, শিল্পী-অন্তরের অনুভূতি অপর চিত্তে সঞ্চরণ ক্রিয়ায় শিল্পের অস্তিত্ব নিহিত বলে কোন শিল্প-বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। শিল্পী কি উপায়ে নিজস্ব অনুভূতি অপর চিত্তে সঞ্চারিত করেন – শিল্প বিদ্যালয় এইটুকু মাত্র শিক্ষা দিতে পারে। এই শিক্ষা শিল্প-উপলব্ধির সহায়ক তো নয়ই, বরং শিল্পের মেকী ছড়িয়ে জনসাধারণকে প্রকৃত শিল্প-চেতনার জগৎ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। শিল্পীর সূক্ষ্ম অনুভূতিই শিল্পের সম্পূর্ণতা দানে সক্ষম। সুতরাং শিল্প বিদ্যালয়গুলি শিল্পের অনুকরণে শিক্ষা দিতে সমর্থ হলেও প্রকৃত শিল্প শিক্ষা দিতে অসমর্থ।

টলস্টয়ের মতে ব্যক্তিসত্তার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই হয় প্রকৃত শিল্প শিক্ষার শুরু। তিনি আরও মনে করেন, শিল্প বিদ্যালয়ে শিল্প-সদৃশ কিছু সৃষ্টিতে শিক্ষার্থীকে অভ্যস্ত করানো মানে প্রকৃত শিল্প সম্পর্কীয় ধারণায় পৌঁছাতে অভ্যাস ঘোচানো। ফলে শিল্প বিদ্যালয়গুলিতে যারা দীর্ঘকাল পাঠক্রম অনুসরণ করেন, তাদের যথার্থ শিল্পসৃষ্টির ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। এ ছাড়া এ ধরনের শিল্প-বিদ্যালয়ে শিক্ষিত ব্যক্তি পরবর্তীকালে যে মেকী শিল্পসৃষ্টি করেন, তা জনসাধারণের রুচি বিকৃত করে।

শিল্পীর ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি, প্রচলিত শিল্প সমালোচনা এবং শিল্প বিদ্যালয়গুলি আধুনিক শিল্পের অবনয়নের জন্য দায়ী বলেই টলস্টয়ের বিশ্বাস। এর অনিবার্য পরিণতিতে এ যুগের অধিকাংশ লোক শিল্পের স্বরূপ উপলব্ধিতে অসমর্থ এবং তারা শিল্পের স্থূলতমা বিকৃতিকেই শিল্প বলে ভুল করে।

॥ ছয় ॥

টলস্টয় মনে করেন প্রত্যেক শিল্পের নিজস্ব যেমন দাবী আছে তেমনি নির্দিষ্ট সীমাও আছে। এক প্রকরণের শিল্প অপর প্রকরণের শিল্পের সঙ্গে মিশে গেলে শিল্প-বৈশিষ্ট্য বর্জিত হয়। হ্বাগনারের (Wagner) সমালোচনা করে টলস্টয় বলেছেন, সঙ্গীত এবং কবিতা কখনও এক সঙ্গে মিলতে পারে না। অনেক সময় নাট্টীয় শিল্প সঙ্গীত শিল্পের অন্তবর্তী হতে দেখা যায়। অথচ শিল্পের অকৃত্রিম বিকাশের জন্য প্রত্যেক শিল্পের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা প্রয়োজন—এটা অবশ্য স্বীকৃত। যদি দুটি শিল্পকর্মের একত্র মিশ্রণ ঘটে তবে বুঝতে হবে একটি শিল্পকর্ম, অপরটি মেকী, অথবা দুটিই মেকী।

গীতিকবিতা এবং সঙ্গীতের অবশ্য অনেক সময় সংমিশ্রণ ঘটে, যেহেতু উভয়েই কিয়ৎ পরিমাণে এক এবং সমান লক্ষ্যাভিমুখী। মহাকাব্য, নাট্যকাব্য এবং সঙ্গীতের মধ্যে এরূপ মিলনের সম্ভাবনা কম—যেহেতু তাদের প্রকৃতি বিভিন্ন।

সত্যিকারের শিল্পকর্মে—তা কবিতা, নাটক, চিত্র, গান বা ঐকতান বাদন—যাই হোক না কেন, তার স্ব-স্থান থেকে একটি ছত্র, একটি দৃশ্য, একটি মূর্তি কিংবা একটি দণ্ড (bar) সরিয়ে অপর একটি বসিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়—যেমন শারীরিক জীবের-জীবন নষ্ট না করে তার দেহের একটি প্রত্যঙ্গ সরিয়ে আর এক জায়গায় সেটিকে স্থাপন করা অসম্ভব। টলস্টয় মনে করেন, বিখ্যাত সঙ্গীতকার হ্বাগনারের 'নিবেলুঙ্গেন রিং' (Nibelungen Ring)-এ শিল্পের এই উভয় বৈশিষ্ট্যের একত্র সংমিশ্রণ ঘটেছে। অথচ এই সংমিশ্রণ এত নিখুঁত যে গ্রন্থটিকে মেকী শিল্পের আদর্শ বলা যায়।

প্রশ্ন ওঠে, তবে হ্বাগনারের শিল্পসার্থকতার উৎস কোথায়? টলস্টয় মনে করেন, মেকী-শিল্প-সৃষ্টির জন্য সমস্ত কৌশল হ্বাগনার দীর্ঘকাল অনুশীলনের সাহায্যে আয়ত্ত করেছিলেন এবং সে পদ্ধতি প্রয়োগ করে মেকী শিল্পের একটি আদর্শও প্রস্তুত করেছিলেন। সে নিখুঁত মেকী শিল্প অবসর-বিলাসী বিত্তবান সম্প্রদায়ের দর্শক ও

শ্রোতাদের সম্মোহিত করার পক্ষে ছিল যথেষ্ট। মেকী শিল্পের বৈশিষ্ট্যও হল সুকৌশলে পাঠক, শ্রোতা ও দর্শককে সম্মোহিত করে তার ওপর প্রভাব বিস্তার করা। মেকী শিল্পের সম্মোহনের প্রভাব সংস্কৃতি-বিলাসী ধনিক সম্প্রদায়ের ওপরই শুধু বিস্তৃত হয় না, শিল্প-পরিবেশনকারীদের ওপরও এ পর্যায়ের শিল্পের প্রভাব সমানভাবে বিস্তৃত হয়।

টলস্টয় বলেন, এই ধরনের মেকী শিল্পই শিল্পজগতে ভেজাল সৃষ্টি করে অথচ একই ভেজাল শিল্প উপভোগ করবার জন্য বিত্তশালী সমাজ অকাতরে অর্থব্যয় করে নিজেরের সংস্কৃতিসম্পন্ন বলে মনে করেন।

উপন্যাস, গল্প, নাটিকা, মিলনান্তিকা, ছবি, স্থাপত্য, ঐকতান, গীতাভিনয়, হালকা গীতপ্রধান নাটিকা, নৃত্য প্রভৃতি—যা এই যুগে শিল্পকর্ম বলে স্বীকৃত। সেগুলির মধ্যে একটিও লেখক বা শিল্পী-অন্তরে অনুভূত আবেগপ্রসূত কিনা—টলস্টয়ের গভীর সন্দেহ। বিভিন্ন দেশের পরিসংখ্যান নিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, নকলের তুলনায় প্রকৃত শিল্পসৃষ্টির অনুপাত হাজারের মধ্যে একটি মাত্র। অধিকাংশ ছদ্মবেশী শিল্প ধনিক সমাজের সাময়িক অবসর বিনোদন করে কালক্রমে শিল্পজগৎ থেকে সম্পূর্ণভাবে অন্তর্হিত হয়।

কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এ যুগের অধিকাংশ শিল্পকর্মই অসার্থক আবর্জনা বলেই টলস্টয়ের ধারণা। প্রচলিত শিক্ষা-সংস্কার এবং কৃত্রিম জীবনচর্যা প্রভাবে যাদের চিত্তবিকৃতি ঘটেছে, তারা মেকী এবং খাঁটি শিল্পের মধ্যে ভেদরেখা টানতে পারে না। অবিকৃত রুচির সাধারণ ব্যক্তিরাই বরং সহজাত প্রবণতা প্রভাবে নকল এবং আসল শিল্পের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম। রুচিপ্রবৃত্তি এবং গ্রহিষ্ণুতা ক্ষীয়মান হওয়ায় আধুনিকতার ধ্বজাধারী শিক্ষিতমন্য ব্যক্তিরা যে কোন গতানুগতিক মেকী শিল্পকে প্রকৃত শিল্পকর্ম বলে গ্রহণ করেন। টলস্টয় মনে করেন, অভিজাত শ্রেণীসৃষ্ট নয়ন-মন-লোভন শিল্পকর্ম থেকে কৃষক সমাজের স্বতঃ উৎসারিত সঙ্গীত অনেক বেশী শিল্পগুণান্বিত। বেটোফেনের মত প্রতিভাবান সংগীতজ্ঞের শেষ পর্যায়ের সঙ্গীতে অস্পষ্টতা

এবং অস্বাস্থ্যকর উত্তেজনার জন্য সেগুলি টলস্টয়ের নিকট শিল্পসৃষ্টি বলে বিবেচিত হয়নি। তার চাইতে কৃষক রমণীদের মোটা সুরের অকৃত্রিম সঙ্গীত তাঁর নিকট উৎকৃষ্ট মনে হয়েছিল। যেহেতু সে সঙ্গীত শ্রোতার মনে সুনির্দিষ্ট এবং সবল অনুভূতি সঞ্চার করে। সুনির্দিষ্ট কোন অনুভূতির অনুপস্থিতির জন্য বেটোফেনের ১০১ তম সঙ্গীতকে টলস্টয় অকৃতার্থ প্রয়াস, সুতরাং সংক্রমণ-শক্তিহীন বলে সমালোচনা করেছেন।

সুনির্দিষ্ট এবং সবল অনুভূতির অভাবে সাহিত্যক্ষেত্রেও ব্যর্থ শিল্পপ্রয়াস হামেশাই দেখা যায়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে টলস্টয় জানিয়েছেন, জোলা, বুর্জে (Bourget), হুইসম্যান, কিপলিং প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকের উপন্যাস এবং ছোটগল্প ক্লান্তিকর বিষয়বস্তু নিয়ে লিখিত বলে তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি—যেমন করেছিল শিশুদের জন্য পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পূর্ণ অজানা লেখকের একটি ছোটগল্প। সে গল্পে একজন দরিদ্র ধীবর পরিবারের ইস্টার উৎসব প্রস্তুতির কথা সজীব অনুভূতির সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। সেই অনুভূতি অকৃত্রিম বলে টলস্টয়ের মত জ্ঞানী শিল্পানুরসিকও তার দ্বারা তৎক্ষণাৎ সংক্রমিত হয়েছিলেন।

অনেক বিখ্যাত চিত্রশিল্পও (যেমন রুশ চিত্রশিল্পী Vesnetsov-এর গির্জা-সংক্রান্ত) অনুকরণের অনুকরণ বলে অনুভূতির স্ফুলিঙ্গহীন,—সুতরাং শিল্প হিসেবে ব্যর্থ। অথচ তুর্গেনিভের 'তিতির' নামক একটি ছোট গল্প অবলম্বনে একজন অখ্যাত শিল্পী ঘুমন্ত শিশুর যে ছবিটি এঁকেছিলেন, আন্তরিক অনুভূতি উৎসারিত বলে টলস্টয়ের বিবেচনায় তা চমৎকার শিল্পকর্মে পরিণত হয়েছে। টলস্টয় মনে করেন, বিখ্যাত-অখ্যাত যাই হোন না কেন, শিল্পীর শিল্পকর্ম যদি গভীর মানবতা-স্পন্দিত না হয়, তবে তা সার্থকতা লাভে সমর্থ হয় না।

অভিনয়ের ক্ষেত্রেও অনুকরণ-নির্ভরতা শিল্প-সৃষ্টির ব্যর্থতার মূলে। বিখ্যাত নাট্যকার রোসি (Rosse)-প্রযোজিত হ্যামলেট নাটকের অভিনয়ও এমন একটি ব্যর্থ শিল্প-প্রয়াস,— যেহেতু এই অভিনয়ে ট্র্যাজিক যন্ত্রণা দেখানো হয়েছে শিল্পকর্মের অনুকরণের সাহায্যে। অথচ টলস্টয়

ভগুল্‌স (Voguls) নামক একটি বর্বর জাতির অভিনয়ের ভেতর প্রকৃত শিল্পকর্মের নিদর্শন আবিষ্কার করেছিলেন। যেহেতু সে অভিনয়ে যে অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে তা তাঁর মতে অকৃত্রিম সংবেদনাপূর্ণ।

টলস্টয় আরও মনে করেন, অভিজাত শ্রেণীসৃষ্ঠ কবিতা-গল্প-গীতাভিনয়, ঐকতান, যন্ত্রসঙ্গীত প্রভৃতি পাঠক, দর্শক, শ্রোতাকে যে সংক্রমিত করতে পারে না তার কারণ, এই সমস্ত শিল্পকর্মে সহৃদয়তা, মানবিক সহানুভূতি এবং আন্তরিকতার একান্ত অভাব। এই দৈন্য সত্ত্বেও অভিজাত গোষ্ঠী মেকী শিল্পকে আসল শিল্প বলে ভুল করেন। খাঁটি শিল্প সংযত ও পরিমিত এবং নকল শিল্প অলংকৃত বলে নকল শিল্পের দিকেই এদের ঝোঁক। প্রকৃত শিল্পকর্ম সম্পর্কে ধারণায় আসতে অক্ষম।

খাঁটি শিল্পের সঙ্গে কৃত্রিম শিল্পের পার্থক্য নির্ণয়ের প্রধান মাপকাঠি, টলস্টয়ের মতে সংক্রমণ-শক্তির সামর্থ্য এবং সে সামর্থ্যের অভাব। তাঁর মতে অপর অন্তরে আনন্দের অনুভূতি সঞ্চারে অসমর্থ কিংবা শিল্পকর্মের সঙ্গে শিল্প-উপভোক্তার আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনে অক্ষম সৃষ্টি কখনই প্রকৃত শিল্প পদবাচ্য নয়।

সাধারণ মানুষ মেকী শিল্পোদ্ভুত বিনোদনের অনুভূতি অথবা এক ধরণের মানসিক উত্তেজনাকে নান্দনিক অনুভূতি বলে ভুল করে। প্রকৃত শিল্পকর্ম শিল্প উপভোগ-প্রয়াসী এবং শিল্পীর মধ্যে সমস্ত ব্যবধান দূরীভূত করে। খাঁটি শিল্পী শিল্পমোদীর সঙ্গে একাত্ম অনুভব করেন। অকৃত্রিম শিল্পের আকর্ষণী শক্তি ব্যক্তিত্বের মুক্তি ঘটায় এবং বিভিন্ন শিল্প উপ-ভোক্তাকে নিবিড় ঐক্যসূত্রে সংযুক্ত করে।

টলস্টয়ের মতে 'সংক্রমণ' শিল্পের নিশ্চিত অভিজ্ঞান হলেও সংক্রমণের অনুপাত শিল্পোৎকর্ষের একমাত্র মানদণ্ড। তিনি মনে করেন, (১) অনুভূতি যত বেশী স্বতন্ত্র তত বেশী সংক্রামক (২) অভিব্যক্তির স্বচ্ছতা সংক্রমণের সহায়ক (৩) শিল্পের সংক্রামকতার পরিমাণ অকৃত্রিমতার পরিমাণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

শিল্প-সংক্রমণ মুখ্যত নির্ভরশীল শিল্পী-অন্তরের অকৃত্রিমতার ওপর। অর্থাৎ শিল্পী অনুভূতি প্রকাশে কতখানি আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের

তাগিদ অনুভব করেন—তার ওপর। শিল্পী-অন্তরের গভীর থেকে উৎসারিত স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতিই স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত এবং অকৃত্রিম। এই অকৃত্রিমতাই শিল্পীকে অনুভূতির স্বচ্ছ অভিব্যক্তি দানে সক্ষম করে।

শিল্প-সার্থকতা লাভের তিনটি শর্তের মধ্যে টলস্টয় শিল্পীর অকৃত্রিমতাকেই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। তাঁর ধারণা, কৃষকদের শিল্প এই অকৃত্রিমতার প্রকাশ আন্তরিক বলে তা অভিজাত গোষ্ঠীর শিল্প থেকে অনেক বেশী সংক্রামক। ব্যক্তিগত লোভ এবং অহংকার অভিজাত শিল্পীর শিল্পকর্মকে কৃত্রিম করে তোলে।

এই তিনটি শর্তের মধ্যে যে কোন একটির অনুপস্থিতি সৃষ্টিকর্মকে মেকী শিল্পে পরিণত করে।

এই তিনটি শর্ত শিল্পী যে পরিমাণে পূরণ করতে সমর্থ, সে পরিমাণে তাঁর শিল্পকর্ম উৎকর্ষ লাভ করে।

এ ভাবেই অপ-শিল্প থেকে খাঁটি শিল্পকে পৃথক করা যায় এবং এ ভাবেই বিষয়বস্তু-নিরপেক্ষ ভাবে শিল্পের গুণগত উৎকর্ষ নির্ধারিত হয়।

॥ সাত ॥

অতঃপর টলস্টয় শৈল্পিক বিষয়বস্তুর উৎকর্ষ বিচারে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর বিচারে গুরুত্বহীন, স্থূলভ ভাবোচ্ছ্বসিত অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুকে পরিত্যাগ করে গুরুত্বপূর্ণ, হৃদয়াবেগপ্রধান এবং প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুকে শিল্পী যে পরিমাণে শিল্পরূপ দিতে পারেন, শিল্পকর্ম হিসেবে তা সে পরিমাণে উৎকৃষ্ট। যে সৃষ্টিকর্ম যত কম মাত্রায় সে লক্ষ্য পূরণ করে, সে শিল্প ততই নিকৃষ্ট।

এ ছাড়া যে শিল্প কোন যুগ ও সমাজের ধর্মীয় চেতনা-উৎসারিত অনুভূতির অভিব্যক্তি দেয়—তা উৎকৃষ্ট শিল্প বলে বিবেচিত।

টলস্টয় বলেন, যুগে যুগে মানুষ শিল্প জগতের অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে সে শিল্পকেই উত্তম বলে গ্রহণ করেছে—যা ধর্মীয় চেতনা-উদ্ভূত। এ পর্যায়ের শিল্পকেই তারা মূল্যবান বিবেচনা করেছে, উৎসাহ ও আনুকূল্য দান করেছে। অপর পক্ষে স্থূল ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, নৈরাশ্য এবং মেয়েলি অনুভূতি সঞ্চারক শিল্প জনগণের নিকট নিন্দিত এবং ঘৃণিত

হয়েছে। এ ভাবে বিষয়বস্তুর দিক থেকেই শিল্পমূল্য নির্ণিত হয়ে আসছে এবং এ ভাবে শিল্পমূল্য নির্ণিত হওয়া উচিত বলে টলস্টয়ের অভিমত। টলস্টয় মনে করেন, শিল্পের প্রতি এই মনোভাব মানব-প্রকৃতির মৌল বৈশিষ্ট্য-উদ্ভূত এবং সে বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তণীয়।

এ যুগের মানুষ ধর্মকে যে কুসংস্কার বলে বর্জন করেছে টলস্টয় এ কথা জানেন এবং এ যুগে কোন সার্বজনীন ধর্মীয় অনুভূতির যে অস্তিত্ব নেই—যার সাহায্যে শিল্পমূল্য নির্ণিত হতে পারে—এটাও তাঁর অবিদিত নয়। তবে সুক্ষ্ম যুক্তির অবতারণার সাহায্যে তিনি প্রমাণ করেছেন, ধর্মের ওপর এই আক্রমণ এবং ধর্মীয় অনুভূতির বিপরীত জীবন-ধারণা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস সুস্পষ্টভাবে ধর্মীয় অনুভূতির বলিষ্ঠ অস্তিত্বই সপ্রমাণ করে এবং সে অনুভূতির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন জীবন-চেতনাকে ধিকৃত করে। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়- এ যুগের উদ্দেশ্যহীন শিল্পের চাইতে সুস্পষ্ট ধর্মচেতনা-উদ্ভূত শিল্পের মূল্য অনেক বেশী। এ পর্যায়ের শিল্পের উৎসাহদান শিল্প-প্রেমিক মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য বলে তিনি মনে করেন। ধর্মীয় অনুভূতি বলতে টলস্টয় বোঝাতে চেয়েছেন—শাশ্বত মঙ্গলবোধ, মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধেয় বিকাশ এবং মানুষের পারস্পারিক প্রেমময় সামঞ্জস্যবোধ। এই চেতনার ভিত্তিতেই জীবনের প্রত্যক্ষ ব্যাপার গুলির এবং শিল্পেরও মূল্যায়ন হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। এ যুগের মানুষ গুরুত্বপূর্ণ এবং মুল্যবান ধর্মীয় শিল্পের স্থলে সার্বজনীন মিলনের পরিপন্থী গুরুত্বহীন, হানিকর, নিছক আনন্দের অনুভূতি-সঞ্চারী ব্যতিক্রমী শিল্পকে স্থাপন করেছে বলে মানবতাবাদী শিল্পী টলস্টয় বেদনাবোধ করেন। এ যুগের বুদ্ধিজীবী শিল্পীরা শূন্যগর্ভ, এমনকি অনেক সময় কলুষিত শিল্পকে জনপ্রিয় করবার কাজে সহায়তা করে মানুষের দৃষ্টিকে ধর্মীয় শিল্প অনুশীলনের প্রয়োজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন বলে টলস্টয়ের ধারণা। যে খ্রীস্টধর্ম মানবতার মহিমা উপলব্ধি ব্যাপারে মানুষের মানস-জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে, সে বিষয়েও আধুনিক শিল্পী অবহিত নন।

খ্রীস্টীয় ধর্মীয় অনুভূতি ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পারিক মিলনের সহায়ক। অকৃত্রিম শিল্পেরও অন্যতম

লক্ষ্য, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন সাধন। অ-খ্রীষ্টীয় শিল্প ব্যতিক্রমী বলে কিছু সংখ্যক মানুষকে মিলিত করে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। সুতরাং মানব-মিলনের সহায়ক খ্রীষ্টীয় জীবনাদর্শ প্রধান শিল্পই টলস্টয়ের বিবেচনায় সৎ-শিল্প এবং উৎসাহিত হবার যোগ্য। তাঁর মতে আনন্দ, করুণা, উল্লাস প্রভৃতি সৎ-শিল্পের উপাদান।

শিল্পের নিকৃষ্ট উপাদান শিল্প কর্মের মান নিম্নাভিমুখী করে। শিল্পকর্ম প্রকৃত শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হয় যদি তা ব্যতিক্রমী না হয়ে সার্বজনীন এবং সর্ব-মানবের মিলন-সাধক হয়।

উক্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে টলস্টয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন ঃ খ্রীস্টীয় শিল্প দুই প্রকরণের হতে পারে। প্রথম, যা মানুষকে ঈশ্বর এবং মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত করে, অর্থাৎ ধর্মীয় চেতনাময় শিল্প। দ্বিতীয়, যে শিল্প সাধারণ জীবনের সহজতম অনুভূতি-সঞ্চারক,—অর্থাৎ যে শিল্পে সকলের প্রবেশাধিকার আছে। এ প্রকরণের শিল্পকে বলা যায় জনগণের অর্থাৎ সার্বজনীন শিল্প।

টলস্টয়ের মতে এ যুগে এই দুই প্রকরণের শিল্পই উৎকৃষ্ট শিল্প বলে বিবেচিত হবার যোগ্য।

ঈশ্বর এবং মানুষের প্রতি প্রীতি-সঞ্জাত উচ্চতম সাহিত্য শিল্পের উদাহরণ হিসেবে টলস্টয় উল্লেখ করেছেন,—সীলারের The Robbers; ভিক্টোর হুগোর-Les Panvres Gens, Les Miserable; ডিকেন্সের উপন্যাস ও ছোটগল্প—The Tale of Two Cities; The Christmas Carol; The Chimes। এ ছাড়াও এ পর্যায়ের সাহিত্যের অন্যতম উদাহরণ, তাঁর মতে—Uncle Tom's Cabin, দস্তয়ভেস্কির রচনাসমূহ, —বিশেষ করে তাঁর Memoirs from the House of Death এবং জর্জ এলিয়টের Adam Bede।

আধুনিক চিত্রশিল্পে ঈশ্বর এবং মানুষের প্রতি খ্রীষ্টীয় প্রেমানুভূতির প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি খুব কমই দেখা যায়। বর্তমান যুগে বিচিত্র মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতিকেন্দ্রিক অনেক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু আত্মোৎসর্গমূলক মহৎ কর্ম এবং খ্রীষ্টীয় প্রেমানুভূতির প্রতিনিধিত্বমূলক

চিত্রের সংখ্যা খুবই স্বল্প এবং সেই স্বল্প সংখ্যক চিত্রও অখ্যাত শিল্পীদের দ্বারা চিত্রিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলি আবার চিত্রেও পরিণতি লাভ করেনি, কনক্সা মাত্রে পর্যবসিত হয়েছে।

টলস্টয়ের বিশ্বাস, সাহিত্যে এবং সঙ্গীতে উৎকৃষ্ট সার্বজনীন শিল্প রচনা অত্যন্ত কঠিন। চিত্রনির্মাণে শিল্পশৈলী এবং সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্য ব্যগ্রতা অনেক সময় অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে। ফলে ওই প্রকরণের চিত্র সার্বজনীনতা বর্জিত হয়। প্রাচীন ধর্মীয় সাহিত্যশিল্পে সার্বজনীন অনুভূতির অভিব্যক্তি থাকত বলে তা বৃহৎ সংখ্যক মানুষের অন্তরে আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম হত। সার্বজনীন আবেদনহীন এবং বিষয়বস্তুর দৈন্যের জন্য এ যুগের খ্যাতিমান লেখকদের সাহিত্যকর্মও শুধুমাত্র নিজেদের গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জোশেফের সরল গল্পের আবেদন সর্বজনবোধ্য বলে পাঠক সমাজের ওপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছে। এ যুগের বাস্তবধর্মী বলে কথিত উপন্যাসগুলির খুঁটিনাটি বর্ণনা বাদ দিলে আর প্রায় কিছুই থাকে না। বস্তুতপক্ষে তথাকথিত বাস্তবতাই আধুনিক উপন্যাসকে ক্ষয়িষ্ণুতার সম্মুখীন করেছে। টলস্টয় একে বাস্তবতা না বলে অভিহিত করেছেন 'শিল্পে আঞ্চলিকতা'।

আধুনিক সঙ্গীতের জগতেও ক্ষয়িষ্ণুতার চিহ্ন স্পষ্ট। অন্তর্নিহিত অনুভূতির দৈন্যের জন্যই বর্তমান কালের সুরকারদের সুস্বরও আশ্চর্যরূপে শূন্যগর্ভ এবং তুচ্ছ। সেই শূন্যগর্ভ তানসৃষ্ট প্রভাবকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে আধুনিক সঙ্গীত-শিল্পীরা প্রত্যেকটি তুচ্ছ তানের ওপর জটিল উত্থান-পতন পুঞ্জীভূত করেন। সঙ্গীতের প্রত্যেকটি তান মুক্ত এবং সর্বজনবোধগম্য হওয়া উচিত—এটা তাঁরা ভুলে যান। বিশেষ প্রাকরণিক সামঞ্জস্যসূত্রে গ্রথিত হওয়ায় তা অনুশীলনপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অপর মানুষের নিকট বোধগম্য হয় না। তুচ্ছ এবং ব্যতিক্রমী তানগুলিকে আকর্ষণীয় করে তুলবার জন্য তাদের ওপর ছন্দোস্পন্দযুক্ত ঐকতানের জটিলতা চাপিয়ে দেওয়া হয়। ফলে সেগুলি আরও ব্যতিক্রমী স্বভাব প্রাপ্ত হয়ে জনসাধারণের নিকট বোধগম্যতা হারায়।

টলস্টয়ের দৃঢ় প্রত্যয়, অধিকাংশ মানুষের অনধিগম্য কেবলমাত্র

অলস ধনিক শ্রেণীর জীবন-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিক্রমী অনুভূতি অসৎ এবং সেই অনুভূতিসৃষ্ট শিল্প-সাহিত্য সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। বেটোফেনের নবম সিম্ফনি শ্রোতাদের সম্মোহিত করলেও সমুচ্চ ধর্মীয় অনুভূতি-বর্জিত এবং অত্যন্ত ব্যতিক্রমী স্বভাবের হওয়ায় টলস্টয় সে সঙ্গীতকেও উচ্চতম শিল্পের মর্যাদা দিতে অসম্মত।

টলস্টয় বারংবার একথা ঘোষণা করতে ক্লান্তিবোধ করেন নি,—শিল্পবিচারের নিশ্চিত মানদণ্ড ধর্মীয় অনুভূতি—যা মানুষকে মিলিত করে। এই মানদণ্ডের সাহায্যেই তিনি বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যকীর্তি—'ডিভাইন কমেডি', 'জেরুজেলাম ডেলিভর্ডে', শেকসপীয়র এবং গ্যোটের সাহিত্যকর্ম এবং রাফায়েলের চিত্রশিল্পের মূল্যবিচারের পক্ষপাতী।

টলস্টয়ের ধারণা, একমাত্র এরূপ সত্য পরীক্ষার সাহায্যে সমাজ-স্বীকৃত শিল্প নামে অজস্র বস্তুপুঞ্জ থেকে শিল্পামোদীর পক্ষে যা প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ, প্রয়োজনীয় এবং আধ্যাত্মিক খাদ্য—তা নির্বাচন করা সহজ হবে এবং যে সমস্ত অনিষ্টকর, মূল্যহীন এবং বিকৃত শিল্প দ্বারা আমরা পরিবৃত,— সেগুলিকে পৃথক করতে আমরা সমর্থ হব।

।। আট ।।

টলস্টয়ের মতে শিল্প শুধু স্ব-যুগের নয়, অতীত এবং ভবিষ্যতের সঙ্গেও সংযোগের বাহন। সুতরাং শিল্প-বিকৃতি গভীর পরিণামমুখী। এ যুগের মেকী শিল্প মানুষকে আমোদ দেবার এবং বিকৃত করবার কাজে নিয়োজিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তুচ্ছ, ব্যতিক্রমী শিল্পকে উচ্চতম শিল্প বলে ভুল করায় মানুষ প্রকৃত শিল্পকর্ম দ্বারা সংক্রমিত হবার শক্তি হারিয়েছে। শিল্প-বিকৃতি বর্তমান যুগের মানুষকে উচ্চতম অনুভূতি লাভে বঞ্চিত করেছে। শিল্প-সঞ্চারিত হবার ক্ষমতা-বঞ্চিত হওয়ায় উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মের উদাহরণ এ যুগের মানুষের নিকট অজ্ঞাত থেকে গেছে। এর অনিবার্য পরিণতিতে তারা মেকী শিল্পকে উৎকৃষ্ট শিল্প বলে ভুল করেছে, অথবা সহজতম শিল্প-স্বরূপের ধারণায় সামর্থ্য হারিয়েছে। প্রকৃত শিল্পকর্ম-সংক্রমিত হওয়ার ক্ষমতাবর্জিত হয়ে তারা

শিল্পের উদ্ভাবনী শক্তি এবং বিকাশশীলতার প্রভাব-বঞ্চিত হয়ে বেড়ে ওঠে, শিক্ষিত হয় এবং জীবনধারণ করে। ফলে জীবনে তারা স্থূলতা, বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

শিল্প-বিকৃতির পরিণতি ঃ

শিল্পক্রিয়ার বিকৃতির পরিণতি ভয়াবহ। প্রথম, শিল্পক্রিয়া নামে পরিচিত অকিঞ্চিৎকর বস্তুর জন্য শ্রমিক শ্রেণীর অপরিমেয় শ্রম ব্যয় হয়। যে বিকৃত শিল্প অপ্রয়োজনীয় এবং অনিষ্টকর তার জন্য জীবনের অপব্যয়ে মানবদরদী শিল্পী টলস্টয় ব্যথিত হন। যে সমস্ত শিল্প সুন্দর গ্রন্থ রচনার নামে মানব-সমাজে পাপ ছড়ায় কিংবা থিয়েটার, কনসার্ট, প্রদর্শনী এবং চিত্রশালার মাধ্যমে বিচারহীন সাধারণ মানুষকে পাপের পথে আকর্ষণ করে, মানবতাবাদী টলস্টয় তাদের প্রতি ক্ষমাহীন। এই অনিষ্টকর শিল্প-প্রভাবে সাধারণ মানুষ শুধু শারীরিক ও মানসিক শক্তি হারায় না, জীবনের অর্থবোধ থেকেও ভ্রষ্ট হয়। এতে তাদের নৈতিকতাবোধই যে শুধু বিকৃত হয় এমন নয়, মানবজীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদনেও তারা অক্ষম হয়ে পড়ে। ধনিক শ্রেণীর কৌতুক জোগাবার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে তারা মানবিক মর্যাদাবোধ হারায় এবং জনসাধারণের প্রশংসা অর্জনের জন্য একটা স্ফীত এবং অতৃপ্ত গর্ববোধের শিকার হয়। কি উপায়ে শিল্পে ভেজাল দেওয়া যেতে পারে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে এবং শিল্প বিদ্যালয়ে তারা সে শিক্ষাই পেয়ে থাকে। এ শিক্ষা-প্রভাবে তাদের এতটা রুচি-বিকৃতি ঘটে যে, প্রকৃত শিল্প সৃষ্টির ক্ষমতা বঞ্চিত হয়ে তারা কৃত্রিম, তুচ্ছ এবং কলুষিত শিল্প রচনায় আত্মনিয়োগ করে। এতে সামাজিক অবক্ষয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, বিকৃত-রুচির ক্ষয়িষ্ণু ধনিক শ্রেণীর মানুষের নিকট ব্যবসায়িক শিল্পীর চিত্তবিনোদনকারী শিল্পসৃষ্টি জীবনের অর্থহীনতা লুকিয়ে রাখার সহায়ক। যে নিস্তেজ অনুভূতি দ্বারা তারা পীড়িত হয়, স্নায়ু উত্তেজক বিকৃত শিল্প তাদের সেই পীড়ন থেকে রক্ষা করে।

শিল্প বিকৃতির তৃতীয় পরিণতি, শিশু এবং সরল প্রকৃতির মানুষের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি। শিশু এবং কৃষক পর্যায়ের সাধারণ মানুষ দৈহিক

নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তিমান মানুষের প্রতি সাধারণত সশ্রদ্ধ হয়। কিন্তু গায়কেরা, কবিরা, অভিনেতারা, চিত্র শিল্পীরা, যৌথ নৃত্য শিল্পীরা শুধু লক্ষ লক্ষ রুবল্‌স আয় করা নয়, মুনি ঋষিদের চাইতেও অনেক বেশী সম্মান পায় দেখলে তারা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট, চেঙ্গিস খান বা নেপোলিয়ান প্রচণ্ড অতিমানবিক শক্তির অধিকারী ছিলেন বলে তাঁদের স্মৃতির প্রতি সহজেই তারা সশ্রদ্ধ হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি নারীপ্রেম নিয়ে কবিতা লেখে, কিংবা জঘন্য দূষিত জীবন যাপন করেও কাব্য উপন্যাস চিত্র রচনা করে বিখ্যাত হয়, তাদের মৃত্যুর পর তাদের উদ্দেশে (যেমন বদলেয়ারের) যখন স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী হয়, তখন তারা প্রবল বিভ্রান্তির সম্মুখীন হয়।

টলস্টয়ের মতে শিল্পের সঙ্গে সমাজের ভ্রান্ত সম্পর্কের পরিণতি হল এই।

শিল্প-বিকৃতির চতুর্থ পরিণতি হল, অভিজাত গোষ্ঠীর লেখক কর্তৃক সৌন্দর্য এবং মঙ্গলের মধ্যে সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দান।

সাম্প্রতিক কালে শিল্পে সৌন্দর্যবাদী মতবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন নীটশে, তাঁর অনুকারী-ক্ষয়িষ্ণুরা এবং কতিপয় ইংরেজ নন্দনতত্ত্ববাদী—অস্কার ওয়াইল্‌ড এককালে যাদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। এরা সৃষ্টিকর্মের উপাদান হিসেবে এমন বিষয়বস্তুকে নির্বাচন করেন যা নৈতিকতাকে অস্বীকার করে এবং পাপের প্রশংসামুখর।

শিল্পের এই সৌন্দর্যবাদী আদর্শ অর্থাৎ সৃষ্টিজগতে যা আনন্দপ্রদ তার সাহায্যে সত্যের আদর্শকে দূরে অপসারিত করাই হল শিল্প-বিকৃতির চতুর্থ পরিণতি।

শিল্প বিকৃতির পঞ্চম এবং সর্বশেষ কারণ, টলস্টয়ের মতে,—অভিজাত সম্প্রদায়ের অবাঞ্ছিত কুসংস্কার, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, সংকীর্ণ দেশ-প্রেম প্রভৃতি মানবজাতির পক্ষে হানিকর অনুভূতি দ্বারা সমাজ-সংক্রমণ।

শুধুমাত্র গির্জা-প্রভাবিত ধর্মীয় কুসংস্কার নয়, কিংবা শুধুমাত্র স্বাদেশিক চেতনাই নয়, যৌন শিথিলতা মানুষের নৈতিক মানের অবনয়ন ঘটিয়ে শিল্পকেও বিকৃত করে। এ যুগের সাহিত্য শিল্পে, চিত্রশিল্পে, স্থাপত্যশিল্পে, গীতাভিনয়ে, এমনকি গ্রাম্য গীতি ও গাথায়

যৌন চেতনা-উদ্দীপক লালসার উত্তেজনাকে জাগ্রত করে সমাজে ব্যাপক ভাবে পাপ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ যুগের শিল্প মানুষকে অভিপ্রেত অগ্রগতির দিকে চালিত তো করছেইনা, বরং মঙ্গলময় জীবনধারনায় পৌঁছাবার পক্ষে সর্বাধিক বাধার সৃষ্টি করছে।

প্লেটোর মত টলস্টয়েরও অভিমত, অধঃপতিত শিল্পের স্থায়িত্ব কামনা কিংবা প্রচলিত ক্ষয়িষু শিল্পের প্রতি উৎসাহ দান করার চাইতে শিল্পের অস্তিত্বহীনতাই বেশী কাম্য। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়, খ্রীষ্টীয় উপদেশনাকে তার যথার্থ অর্থাৎ সম্পূর্ণ অর্থে গ্রহণ না করাই হল আধুনিক শিল্পের অবনয়নের মূল কারণ। তবে এটাও তিনি বিশ্বাস করেন, শিল্প মানবজীবনের আধ্যাত্মিক অঙ্গ বলে তার, সম্পূর্ণ ধ্বংস সম্ভব নয়। তাঁর মতে এ যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম মানব মিলন এবং ভ্রাতৃত্ববোধের ওপর জোর দিয়ে পাঠক-মনে ধর্মীয় অনুভূতি সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। তাঁর বিবেচনায় ডিকেন্স, হুগো, দস্তয়ভেস্কির সাহিত্য, মিলে (Millet) Bastein, Lepage, Jules Breton, Lhermitta-র চিত্রশিল্প, এ পর্যায়ের। অভিপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সমর্থ না হলেও এ যুগের সৎ-শিল্প স্বাভাবিক প্রেরণায় প্রগতিশীলতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে—এটা মূলক্ষণ।

শিল্প জীবনোদ্ভূত। এ কারণে শিল্পীর জীবনচর্যা অনুযায়ী শিল্প বিভিন্ন রূপ লাভ করে। প্রকৃত শিল্পের সৃষ্টি শিল্পীর অন্তর্নিহিত প্রয়োজনে। মেকী শিল্পের লক্ষ্য বেশ্যাবৃত্তির মত অর্থলাভ। প্রকৃত শিল্পের পরিণতি জীবনের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন কোন অনুভূতি সঞ্চার। ভেজাল শিল্প মানুষের মনে আনন্দ সঞ্চারে অসমর্থ। এ পর্যায়ের সৃষ্টি মানুষের আত্মিক শক্তির ক্ষয়িষ্ণুতাই সূচনা করে।

॥ নয় ॥

আধুনিক শিল্পের অবক্ষয়ী প্রবণতা ধর্মপ্রত্যয়ী মানবমঙ্গলবাদী এবং প্রয়োজনবাদী শিল্পী টলস্টয়কে ব্যথিত করলেও শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্প্রর্কে তিনি আশাবাদী। তাঁর একান্ত বিশ্বাস, সমাজের একাংশ

মাত্রের অনুভূতি-সঞ্চারক শিল্প অনাগত ভবিষ্যতে গুরুত্বহীন বিবেচিত হবে এবং একমাত্র সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি-সঞ্চারক সৃষ্টিকর্ম শিল্প-স্বীকৃতি লাভ করবে। অভিজাত গোষ্ঠীর তৃপ্তিবিধায়ক শিল্পের প্রতি সমালোচক সমাজও উদাসীন থাকবেন। সার্বজনীন শিল্পের মূল্যায়নও করবে জনসাধারণ। সুতরাং ভাবীকালের শিল্পকে শুধুমাত্র সমাজের বিত্তবান উচ্চ শ্রেণীর দাবী মিটালেই চলবে না, বিপুল সংখ্যক শ্রমিক জনসাধারণের দাবীও মিটাতে হবে। শিল্পীর উদ্ভবও শুধু সমাজের নির্বাচিত অংশ থেকেই হবে না। ভাবীকালের শিল্পী হবেন জনসাধারণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি—শিল্পক্রিয়ার প্রতি যাদের অনুরাগ সহজাত।

অনাগত কালের শিল্পী যদি জনগনের মধ্য থেকেই উদ্ভূত হন তবে তার শিল্পসৃষ্টিও হবে সকল মানুষের নিকট বোধগম্য। সে শিল্প হবে বর্তমান বিকৃত শিল্পের জটিলতাবর্জিত। সেই জটিলতার স্থান গ্রহণ করবে স্বচ্ছতা, সারল্য, সংহতি। দ্বিতীয়ত, ভাবী কালে শিল্প-শিক্ষা ব্যবসায়িক শিক্ষায়তনের মাধ্যমে না হয়ে জীবনের প্রথম থেকেই প্রবর্তিত হবে। শিক্ষা-জীবনের প্রারম্ভ থেকেই শিক্ষার্থী যদি নিজের অভিরুচি অনুযায়ী কোন শিল্প-প্রকরণের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে, তবে সে পর্যায়ের শিল্প রচনায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উপযোগী করে তুলতে সক্ষম হবে বলেই টলস্টয়ের বিশ্বাস।

ভাবীকালের শিল্প এ যুগের ব্যবসায়িক মনোভাবপন্ন শিল্পী-সৃষ্টি হবেনা। সে শিল্পের স্রষ্টা হবেন সমাজের এমন পর্যায়ের মানুষ—যাঁরা সৃষ্টিকর্মের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। একমাত্র সে সময় তাঁরা শিল্পকর্ম রচনায় প্রবৃত্ত হবেন যখন তাঁরা এরূপ প্রয়োজনের তাগিদ অনুভব করবেন।

টলস্টয় মনে করেন, শিল্পীর আর্থিক নিরাপত্তা সার্থক শিল্পীসৃষ্টির সহায়ক নয়, যেহেতু সে নিরাপত্তা শিল্পীকে সর্বমানবের সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং নিরাপদ শিল্পীকে গুরুত্বপূর্ণ অনুভূতি লাভের সুযোগ এবং সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করে। টলস্টয়ের মতে প্রত্যক্ষ জীবন সংগ্রামে অংশ গ্রহণই শিল্পীকে সার্থক শিল্পসৃষ্টিতে সক্ষম করে।

ভাবীকালের শিল্পী শ্রমের সাহায্যে জীবিকা অর্জন করবেন, তাঁর অন্তর্নিহিত অনুভূতিকে অপর অন্তরে সঞ্চারিত করে আনন্দ ও পুরস্কার খুঁজে পাবেন। টলস্টয়ের দৃঢ় বিশ্বাস, ব্যবসায়ী মনোভাবাপন্ন শিল্পীদের শিল্পজগৎ থেকে বহিষ্কৃত না করলে শিল্পসৃষ্টির পবিত্রতা অক্ষুন্ন থাকবে না। তাঁর একন্ত প্রত্যয়, ভাবীকালের শিল্প-অনুরাগীরা এ ধরনের শিল্পীকে শিল্পরাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করবেই।

ভাবীকালের শিল্পের বিষয়বস্তুও হবে বর্তমান যুগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কোন ব্যতিক্রমী (Exclusive) অনুভূতির জনমনোরঞ্জক শিল্পরূপ না দিয়ে সে বিষয়বস্তু এমন অনুভূতিরই অভিব্যক্তি দেবে যা যুগের ধর্মচেতনা উদ্ভূত, সর্বমানবের গ্রহণযোগ্য, এবং শিল্পীর স্বাভাবিক জীবন-চর্যার অভিজ্ঞতালব্ধ।

খুঁটিনাটিপূর্ণ গুরুত্বহীন বর্তমান যুগের শিল্পরচনা ভাবীকালের শিল্পীদের নিকট দীন মনে হবে। ভাবীকালের শিল্পচেতনা উৎসারিত হবে সজীব ধর্মনুভূতি থেকে—যা সর্বজনবোধগম্য।

ভাবীকালের শিল্পের উদ্ভব হবে মানুষের চিরকালীন পারিবারিক, সামাজিক, স্বাদেশিক এবং মানবিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। টলস্টয়ের বিশ্বাস, এ সমস্ত সম্পর্ককে খ্রীস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখলে অন্তহীন, বিচিত্র সজীব এবং তীব্র আবেগের উদ্ভব হয়। ভাবীকালের শিল্পী অনুভব করবেন, সর্বজমবোধ্য সহজ অনুভূতির শিল্পরাজ্য (যেমন, রূপকথা, ছোট ছোট গান, ধাঁধা, কৌতুক, নক্‌সা অংকন প্রভৃতি) বিত্তবান সংস্কারচ্ছন্ন শ্রেণীর শিল্প রচনার চাইতে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং ফলপ্রদ,—যেহেতু অভিজাত গোষ্ঠীর ভঙ্গীপ্রধান শিল্প ব্যতিক্রমী বলে তার আবেদন সাময়িক।

টলস্টয়ের আশা, ভাবীকালের শিল্পের বিষয়বস্তু যেমন ঐশ্বর্যবান হবে, তেমনি ফর্মও বর্তমান শিল্পরূপ থেকে উজ্জলতর হবে। যেহেতু ভাবীকালের শিল্পকর্মে শিল্পীর অনুভূতির যে প্রকাশ ঘটবে তা হবে স্বচ্ছ, সহজ, সংহত, আতিশয্যহীন। টলস্টয় নিজেও খুঁটিনাটি বর্ণনা-প্রধান বর্তমান শিল্পকর্ম থেকে সংহত শিল্পপ্রকাশের ওপর গুরুত্ব অর্পণ করেন। তাঁর মতে বাহুল্যহীন ছোটগল্প, স্কেচের সাহায্যে চিত্রশিল্পে

ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টি, বাদ্যযন্ত্রের সহায়তা ব্যতীত সহজ তালের সুর রচনা সহজে অপর মনকে স্পর্শ করে।

জটিল যুগধর্ম-প্রভাবিত আধুনিক শিল্পীর পক্ষে আদি যুগের সৃষ্টিধর্মের সরলতায় ফিরে যাওয়া কোন ক্রমে সম্ভব নয়—এই যুক্তির উত্তরে টলস্টয় বলেন, ভাবীকালের শিল্পীর পক্ষে এরূপ প্রত্যাবর্তন অসম্ভব বিবেচিত হবে না। যেহেতু ভাবীকালের শিল্পী বর্তমান কালের মত শিল্প রচনায় অগ্রসর হবেন না। তাঁরা অর্থাগমের ঐকান্তিক লোভে শিল্পসৃষ্টি না করে অকৃত্রিম আবেগতাড়িত হয়ে শিল্পরচনায় অগ্রসর হবেন। আদর্শবাদী শিল্পতাত্ত্বিক টলস্টয় আশা করেন, ভাবীকালের শিল্পের বিষয়বস্তু এমন অনুভূতি-নির্ভর হবে—যা মানবমিলনকে ত্বরান্বিত করবে, সে শিল্পের আঙ্গিক অস্পষ্টতামুক্ত হয়ে হবে সুস্পষ্ট, সুবোধ্য। ব্যতিক্রমী অনুভূতি ধিক্কৃত হবে, সার্বজনীন মানবানুভূতি ভাবীকালের শিল্পাদর্শে স্বীকৃতি পাবে। বর্তমানে আয়তনের যে পৃথুলতা, অস্পষ্টতা এবং জাটিলতার জন্য শিল্পসৃষ্টিকে মূল্য দেওয়া হয়, ভাবীকালে সে মূল্য স্বীকৃতি পাবে না। সংহতি, স্পষ্টতা এবং ঋজু অভিব্যক্তির ভিত্তিতেই শিল্পমূল্য নির্ণিত হবে। শিল্পসৃষ্টির এই স্তরে উপনীত হলে মানুষের মন অন্তর্মুখী হবে,—মানুষ উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। ভাবীকালের শিল্পীর লক্ষ্য হবে, শিল্পকে অনুভূতিময় চেতনার রাজ্যে উত্তীর্ণ করে দেওয়া, এবং একটা গভীর অনুভূতির বাহন করে তোলা —যা সর্বমানবকে বাস্তব জীবনে সম্পূর্ণতা এবং মিলনের অভিমুখী করে।

॥ দশ ॥

টলস্টয় মনে করেন, বর্তমান যুগে শিল্পের মত বিজ্ঞানও ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করে চলেছে। বিজ্ঞানের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। এদের মধ্যে একের বিকৃতি ঘটলে অপরটিও বিকৃত হতে বাধ্য।

বিজ্ঞানের ভূমিকা হল সত্য এবং জ্ঞানকে মানববোধের জগতে উত্তীর্ণ করা। শিল্প সেই সত্যকে আবেগের জগতে সঞ্চারিত করে।

সুতরাং বিজ্ঞান-নির্দিষ্ট পথ যদি ভ্রান্ত হয়, তবে শিল্প-অনুসৃত পথও ভ্রান্ত হবে। বিজ্ঞান-সৃষ্ট মিথ্যা ক্রিয়াকলাপ অনিবার্য ভাবে আনুষঙ্গিক মিথ্যা শিল্পক্রিয়ার সৃষ্টি করবে।

গভীর অনুভূতি সঞ্চারে ব্যর্থ হলে টলস্টয় যেমন কোন বস্তুকে শিল্পক্রিয়া বলে স্বীকার করেন না, তেমনি সর্বজন-স্বীকৃত গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান সঞ্চারে সমর্থ না হলে তাকে বিজ্ঞান বলেও স্বীকার করেন না।

বর্তমান যুগের শিল্প-বিকৃতির মত বিজ্ঞান-বিকৃতিও টলস্টয়কে ব্যথিত করে। সমাজের উচ্চ বর্গের মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ এ বিজ্ঞান ধর্মকে শুধু অস্বীকার করে না, কুসংস্কার বলে বিবেচনা করে। বর্তমান বিজ্ঞানে সাধারণত সে বস্তুরই সমীক্ষা করা হয় যে বস্তুর চাহিদা বেশী এবং যা প্রীতিপ্রদ। অর্থাৎ যা মানুষের অলস কৌতূহলবোধকে চরিতার্থ করে মাত্র, কোন বৃহৎ মানসিক প্রয়াস দাবি করে না। এমন বস্তু নিয়ে আধুনিক বিজ্ঞান সব সময় ব্যাপৃত—যার সঙ্গে মানব-জীবনের পরম লক্ষ্যের কোন যোগ নেই। উচ্চ শ্রেণীর লোকদের সুবিধায় আসে —তেমন বাস্তব-প্রয়োগ নিয়েই আধুনিক বিজ্ঞান ব্যস্ত। এ যুগে বিজ্ঞানের স্বার্থেই বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন মতবাদ খাড়া করেছেন—যে মতবাদ কলাকৈবল্যবাদীদের প্রায় সমগোত্রীয়।

কলাকৈবল্যবাদীরা যেমন মনে করেন, আনন্দপ্রদ বস্তু মাত্রই শিল্প, তেমনি বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞান বলতে এটা বোঝায় যে, কৌতূহল উদ্রেককারী বস্তুর পাঠ মাত্রই বিজ্ঞান। টলস্টয়ের বিশ্বাস, পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান আধুনিক প্রয়োগ-কৌশলের দিকে বেশী ঝোঁক দেওয়ায় মানুষের বোধশক্তিকে বিভ্রান্ত করেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি দরিদ্র শ্রমিক জীবনের দুঃখ দুর্দশা লাঘব করবার কাজে তেমন সহায়ক হয় নি, যেমন হয়েছে পুঁজিবাদীদের অর্থ সম্পদ বৃদ্ধি, বিলাসদ্রব্য উৎপাদনের সম্প্রসারণ এবং মানব-বিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের জন্য। বিজ্ঞান যদি নেহাৎ কৌতূহলের বিষয়বস্তু না হয়ে মানব কল্যাণে নিয়োজিত হত, তবে মানুষের দুঃখ কষ্টের অনেক লাঘব হত। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান মানব কল্যাণের এই ভূমিকায় সক্রিয় অংশ নিতে পারে নি বলেই টলস্টয়ের ধারণা।

টলস্টয়ের মতে প্রকৃত বিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অনুসন্ধান কর্মেই শুধু ব্যাপৃত হবে না, মানুষের সম্মিলিত জীবন-গঠনেরও সহায়ক হবে। অথচ আধুনিক বিজ্ঞান অর্থ সম্পত্তি এবং ভূমির বিকেন্দ্রী করণের স্বপক্ষে কাজ না করে বরং কেন্দ্রীকরণকে সমর্থন করছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ব্যক্তি ও সামাজিক মানুষের অনৈতিক, হানিকর এবং অযৌক্তিক কাজকে ধিক্কৃত না করে শুধুমাত্র শুষ্ক জ্ঞানতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করবার উদ্দেশ্যে রচিত হয় এবং সেই তৃষ্ণার পরিতৃপ্তিকে বৈজ্ঞানিক কাজ বিবেচনা করে। এ যুগের বিজ্ঞান প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়েছে বলে মানুষের শ্রমের সাশ্রয় হয়েছে, এটা সত্য। কিন্তু এর ফলে, টলস্টয়ের মতে, সাধারণ মানুষও উচ্চ প্রশাসক শ্রেণীর মানুষের মত আলস্যের অধীনতা স্বীকার করেছে।

টলস্টয়ের বিশ্বাস, আধুনিক বিজ্ঞান প্রচলিত সমাজ-বিন্যাসকে অপরিবর্তিত মনে করে। বর্তমানে প্রশাসক শ্রেণীর মানুষ যে শ্রমবর্জিত অলস অধঃপতিত জীবন যাপন করছে, সকলকে তার সে ধরনের জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করে তুলতে চায়। আধুনিক যন্ত্রনির্ভর বিজ্ঞানের প্রভাবে মানুষ জীবন-শর্তের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় পেশী সঞ্চালনের কথা ভুলে যাচ্ছে, ভূমিজ ফসল এবং শস্য লাভে যে আনন্দ—সে আনন্দের স্বাদ থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে।

টলস্টয়ের মতে আধুনিক বিজ্ঞান ভ্রান্ত পথে পরিচালিত বলে কোন প্রকার মানবিক অনুভূতি উদ্রেকে অসমর্থ। যদি কখনও তা কোন অনুভূতির জাগরণ ঘটায় তবে তা সাধারণত অপ্রচলিত, মানবজাতি নিঃশেষিত, এবং আমাদের যুগের পরিপ্রেক্ষিতে মন্দ ও ব্যতিক্রমী স্বভাবের। টলস্টয়ের দৃঢ় অভিমত, আমাদের যুগের শিল্পকে যথার্থ শিল্প পদবাচ্য হতে হলে বিজ্ঞান-নিরপেক্ষভাবে নিজস্ব পথ খুঁজে নিতে হবে এবং এমন বিজ্ঞান থেকে পথ নির্দেশ নিতে হবে যা বিজ্ঞানের রক্ষণশীল দল কর্তৃক অস্বীকৃত।

মানবতাবাদী শিল্পী টলস্টয় চান, এ যুগের মানুষ বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞান—এই মতবাদের অসত্যতা উপলব্ধি করুক। এ ছাড়া এ যুগের পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের গৌন ভূমিকা এবং তুচ্ছতা এ যুগের মানুষকে

উপলব্ধি করতে হবে। এরূপ উপলব্ধি ঘটলেই নৈতিক ও সামাজিক জ্ঞানের মুখ্য তাৎপর্য এবং গুরুত্ব তাঁরা উপলব্ধি করতে সমর্থ হবেন ; তিনি আশা করেন, এ পর্যায়ের জ্ঞান বর্তমান কালের মত কেবলমাত্র উচ্চ শ্রেণীর মানুষকে নির্দেশ দেবার জন্য ব্যবহৃত হবে না, বরং সকল মুক্তমনা এবং সত্যাশ্রয়ী মানুষের নিকট প্রধান কৌতূহলের বিষয়ে পরিণত হবে।

টলস্টয়ের বিবেচনায় বিজ্ঞান অনুশীলনের লক্ষ্য হওয়া উচিত মানব সমাজকে ধর্মীয়, আইনগত এবং সামাজিক বঞ্চনামুক্ত করতে সক্ষম করে তোলা। আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান কোন বিশিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না হয়ে যাতে সর্বমানবের মঙ্গলাবিধায়ক হয় সেদিকে অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে।

।। এগার ।।

শিল্প-জিজ্ঞাসার পরিণতিতে টলস্টয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, —শিল্প আনন্দ, সান্ত্বনা, বা আমোদ সঞ্চারের বাহন মাত্র নয়, তা মানবজীবনের এমন অপরিহার্য বস্তু—যা মানুষের যুক্তিনির্ভর চেতনাকে অনুভূতিতে রূপান্তরিত করে। পারস্পরিক মিলনেই মানবমঙ্গল নিহিত —এটা স্বীকৃত সত্য। বিভিন্ন প্রায়োগিক কৌশলের সাহায্যে মানব-মিলনকে বাস্তবায়িত করা যেমন বিজ্ঞানের লক্ষ্য হওয়া উচিত, তেমনি শিল্পের লক্ষ্য হওয়া উচিত এ পর্যায়ের মিলনাত্মক চেতনাকে অনুভূতির স্তরে উন্নীত করা।

শিল্পের দায়িত্ব বহুব্যাপ্ত। বর্তমান কালে মানব-সমাজে আইন-আদালত এবং পুলিশ-প্রশাসনের সাহায্যে যে শান্তিময় সহাবস্থান অক্ষুন্ন রাখা হয়, শিল্পের ভূমিকা হওয়া উচিত আনন্দময় অনুভূতি সৃষ্টির সে লক্ষ্যে পৌঁছানো। শিল্প-ক্রিয়া জীবন থেকে হিংসা-প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ অপসারণে নিয়োজিত হওয়া উচিত বলে টলস্টয় মনে করেন।

টলস্টয়ের বিশ্বাস, নৈতিক এবং ধর্মনৈতিক চেতনা-প্রভাবেই সমাজ-জীবনে সামঞ্জস্যময়, সুসংস্কৃত রীতিনীতির উদ্ভব সম্ভব। তাঁর মতে শিল্প

যদি আত্মসম্মান রক্ষা এবং স্বদেশের গৌরব কীর্তনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে, তবে তা মনুষ্যত্বের গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আত্মোৎসর্গের অনুভূতি জাগ্রত করতেও সক্ষম। প্রকৃত শিল্প-প্রভাবিত হলেই মানুষ স্বাধীনভাবে, আনন্দিত অন্তরে এবং স্বস্ফূতঃর্তভাবে মানবসেবায় আত্মোৎসর্গের প্রেরণা পাবে। তাঁর মতে সমাজের সর্বোত্তম ব্যক্তিদের উপলব্ধ ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার অনুভূতি মানব-সাধারণের মধ্যে প্রসারিত করাই শিল্পের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই সাধারণীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যেই শিল্প সার্বজনীনতা লাভ করে।

মানুষের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতাকে দূরীভূত করে মানব-মিলনের পথকে যা প্রশস্ত করে—টলস্টয়ের মতে তাই সার্বজনীন শিল্প। কোন প্রকার যুক্তিতর্ক ব্যতীতই বাস্তব জীবনচর্যার সাহায্যে এই প্রকরণের শিল্প সার্বজনীন মিলনের আনন্দ কি বস্তু, তা সপ্রমাণ করে।

এ যুগের শিল্প-পরিণাম সম্পর্কে টলস্টয়ের শেষ অভিমত হল.—যুক্তির রাজ্য থেকে শিল্পসত্যকে অনুভূতির রাজ্যে উত্তীর্ণ করে দিতে হবে—যে সত্য-জাত অনুভূতি মানব-মিলনের সহায়ক। এ ছাড়া, শিল্প-সত্যের সহায়তায় বলের শাসনের পরিবর্তে মানবপ্রীতি-পূর্ণ ভালবাসার রাজ্য সংস্থাপন করতে হবে—যে মানবপ্রীতি জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। ভাবীকালে বিজ্ঞান-সহায়তায় মানবজীবনের নবতর আদর্শ উদ্‌ঘাটিত হতে পারে, কিন্তু আমাদের যুগে যে শিল্প-নিয়তি সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট—তা হল মানবজাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্বসুলভ মিলনের প্রতিষ্ঠা।

গভীর এবং উদার ধর্মচেতনা ও মানবচেতনা প্রভাবে টলস্টয়ের শিল্প-জিজ্ঞাসা পৃথিবীর শিল্প-চিন্তার ইতিহাসে শুধু অপরিসীম মূল্যসমৃদ্ধি অর্জন করেনি, চিরকালীন তাৎপর্যও অর্জন করেছে।

॥ বার ॥

বিংশ শতাব্দীতে মুদ্রাযন্ত্রের অতিশয়িত প্রসারকে শিল্প-বিকৃতির অন্যতম কারণ বলে মনে করেছেন টলস্টয়। তাঁর ধারণা, মুদ্রাযন্ত্রের

ব্যাপক ব্যবহার পূর্বযুগের বিজ্ঞদের কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দিয়ে অর্থশূন্য অতি-কথনকে প্রশ্রয় দিয়েছে। মুদ্রাযন্ত্র এ যুগে আত্মম্ভরী মানুষের শুধু আত্মপ্রকাশের সহায়ক নয়, এক শ্রেণীর মানুষের জীবিকারও আশ্রয়। এক পর্যায়ের লেখক মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে মিথ্যাকথা প্রচার করে উদরপূর্তি করছে। এভাবে মিথ্যার সার্বজনীন মহামারী মানব-মনকে ধ্বংসের দিকে আকর্ষণ করছে। মনীষী রাসকিন মিথ্যার ব্যবসায়ী এ মস্ত লেখকের অন্তহীন রচনার মধ্যে স্বল্পসংখ্যক মূল্যবান গ্রন্থ এবং শব্দ নির্বাচন করা আমাদের মানসিক শাসনের প্রথম প্রয়োজন বলে অনুভব করেছেন।

ফন পলেন্‌জ (Von Polenz)-লিখিত 'Der Biittnerbauer' নামক উপন্যাসখানি এরূপ নির্বাচিত গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম অর্থব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ অকৃত্রিম শিল্পসৃষ্টি মনে হয়েছিল টলস্টয়ের নিকট। তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের সাহায্যে টলস্টয় 'হোয়াট ইজ আর্ট?' গ্রন্থে এ উপন্যাসের উৎকর্ষ নির্ণয় করেছেন এবং এ প্রয়াসে শিল্পাদর্শ সম্পর্কে তাঁর অভিমত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্তও হয়েছে।

এই উপন্যাসের শৈল্পিক উৎকর্ষ নির্ণয়ে তিনি বলেছেন, লেখকের বক্তব্য এখানে সংহত, আন্তরিক এবং জটিলতাহীন। এ উপন্যাসে ঘটনা এবং চরিত্রগুলি আভ্যন্তরীণ শৈল্পিক প্রয়োজনেই একে অপরের সান্নিধ্যে এসেছে, কোন প্রকার চতুর্যপূর্ণ কাহিনীসৃষ্টির প্রয়োজনে নয়। ফলে শিল্প কাহিনী এ উপন্যাসে সামঞ্জস্যে শিল্প-পরিণতি লাভ করেছে।

টলস্টয় এ উপন্যাসকে শুধু অকৃত্রিম শিল্পকর্ম বলেননি, প্রশংসনীয় শিল্পসৃষ্টিও বলেছেন। যেহেতু এ উপন্যাসে প্রকৃত শিল্পসৃষ্টির তিনটি শর্ত বর্তমান ঃ প্রথম, বিষয়বস্তুর গুরুত্ব। এ উপন্যাস কৃষক জীবনভিত্তিক বলে মানবজাতির একটি বৃহৎ অংশ সম্পর্কিত। দ্বিতীয়, উপন্যাসের ভাষারীতি কৃষকের অকৃত্রিম ভাষার ওপর স্থাপিত, সুতরাং অভিব্যক্তির দিক থেকে বলিষ্ঠ ; তৃতীয়, কৃষক-জীবনের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার অনুভূতি দ্বারা লেখক অনুপ্রাণিত

এই উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টি রুশ ভাষায় অনুদিত হলেও পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়নি। টলস্টয়ের মতে এর অন্যতম কারণ, এ

যুগে ভাল সমালোচনার অপ্রতুলতা। এ প্রসঙ্গে টলস্টয় ম্যাথু আর্নল্ডের সমালোচনার আদর্শের কথা উল্লেখ করেছেন, যাতে বলা হয়েছে,—'যেখানে যখনই যা কিছু লেখা হয়েছে তার মধ্যে যা গুরুত্বপূর্ণ উৎকৃষ্ট তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই সমালোচনার কাজ।' বর্তমান কালের সৃষ্টির প্রচুর্যের যুগে এ ধরনের সমালোচনার অপরিহার্য প্রয়োজন সম্পর্কে টলস্টয় নির্দ্বন্দ্ব।

লক্ষ্যের চাইতে উপলক্ষ্যের প্রাধান্য ঘটলে যা হয়, য়ুরোপীয় সমাজে বইয়ের উৎপাদন ব্যাপারেও এরূপ ঘটেছে বলে টলস্টয়ের ধারণা। যে মুদ্রণকর্ম জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার একটা বড় মাধ্যম, সে মুদ্রণকর্মই বর্তমান যুগে অজ্ঞতা বিকীর্ণ করবার প্রধান বাহনে পরিণত হয়েছে। এ যুগের অধিকাংশ সাময়িক পত্র এবং সংবাদপত্র বৃহত্তম ক্রেতার কৌতূহল এবং স্থূলরুচি পরিতৃপ্তির কাজে নিয়োজিত হয়েছে। মুদ্রাযন্ত্রের মালিকদের মধ্যেও অনেকেই সেই একই হীন স্বার্থ এবং স্থূলরুচি-প্রভাবিত। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র এবং বইয়ের সাহায্যে জনসাধারণের দাবী অনুযায়ী বিষয়বস্তু সরবরাহ করে এ পর্যায়ের মালিকশ্রেণী যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করে থাকেন।

বর্তমান যুগের গ্রন্থজগৎ এত নিকৃষ্ট শ্রেণীর বইয়েতে পরিপূর্ণ যে তার মধ্যে থেকে ভাল বই বাছাই করা খুবই কষ্টকর। ক্রমাগত নিম্ন মানের বই পড়তে পড়তে সাধারণ পাঠকের বোধশক্তি এবং রুচিও উত্তরোত্তর বিকৃত হয়ে যায়। ফলে কোন ভাল বই পড়তে গেলে হয়ত সে তা বুঝতে অসমর্থ হয়, কিংবা বিকৃতভাবে বোঝে। বিজ্ঞাপনের দৌলতে সুনিপুণ প্রচারকার্যের মাধ্যমে শিল্পবৈশিষ্ট্যহীন অনেক নিকৃষ্ট বই-ও লক্ষে লক্ষে বিক্রী হয়। বহুল প্রচারের ফলে তুচ্ছ, এমনকি হানিকর বইয়ের খ্যাতি উত্তরোত্তর বেড়ে পাঠক সমাজে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে এবং সাহিত্যের উৎকর্ষ উপলব্ধিতে বাধার সৃষ্টি করে। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, মুদ্রণকর্ম যত বেশী প্রসারিত হচ্ছে, মুদ্রিত বস্তুর গুণগত মূল্য ততই নিম্ন থেকে নিম্নাভিমুখী হচ্ছে।

পুশকিন, লেরমেনটভের পরে আধুনিক রুশ কবি ও কৃত্রিম গদ্যধর্মী লেখকদের রচনায় এবং ইংরেজী সাহিত্যে জর্জ এলিয়ট, থেকারে এবং

ট্রলোপের পরবর্তীকালে কিপলিং, হল কেইন (Hall Caine), রাইডার, হেগার্ড প্রভৃতি লেখকদের উদাসীন অতিরঞ্জনে, আমেরিকার সাহিত্যে ইমারসন, থরো, লাওয়েল, হুইটিয়ার প্রভৃতি লেখকদের পরবর্তী সাহিত্য-শিল্পীদের রচনায় তুচ্ছ বিষয়বস্তু অবতারণার ফলে উপন্যাস ও ছোটগল্প পড়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করেছেন টলস্টয়।

টলস্টয় বলেন, বিগত শতাব্দীর চিন্তানায়ক, কবি, এবং মনীষী গদ্য লেখকদের রচনাকে বর্তমান যুগের পক্ষে অনুপযোগী মনে করা হয়। যেহেতু সে সাহিত্য এ যুগের মানুষের তথাকথিত মহান এবং সূক্ষ্ম দাবি পূরণে অসমর্থ। সে সাহিত্যকে অবজ্ঞার এবং দাক্ষিণ্যের দৃষ্টিতে দেখা হয়। নীটশের দুর্নীতিপূর্ণ, স্থূল, স্ফীত, অসংলগ্ন বুদ্বুদকে এ যুগে মূল্যবান বলে অভিনন্দিত করা হয়। ক্ষয়িষ্ণু কবিতার অর্থহীন এবং কৃত্রিম শব্দবিন্যাসকে উচ্চ মানের কবিতা বলে স্বীকার করা হয়। বক্তব্যহীন নাটকের অভিনয় রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয় হচ্ছে। এবং তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়বস্তু-বর্জিত শিল্পগুণহীন উপন্যাস শিল্পসৃষ্টির ছদ্মবেশে বর্তমান যুগে অজস্র সংখ্যায় মুদ্রিত এবং প্রচারিত হচ্ছে বলে টলস্টয়ের ধারণা।

য়ুরোপে সাহিত্যসমাজে লেখকদের যে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—টলস্টয়ের বিবেচনায় তা বিভ্রান্তিজনক। যেহেতু প্রথম শ্রেণীর বলে স্বীকৃত লেখকদেরও অনেক সময় নিকৃষ্ট রচনায় মেতে উঠতে দেখা যায়, অপর পক্ষে নিম্নতম পর্যায়ের বলে চিহ্নিত কোন কোন লেখক উৎকৃষ্ট শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিচ্ছেন! সুতরাং প্রথম শ্রেণীর লেখকদের রচনামাত্রই প্রশংসার যোগ্য, এবং অখ্যাত লেখকদের রচনা দুর্বল—এমন ধারণা মূল্যবান অনেক রচনা থেকে পাঠকদের বঞ্চিত করে বলেই টলস্টয়ের বিশ্বাস।

মূল্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ নির্বাচনে পাঠককে সাহায্য করতে সক্ষম একমাত্র প্রকৃত সমালোচনা—যার আদর্শ দেখেছিলেন টলস্টয় ম্যাথু আর্নল্ডের সমালোচনাকর্মে। এ পর্যায়ের নিরাসক্ত সমালোচনা ব্যবসায়িক স্বভাব এবং প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট নয় বলে পাঠককে গ্রন্থের যথার্থ মূল্যের সন্ধান দিতে পারে। সুতরাং শিল্পগুণসম্পন্ন রচনাকে উৎসাহ দেবার জন্য

সমালোচনার একটা সমুচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা বর্তমান যুগের পক্ষে অত্যাবশ্যক বলে টলস্টয়ের দৃঢ় ধারণা।

পরিশেষে সাহিত্যের মহত্তম অনুপ্রেরণা হিসেবে নারীত্বের মহিমার জয় ঘোষণা করে টলস্টয় তাঁর মূল্যবান শিল্পভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। পুরুষের তুলনায় নারী কিভাবে তার অফুরন্ত এবং অহেতুক ভালবাসার সাহায্যে লেখকের সচেতন বুদ্ধিবৃত্তিকে অভিভূত করে, অকৃত্রিম কবি-কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে,—তার বাস্তবভিত্তিক বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর স্ব-জীবনের একটি ঘটনা এবং চেকভের 'ডালিং' গল্পকে অবলম্বন করে। নিপুণ বিশ্লেষণের সাহায্যে টলস্টয় দেখিয়েছেন, বুদ্ধিবৃত্তির অভাব দেখে জীবনশিল্পী চেকভ যে নারীকে অভিশাপ দিতে চেয়েছিলেন, অকৃত্রিম কবি-কল্পনা প্রভাবে সে একই নারী অন্তরের অপরিসীম মাতৃস্নেহ এবং অহেতুক প্রীতির বিকাশ উপলব্ধি করে তাঁর প্রতি স্বীয় অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন।

টলস্টয়ের সার্বিক শিল্প জিজ্ঞাসার মূলে অকৃত্রিম ধর্মবোধ, নীতিবোধ এবং সুগভীর মানবতাবোধের সুগভীর চেতনা। আধুনিক হৃদয়হীন শুষ্ক যুক্তিবাদ এবং আত্যন্তিক বুদ্ধিচর্চার যুগে তাঁর সর্বাত্মক মানব-মঙ্গলমুখী শিল্পভাবনা হয়ত সর্বাংশে স্বীকৃত হবে না। কিন্তু তাঁর শিল্প-জিজ্ঞাসার কেন্দ্রে চিরকালীন মানুষ বলে তার আভ্যন্তরীণ মূল্য সর্বযুগের সুধীমহলে স্বীকৃতি পাবে—এমন আশা অহেতুক নয়।

তৃতীয় অধ্যায়

টলস্টয়ের শিল্পভাবনার আধুনিকতা বিচার

শিল্পতত্ত্বের ক্রমবিকাশের দীর্ঘ ইতিহাসে দেখা যায়, যুগরুচি এবং এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে শিল্প-ভাবনারও পরিবর্তন ঘটেছে। অ্যারিস্টটল এবং প্লেটোর শিল্প ভাবনা কিংবা সোপেনহাওয়ার ক্রোচের শিল্প ভাবনা এক নয়। আবার বর্তমান যুগের সাম্যবাদী চিন্তার প্রভাবে শিল্পচিন্তার জগতে নিত্যনতুন তত্ত্ব এবং মতবাদ জন্ম নেওয়ায় বহুকাল-লালিত শিল্পভাবনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। শিল্প জগতে বৈপ্লবিক কোন পরির্তনের দেখা গেলে তাকে সাধারণত প্রগতিশীল বলে অভিনন্দিত করে পূর্বযুগের শিল্পাদর্শের ওপর 'প্রাচীনপন্থী, সেকেলে'—লেবেল এঁটে দেওয়া হয়। অথচ এটা অস্বীকার করা যাবে না, বিভিন্ন যুগের শিল্পতাত্ত্বিকের মনে শিল্পের প্রকৃতি এবং স্বরূপ সম্বন্ধে যে নতুন নতুন জিজ্ঞাসা জাগ্রত হয়েছিল, স্ব-যুগে তার তো একটা মূল্য ছিলই, এমনকি পরবর্তী যুগের শিল্প তাত্ত্বিকদের কাছে সেগুলি একেবারে মূল্যহীন বিবেচিত হয়নি। নতুন শিল্পচিন্তার আলোকে তাঁরা পূর্বযুগের শিল্পতত্ত্বের পুনমূল্যায়নে প্রয়াসী হয়েছেন এবং সে প্রয়াসের ফলে শিল্পতত্ত্বের নতুন দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এভাবে পুরাতন শিল্পচিন্তা এবং পরবর্তীকালের নতুন শিল্প ভাবনার সমন্বয়ে অভিনব কোন শিল্পতত্ত্ব শিল্পামোদী মহলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

টলস্টয়ের ব্যাপক এবং গভীর শিল্পভাবনা এককালে সমগ্র বিশ্বের শিল্পমোদী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল—এটা ঐতিহাসিক সত্য। জীবনাদর্শের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিল্পভাবনা বর্তমান যুগের পক্ষে উপযোগিতাহীন এবং সেকেলে বলে মনে করা হচ্ছে। এ অবস্থায় আধুনিক শিল্পচিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে তার শিল্পভাবনার কোন মূল্য আছে কিনা, থাকলে তার পরিমান কি, তার বিবেচনাই হবে আমাদের মুখ্য প্রয়াস।

॥ দুই ॥

টলস্টয়ের মননশীল শিল্প জিজ্ঞাসা 'What is Art'? নামে গ্রন্থবদ্ধ হয়ে সর্বপ্রথম প্রকাশিত ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে। সমসাময়িক কালে পাশ্চাত্ত্য জগতের আর একজন দার্শনিক শিল্পতাত্ত্বিক বেনেদেত্তো ক্রোচের শিল্পতত্ত্ববিষয়ক 'এস্থেটিক' (ল এস্তেতিকা) নামক মৌলিক মননসমৃদ্ধ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে,—'What is Art'? গ্রন্থ প্রকাশের চার বৎসর পরে এবং টলস্টয়ের মৃত্যুর আট বৎসর আগে। সমসাময়িক এই দুই মনীষী শিল্পতাত্ত্বিকের শিল্পাদর্শের বিভিন্নতার মধ্যে টলস্টয়ের শিল্পভাবনার বৈশিষ্ট্য কোথায় এবং সে শিল্পচিন্তায় আধুনিকতার কোন লক্ষণ ছিল কিনা—তার বিচার অনেকটা সহজ হবে।

এই উভয় মণীষীর শিল্পচিন্তার যে পার্থক্যটি প্রথমেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল,—টলস্টয়ের শিল্পচিন্তা জীবনের অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যয় নির্ভর, স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ। তার ভাবভূমিতে বহুব্যাপ্ত গভীর উপলব্ধি কখনও জটিলতা প্রাপ্ত হয়নি। অপর পক্ষে ক্রোচের শিল্পদৃষ্টি মুখ্যত দার্শনিক উপলব্ধি-প্রভাবিত বলে বেশ জটিল—অতি সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্কের অরণ্যে সে শিল্পাদর্শের স্বরূপ সন্ধানে পাঠককে বেশ বেগ পেতে হয়। দ্বিতীয়ত, টলস্টয়ের শিল্প-জিজ্ঞাসার বিকাশ হয়েছিল ব্যাপক মানবচেতনা এবং মানবকল্যাণ-ভাবনার আশ্রয়ে। অপরপক্ষে ক্রোচের শিল্পতত্ত্বের উৎসমূলে ব্যক্তি চৈতন্যের গভীরতা এবং অন্তর্মুখী ব্যক্তি মনের বিচিত্র উপলব্ধি। আধুনিকতার একটা বড় বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিমনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ। ক্রোচের শিল্পতত্ত্বে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যজাত সে অন্তর্গূঢ় ব্যক্তিমনের উপলব্ধি যে পরিমানে দার্শনিক ভাবচিন্তায় জটিলতা প্রাপ্ত হয়েছে, টলস্টয়ের সহজ মানব প্রত্যয়জাত শিল্প জিজ্ঞাসায় সেই দার্শনিক চিন্তার জটিলতা নেই। তাঁর বিস্তৃত শিল্পচিন্তার পটভূমিকায় লোকহিত, নানা বৈষম্যে বিচ্ছিন্ন মানবজাতির মিলন-কামনা। এক কথায়, টলস্টয়ের শিল্পভাবনার দৃঢ় ভিত্তি রচনা করেছে তাঁর অন্তরে সদাজাগ্রত সমষ্টিচেতনা।

আধুনিক শিল্পতাত্ত্বিক ক্রোচের মতে শিল্পসৃষ্টির মূল প্রেরণা (Intuition—প্রতীতি বা প্রতিভান)। যে জ্ঞানের সাহায্যে শিল্পসৃষ্টি হয় তা প্রাতিভানিক জ্ঞান। এই জ্ঞানের সাহায্যেই সৃষ্টি হয় সৌন্দর্য, আর নৈয়ায়িক জ্ঞানের পরিণতি 'সত্য' লাভ। ক্রোচের অভিমত, সত্য প্রকাশে শিল্পের প্রকৃত কোন ভূমিকা নেই, যেহেতু নৈয়ায়িক জ্ঞান সত্য মিথ্যা বিচারের নির্ণায়ক প্রাতিভানিক জ্ঞান নয়। এভাবে ক্রোচে কবি কীটস-উপলব্ধ 'সৌন্দর্যই সত্য' (Beauty is truth) কিংবা টলস্টয় এবং রবীন্দ্রনাথ-উপলব্ধ সত্য এবং সুন্দরের অভিন্নত্বকে যুক্তি এবং দার্শনিক তর্ক-বিচারের সাহায্যে খণ্ডন করে শিল্পসৃষ্টিতে সৌন্দর্যের অনন্য ভূমিকার কথা ঘোষণা করেছেন। বস্তুতপক্ষে অন্তশ্চৈতন্যের উপলব্ধিজাত বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের অনুভূতিই ক্রোচের মতে সকল শিল্প সৃষ্টির মূল প্রেরণা। এই অভিমত আধুনিক শিল্পতাত্ত্বিক-মহলে স্বীকৃত।

সৌন্দর্যের স্বরূপ ব্যাখ্যায় ক্রোচে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা তাঁর দার্শনিক চেতনা-উদ্ভূত এবং শিল্পচিন্তায় অভিনব বলে অভিনন্দিত। তাঁর উপলব্ধিতে সৌন্দর্যের উদ্ভব মানুষের অন্তর্নিহিত চেতনালোকে। তিনি বলেন, মানুষ বর্হিবিশ্বে বস্তুকে সুন্দর দেখে অন্তর্লোকের সৌন্দর্যের আলোকে। শিল্প-জিজ্ঞাসার প্রথম স্তরে রবীন্দ্রনাথ টলস্টয়ের মত সৌন্দর্য এবং মঙ্গলের অভিন্নত্ব উপলব্ধি করলেও শিল্পী জীবনের পরিণতিতে ক্রোচের মতই অন্তশ্চেতনা-নির্ভর বিশুদ্ধ সৌন্দর্য মতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তাঁর সে সৌন্দর্য চেতনার অনবদ্য প্রকাশ ঘটেছে বিখ্যাত 'আমি' কবিতায়:

আমারি চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠল আলো
পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'—
সুন্দর হল সে।

বলা বাহুল্য, এই সৌন্দর্যের অনুভূতি একান্তভাবে ব্যক্তিচেতনা নির্ভর স্বাতন্ত্র্যধর্মী। সৌন্দর্য অনুভবের সূক্ষ্ম উপলব্ধি ক্রোচে কিংবা রবীন্দ্রনাথ থেকে টলস্টয়েরও কম ছিল না। কিন্তু ক্রোচে এবং রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তি চেতনা-নির্ভর স্বাতন্ত্র্যধর্মী সৌন্দর্যানুভূতিকে শিল্প-ভাবনায় তিনি প্রাধান্য দেন নি। সৌন্দর্যের স্বরূপ নির্ণয়ে যে কেন্দ্রবিন্দু থেকে তিনি যাত্রা করেছিলেন, কোন অবস্থায় তার থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। তাঁর সৌন্দর্যবোধ মুখ্যত সমষ্টিচেতনা-উদ্ভূত। যে সৌন্দর্যের উৎসে সত্যের দৃঢ় ভিত্তি নেই এবং যে সৌন্দর্যানুভূতি মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে শিল্প-সৃষ্টিতে নিয়োজিত নয়, সে স্বাতন্ত্র্যধর্মী বিশুদ্ধ নান্দনিক সৌন্দর্য তাঁর নিকট অর্থহীন। প্রাক্ বিপ্লব যে রুশ সমাজে তিনি বাস করতেন, সে সমাজের লালসার্জ্জর ভোগসর্বস্ব সৌন্দর্য চর্চা মানুষে মানুষে পার্থক্যকে পর্বত-প্রমাণ করে তুলেছিল। তার প্রতিক্রিয়ায় তাঁর সমস্ত শিল্প-সত্তা আলোড়িত হয়। সে আলোড়িত অন্তরের কোন শুভ মুহূর্তে তাঁর মানব-প্রেমবিগলিত অন্তরে এই উপলব্ধি জাগ্রত হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে,—শিল্পসৃষ্টি মাত্রেরই একটি উদ্দেশ্য থাকা উচিত, এবং সে উদ্দেশ্য অবশ্যই মানব মৈত্রী এবং মানবহিত। শিল্পসৃষ্টির উৎসে মানবহিত বা মানব মঙ্গলের সমুচ্চ আদর্শ এবং সক্রিয় প্রেরণার অভাব ঘটলে সে শিল্প ব্যক্তিগত খেয়ালী কল্পনা প্রভাবিত হয়ে অবক্ষয়ের পথে নেমে যাবে—এ বিষয়ে টলস্টয়ের মনে কোন দ্বিধা ছিল না।

টলস্টয়ের পরিণত শিল্প এবং সৌন্দর্যানুভূতির উৎসমূলে সদাজাগ্রত ছিল ব্যাপক এবং গভীর সামাজিক দায়িত্ববোধ—যা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যধর্মী আধুনিক শিল্পমোদী মাত্রই এড়িয়ে যেতে চান। এঁদের বিবেচনায় টলস্টয়ের শিল্প ভাবনায় বা সৌন্দর্য চেতনায় এমন দার্শনিক অনুভূতির অস্তিত্ব ছিল না যার সাহায্যে তিনি বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের নান্দনিক স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন। তাঁদের মতে টলস্টয় শিল্প-ভাবনায় স্থূল পুরাতন জগতের অধিবাসী—আধুনিক শিল্পী-মনে যে অনুভূতিগম্য সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতি জন্ম নিয়েছে, টলস্টয় তার সন্ধান পান নি।

আধুনিক প্রগতিবাদী শিল্পতাত্ত্বিক মহলে প্রাচীনপন্থী এবং সেকেলে বলে সমালোচিত হলেও আধুনিক যুগের মনীষী সাম্যবাদী নেতা লেনিন

তাঁর সাহিত্য এবং শিল্প সম্পর্কীয় আলোচনায় টলস্টয়কে অতি-তীক্ষ্ণ সমাজ-সচেতন প্রগতিবাদী শিল্পী বলে অভিনন্দিত করেছেন। প্রাক্-বিপ্লব রুশ সমাজের ভোগসর্বস্ব আত্মকেন্দ্রিক ধনিক শ্রেণী কর্তৃক উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত, শোষিত জনগণের মর্মন্তুদ বেদনাই যে তাঁর শিল্প-চেতনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে তাঁর শিল্পাদর্শকে গণ-অভিমুখী করে তোলে—এ বিষয়ে তাঁর মনে কোন সন্দেহ ছিল না। তবে লেনিনের মতে প্রাচ্য সাম্যবাদী জীবনাদর্শ, সন্ন্যাসবাদ (ascetieism), অধ্যাত্মবাদ, অপ্রতিরোধ এবং নৈরাশ্যবাদ-প্রভাবিত বলে টলস্টয়ের গণচেতনায় শ্রেণী-সংগ্রামের প্রত্যাশিত প্রেরণা আত্মপ্রকাশ করেনি। বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও বিপ্লবী সাম্যবাদী নেতা লেনিন শিল্প রচনায় টলস্টয়ের প্রগতিশীল ভূমিকার কথা স্বীকার করতে দ্বিধা করেন নি।*

রবীন্দ্রনাথের মত বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবাদী কবিও শিল্পী জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়ে গণ-জীবনকে নিজের সৃষ্টিতে যথাযোগ্য স্থান দিতে পারে নি বলে তাঁর সৃজনকর্মের অপূর্ণতা উপলব্ধি করেছেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রত্যাশা ছিল, তাঁর অপূর্ণ শিল্প-সাধনাকে সম্পূর্ণতা দান করবেন ভবিষ্যৎ জীবনশিল্পী গণজীবনের আশ্রয়ে :

> কৃষকের জীবনের শরিক যে জন
> কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
> যে আছে মাটির কাছাকাছি,
> সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
> (ঐকতান)।

টলস্টয়ের শিল্প রচনার প্রেক্ষাপটে এই বহু-বিস্তৃত গণজীবন। রবীন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবনের অপূর্ণতার বেদনা যেন সার্থক বাস্তব রূপ লাভ করেছে টলস্টয়ের গণজীবন-নির্ভর শিল্প ভাবনায়। তাঁর মতে সমাজের উচ্চবিত্ত ধনিক এবং শিক্ষিত সমাজ অলস জীবনের অবসরে

* দ্রষ্টব্য, Lenin on Literature and Art, Progressive, Publishes, rescow, 1970 গ্রন্থের ৪৮ থেকে ৬২ পৃষ্ঠার মধ্যে প্রবন্ধ-গুলি পঠিতব্য।

গ্রন্থকার।

ভোগকামনার পরিতৃপ্তির জন্য যে শিল্প সৃষ্টি করেন, তা ব্যতিক্রমী শিল্প (Exclusive Art)। সে সৃষ্টিতে সার্বভৌম শিল্পের (Universal Art) স্বতঃস্ফূর্ত আবেদন নেই। সে শিল্পের প্রকাশ অস্বচ্ছ, দুর্বোধ্য, এলোমেলো। অন্তঃসারশূন্য, বহিরঙ্গে প্রসাধিত সে শিল্পকে টলস্টয় ক্ষয়িষ্ণু শিল্প (Decadent Art) বলতেও দ্বিধা করেন নি। অথচ আধুনিক ব্যতিক্রমী শিল্পমোদী মহলে টলস্টয়ের শিল্পবোধ সেকেলে বলে চিহ্নিত, সমালোচিত। এ যুগের জীবনের মতই শিল্পাদর্শ সম্পর্কে একালের মূল্যবোধও দ্বিধাবিভক্ত—সুবিধামত কোন শিল্পাদর্শকে কখনও বলা হচ্ছে সেকেলে, রক্ষণশীল—আবার কখনও বলা হচ্ছে প্রগতিপন্থী, আধুনিক।

এই দ্বিধার প্রকাশ দেখা যায় সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল শিল্পতাত্ত্বিক রবীন্দ্র-মনেও। এই দ্বিধার ফলেই কখনও তিনি বলেছেন, যে সৃজনকর্ম নানা কলাকৌশলের সাহায্যে বিশ্বমানবের মধ্যে মিলন ঘটায় তাই শিল্প, তাই সাহিত্য। শিল্প সৃষ্টির সুস্পষ্ট লক্ষ্য, সত্য এবং মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা। আবার আধুনিক শিল্প চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বলেন, বিশুদ্ধ সৌন্দর্য সৃষ্টি ছাড়া শিল্পের আর কোন লক্ষ্য নেই, শিল্প সৃষ্টিতে বিষয়বস্তুর ভূমিকা গৌণ, শিল্পের একমাত্র গৌরব,—রূপের গৌরব।

এ যেন ক্রোচে-উপলব্ধ শিল্পতত্ত্বেরই প্রতিধ্বনি! ক্রোচের মতে শিল্প প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু, যেহেতু শিল্প জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়ার সৃষ্টি। অপরপক্ষে কর্মাত্মিকা ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয় মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে। শিল্প জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়া বলে শিল্পের সঙ্গে প্রয়োজনের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। ক্রোচে আরও বলেন, যেহেতু শিল্প প্রতিভান (Intuition) এবং সে প্রতিভানের প্রকাশ (একস্প্রেশন) বহির্বস্তুর মধ্যে, সুতরাং রূপের মূল্য ছাড়া শিল্পের আর কোন মূল্য নেই। শিল্পের মূল্য নির্ভরশীল শিল্পদেহের পারিপাট্য বিধানে।

॥ তিন ॥

শিল্পসৃষ্টির এই উৎস এবং লক্ষ্য টলস্টয়-উপলব্ধ শিল্পের উৎস এবং লক্ষ্যের বহু দূরবর্তী। টলস্টয় শিল্পসৃষ্টির উৎসকে একান্তভাবে অন্ত-

জগতের ব্যাপার মনে না করে শিল্পীর মানবিক সহানুভূতিকেই সেই উৎস স্থল বলে নির্দেশ করেছেন। শিল্পীমনে এই উপলব্ধি সঞ্চারিত হয় বহির্জীবনে কোন তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা দেখে। তাঁর মতে, স্বীয় অন্তরে উপলব্ধ অনুভূতি শিল্পী যখন সার্থকভাবে অপর অন্তরে সঞ্চারিত করেন, তখনই শিল্পসৃষ্টি সার্থক হয়ে ওঠে। এই সঞ্চরণ ক্রিয়ার মাধ্যম যদি সহজ সরল, অনুভববেদ্য এবং সুস্পষ্ট না হয় তবে তা অপর মনকে সহজে আকর্ষণ করতে পারে না। টলস্টয় এখানে ক্রোচে-কথিত এবং রবীন্দ্রনাথ সমর্থিত শিল্পদেহের রূপের গৌরবের চাইতে বিষয়ের গৌরবকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে শিল্পরচনার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু যদি মানব জীবনের পক্ষে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর হয় তবে সে শিল্পসৃষ্টি মূল্যহীন হতে বাধ্য। শিল্প-উপলব্ধ মানবজীবন সম্পর্কীয় কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু সহজ সরল সুস্পষ্ট ভাষার মাধ্যমে শিল্পমূর্তি লাভ করলে অপর মনকে তা সহজে সংক্রমিত করতে সক্ষম হয়।

শিল্পসৃষ্টির উৎস এবং অভিব্যক্তি সম্পর্কে টলস্টয়ের এই অভিমত আধুনিক শিল্পামোদী মহলে যতই সমালোচিত হোক না কেন, বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, আধুনিক জগতে শিল্পসৃষ্টির সাহায্যে মানব-সমাজকে যারা উদ্বুদ্ধ করেছেন, তাঁদের শিল্প-প্রেরণায় উৎসমূলে ছিল কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা জীবন-সমস্যা। তবে তাঁদের শিল্পরচনার ভাষা যে সব সময় সহজ, সরল, সুস্পষ্ট, তা নয়,—সে প্রকাশ-মাধ্যম বা শিল্পশৈলী বিষয় অনুযায়ী কখনও সরল, কখনও জটিল, আবার কখনও বা রূপক-সংকেতের ব্যবহারে অস্পষ্ট, রাহস্যিক। টলস্টয় শিল্প প্রকাশের ভাষা এবং রীতি-বৈশিষ্ট সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তার ভেতর আধুনিকতা বা বাস্তবদৃষ্টি কোনটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। সাধারণ পাঠকের নিকট পুরাণের রূপকথার এবং ধাঁধাজাতীয় রচনার ভাষা যতই বোধগম্য হোক না কেন, শিল্পরচনার ভাষা ওই জাতীয় সহজ প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে—এটা প্রত্যাশিত নয়। শুধুমাত্র সরল কৃষক জীবন কিংবা ধনিক-লাঞ্ছিত উৎপীড়িত শ্রমিক জীবনই আধুনিক শিল্পের বিষয়বস্তু হবে—এমন ধারণা সৃষ্টি কল্পনাকে সংকুচিত করে। আধুনিক জীবন বহু স্রোতে প্রবাহিত। অর্থনৈতিক,

রাজনৈতিক, সামাজিক—বহু সমস্যার টানাপোড়েনে আধুনিক জীবনের গ্রন্থি খুবই জটিল হয়ে হয়ে পড়েছে। নাগরিক জীবনে সে জীবনের জটিলতা আরও বেশী। সুতরাং আধুনিক শিল্পে সে জীবন-জটিলতা প্রতিবিম্বিত হয়ে সে শিল্পরূপও যে মনঃপ্রধান জটিল হয়ে উঠবে—এটা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয়। আধুনিক শিল্পকর্ম টলস্টয়-কথিত সহজ প্রাণের প্রেরণায় সহজ প্রকৃতির মানুষের জন্যই শুধু রচিত হয় না। আধুনিক জীবনের বহুমুখী জটিল জীবনের আশ্রয়ে এ যুগের শিল্প, সাহিত্য চিন্তাপ্রধান হয়ে উঠেছে। শিল্প সাহিত্যের এই পরিণতি অস্বাভাবিক বিবেচনায় আদিমতাধর্মী মানুষের জটিলতাহীন সরল জীবনবোধের রাজ্যে ফিরে যাওয়ার অর্থ বর্তমানকে অস্বীকার করা। এ যুগের বিলাসসর্বস্ব, ভোগকেন্দ্রিক জীবনের মানবতাবিরোধী কুৎসিৎ স্বার্থমগ্নতা টলস্টয়ের মনে যে অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল খুব সম্ভব তারই প্রভাবে তিনি স্বপ্নময় অতীতের সহজ জীবনবোধের রাজ্যে পলায়ন করতে চেয়েছিলেন। মনীষী রাজনৈতিক নেতা লেনিন যখন টলস্টয়ের শান্তিবাদী এবং অপ্রতিরোধী জীবনবোধের সমালোচনা করেন, তাঁর সমালোচনার লক্ষ্যে টলস্টয়ের এই পলায়নী মনোভাবই ছিল বলে মনে হয়। লেনিন শিল্প-সাহিত্যকে মানবতাবিরোধী কাজে বাধা দেবার শক্তিশালী মাধ্যম বিবেচনা করতেন। টলস্টয়ের শিল্পচেতনার উৎসে মানবতাবিরোধী কাজের প্রতি পুঞ্জীভূত ঘৃণার অস্তিত্ব নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তাঁর শিল্পতত্ত্বে এমন কোন প্রচণ্ড শক্তিমান প্রগতিবাদী চিন্তা চোখে পড়েনা—যা পাঠকের মনে মানুষ্যত্ববিরোধী কাজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টির দুর্বার প্রেরণা জোগায়।

টলস্টয় খ্রীষ্টীয় ধর্মদেশনার যথাযথ অনুসরণকেই প্রকৃত শিল্পসৃষ্টির সহায়ক বলে নির্দেশ করেছেন। এই নির্দেশের ভেতর চিরকালীন আদর্শরাজ্যের শিল্পবোধের কথা আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আদর্শ শিল্পবোধের রাজ্য বাস্তব শিল্প-সংসার থেকে বহুদূরে অবস্থিত। মহান আদর্শ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন বলে টলস্টয় একথা বুঝেও বুঝতে চাইছিলেন না যে, খ্রীস্টের উপদেশ যে যুগে যে সমাজের উদ্দেশ্যে দেওয়া

হয়েছিল সে যুগ ও সমাজ বিবর্তিত হয়েছে। জনগণের হৃদ্‌পদ্মসম্ভব গাথাকাব্য, ঘুম পাড়ানি গান এবং ধাঁধাঁ রচনার কাল বহু পূর্বেই বিগত হয়েছে। ইলিয়াড এবং ওডেসির জীবনবোধ এ যুগে অবলুপ্ত। আধুনিক জীবন-সমুদ্রে যে প্রবল মন্থন চলছে, তার আকর্ষণে-বিকর্ষণে ব্যক্তিজীবন আলোড়িত, সমাজ-জীবন বিক্ষুব্ধ, বৃহত্তর বৈশ্বিক জীবন দিগ্‌ভ্রান্ত। এই আলোড়িত বিক্ষুব্ধ দিগ্‌ভ্রান্ত মানুষের লক্ষ্যহীন জীবনে অভ্রান্ত পথের রেখা দেখাতে সক্ষম একমাত্র মননশীল বাস্তব জীবন-বোধ-নির্ভর শিল্প-সাহিত্য। বর্তমান যুগেযুক্তিবাদী বিজ্ঞানের প্রভাবে মানুষের চিরপোষিত ধর্মবোধের জগতে বিরাট ফাটল দেখা দিয়েছে। ধর্মের স্থান গ্রহণ করেছে চিন্তাপ্রধান সাহিত্য, মননপ্রধান শিল্প। এমন কি সুপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থকেও যুক্তিবাদী চিন্তার আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করে তার অন্তর্নিহিত চিরকালীন সত্যকে নিষ্কাষণ করবার দাবি চলছে। এ অবস্থায় স্বপ্নময় অতীত যুগের আকর্ষণে শিল্প সাহিত্য রচনায় বর্তমান জীবন-জটিলতাকে অস্বীকার করার অর্থ—আধুনিক উদ্বেলিত জীবনের রূঢ় বাস্তবকে অস্বীকার করা।

বস্তুতপক্ষে টলস্টয়ের সুচিন্তিত শিল্প-জিজ্ঞাসায় চিরন্তন জীবন-সত্যের স্থির দীপ্তি পাঠক মনকে আলোকিত করলেও পাকে পাকে বিঘূর্ণিত আধুনিক জীবনের রূঢ় বাস্তবতাকে অস্বীকার সে মনকে হতাশ করে। আধুনিক জীবনের নানা পঙ্কিলতা, গ্লানি, পচনশীলতা, ক্ষয়িষ্ণুতা দেখে টলস্টয়ের সমস্ত চিত্ত এত বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল যে, সে জীবনকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে তিনি স্বপ্নময় অতীত জীবনে কিংবা আধুনিক জীবন সংস্কারের প্রভাবহীন প্রাকৃত জীবনে প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শিল্পী উটপাখীর মত চক্ষু বন্ধ করে থাকলেও আধুনিক জীবন বিক্ষুব্ধ আলোড়নের মধ্যে নিজের গতিতে আবর্তিত হবেই। সংস্কার মুক্ত জীবন-চিন্তার স্বচ্ছ আলোকে দিগ্‌ভ্রান্ত বিঘূর্ণিত জীবনের সত্য-রূপকে প্রজ্ঞার আলোকে শিল্পসাহিত্যে মূর্তিমান করে তোলাই যে আধুনিক শিল্পীর মুখ্য কৃত্য 'টলস্টয়ের মত মনীষী শিল্প-তাত্ত্বিক এই বাস্তব সত্যকে এড়িয়ে গেলেন কেন—আধুনিক শিল্প-জিজ্ঞাসুর মনে এই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক।

॥ চার ॥

শিল্প প্রাতিভাসিক জ্ঞান—আধুনিক শিল্পতাত্ত্বিক ক্রোচে-নির্দিষ্ট এই শিল্প-সংজ্ঞা এ যুগের শিল্পবিচারের মাপকাঠি নির্ণয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। ক্রোচের মতে শিল্প প্রাতিভাসিক জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়ার ফল বলে শিল্পের সঙ্গে নীতির কোন স্থান থাকতে পারে না,—যেহেতু নীতি-নিরপেক্ষতা আধুনিক শিল্পীকে যে স্বাধীনতা দিয়েছে তার অপব্যবহার আধুনিক শিল্প-জগতে অহরহই দেখা যাচ্ছে। শিল্প সৃষ্টিতে সত্য প্রতিষ্ঠায় অবিচল থাকা উচিত বলে মত প্রকাশ করেও শিল্পের মুখ্য লক্ষ্য যে সৌন্দর্য—এ বিষয়ে মহান শিল্পতাত্ত্বিক টলস্টয়ের মনে কোন দ্বিধা ছিল না। কিন্তু আধুনিক শিল্পে-সাহিত্যে স্থূল সৌন্দর্যের যে নগ্ন প্রকাশ মানুষের মনকে কলুষিত করে ভোগ-বাসনার দিকে দুর্নিবার বেগে আকর্ষণ করছে,—টলস্টয়ের যত অভিযোগ সে নীতি-নিয়মহীন এবং সংযমহীন সৌন্দর্য সৃষ্টির বিরুদ্ধে। মোপাসাঁর কোন কোন উপন্যাসের সমালোচনায় টলস্টয় এই অভিযোগ গোপন রাখেন নি। সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের সাহায্যে তিনি দেখাতে চেয়েছেন, সৌন্দর্য অলক্ষিতে মানুষের মনকে ভোগের দিকে আকর্ষণ করে। এ কারণে কঠোর নীতিবাদীর ভূমিকা গ্রহণ করে টলস্টয় মানব-মনকে সম্মোহক স্থূল বস্তুজগতের সৌন্দর্যের মোহমুক্ত করে সে মনকে আত্মিক অনুভূতিবেদ্য নিষ্কলুষ সৌন্দর্যাভিমুখী করতে চেয়েছেন। নির্দ্বিধায় তিনি এ অভিমত প্রকাশ করেছেন, ধর্মীয় অনুভূতিজাত সৌন্দর্যই শিল্পীর অনুশীলনের বিষয় হওয়া উচিত। যেহেতু এ প্রকরণের সৌন্দর্য শিল্প উপভোগের চিত্তে উত্তেজনা সৃষ্টির পরিবর্তে প্রশান্তি আনয়ন করে।

সুতরাং সাহিত্য-শিল্প-সংসারে স্রষ্টার উচ্ছৃঙ্খল আবেগকে সংযত করবার জন্য টলস্টয় যদি কোন নীতি-নিয়ম-সংযমের কথা বলে থাকেন, তাকে সেকেলে মানসিকতাজাত (demo'dant) বলে অগ্রাহ্য করার সঙ্গত কোন কারণ নেই। আর্ট নীতিশাস্ত্রের কোন কোড্ (code) নয়, নীতি-প্রচারের বাহনও নয়,—এই অভিমত নত শিরে স্বীকার-যোগ্য। কিন্তু সৌন্দর্য সৃষ্টির নামে মানুষের অন্তরস্থিত সুষুপ্ত বাসনাকে জাগ্রত করে মানুষকে দুর্নীতিগ্রস্ত জীবনের দিকে ঠেলে দেওয়াও

নিশ্চয়ই আর্টের উদ্দেশ্য হতে পারে না। শুধুমাত্র আর্ট কেন, যে ব্যক্তিবোধ এবং সমাজচেতনা থেকে আর্টের উদ্ভব—সে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনও কি উচ্চতর জীবন-নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না? টলস্টয় যখন সৌন্দর্যসৃষ্টি প্রক্রিয়ায় নীতি নিয়ম সংযমের আনুগত্য স্বীকারের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন, তাও এই উচ্চতর জীবন-নীতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

বস্তুতপক্ষে শিল্পের সঙ্গে তত্ত্ব, উপদেশ এবং নীতির সম্পর্ক বিষয়ে আধুনিক শিল্পতাত্ত্বিক ক্রোচের মনেও দ্বিধা ছিল। শিল্প ব্যাপারটিকে শুধুমাত্র প্রাতিভানিক জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধতার অসুবিধার কথা তিনি নিজেও অনুভব করেছিলেন। তাঁর মতে 'এক্‌সপ্রেশন' বা প্রকাশ মাত্রই শিল্প নয়। শিল্পী-অন্তরে উদ্‌ভাবিত রূপমূর্তি যখন বস্তু শরীরে রূপান্তরিত হয়, তখনি হয় শিল্পের জন্ম। অর্থাৎ কেবলমাত্র 'এক্‌সপ্রেশন' নয়, 'একস্টার্নালাইজেশন'-ও (Externalisation) শিল্প-অভিব্যক্তির অন্যতম শর্ত। এ দিক থেকে বিচার করলে শিল্প-সংজ্ঞাকে শুধুমাত্র প্রাতিভানিক জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা চলে না। স্বীকার করতে হয়, শিল্প কর্মাত্মক ক্রিয়াও বটে।

শিল্পকে প্রাতিভানিক জ্ঞান বলে স্বীকার করে নিলে তার সঙ্গে নীতি, তত্ত্ব, উপদেশ প্রভৃতির কোন সম্পর্ক থাকে না,—এটা সত্য। কিন্তু শিল্প বলতে যদি বহির্জগতে অবয়ব প্রাপ্ত শিল্পবস্তু বোঝায় তবে তত্ত্ব, নীতি, উপভোগ প্রভৃতির সঙ্গে শিল্পের সংযোগ থাকা স্বাভাবিক। ক্রোচে নিজেও স্বীকার করেছেন—'If by art be understood the externalisation of art, then utility and morality have a perfect right to enter into it।' এ বিষয়ে যুক্তি উত্থাপন করে ক্রোচে বলেন, মনের সমস্ত ভাবকে আমরা নির্বিচারে শিল্পরূপ দিই না। ভাববস্তুকে বহির্জগতে শিল্পরূপ দিতে গেলে আমরা নির্বাচনের আশ্রয় নিই। অর্থাৎ মনের জগতে সজ্ঞালব্ধ জ্ঞান বা প্রতিভান যে ভাব সৃষ্টি করে তার থেকে যুক্তি-বিচারের সাহায্যে আমরা কোনটিকে শিল্পরূপ দিই, আবার কোনটিকে বর্জন করি। এই নির্বাচন-কর্মটি অর্থনৈতিক এবং নৈতিক প্রবণতার সাহায্যেই নিয়ন্ত্রিত

হয়। আধুনিক শিল্পতাত্ত্বিক ক্রোচে এখানে তাঁর মূল প্রতিপাদ্য থেকে অনেকখানি সরে এসে শিল্পসৃষ্টিতে তত্ত্ব, উপযোগিতা এবং নীতির যথাযোগ্য ভূমিকা স্বীকার করেছেন। শিল্পসৃষ্টিকে জ্ঞানাত্মিকা থেকে কর্মাত্মিকা ক্রিয়ার অনুভবের মধ্যে ক্রোচের শিল্পসৃষ্টির যে প্রসার সূচিত হয়েছে তা দার্শনিক কাণ্টের কথাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়: 'The requisites for fine art are therefore imagination, understanding, soul and taste'। কার্যক্ষেত্রেও দেখা যায় উপযোগ, বিচারবুদ্ধি, এবং নীতিবোধ প্রতিভানকে বহির্জগতে শিল্প-রূপ দিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং শিল্পরূপ বিচারে তত্ত্ব, উপদেশ এবং নীতির পরস্পর সাপেক্ষতা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এভাবে দেখা যায়, শিল্প ভাবনার প্রারম্ভে শিল্পকে তত্ত্ব নীতি এবং উপযোগ-নিরপেক্ষ প্রাতিভানিক জ্ঞান বলে সংস্কার-মুক্তির পরিচয় দিলেও শিল্পচিন্তার পরিণতিতে ক্রোচে শিল্প-প্রকাশের সঙ্গে সেগুলির সাপেক্ষতার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন।

আধুনিক শিল্পতাত্ত্বিক ক্রোচে শিল্প-বিচারে যেখানে এসে যাত্রা শেষ করেছেন, টলস্টয়ের সেখান থেকেই যাত্রা শুরু।

শিল্প কোন অভিনব এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেন্দ্রিক হবে এবং তার লক্ষ্যে থাকবে মানব-মঙ্গল এবং লোকহিত—এ বিষয়ে টলস্টয়ের মনে কোন দ্বিধা ছিল না। এ ছাড়া শিল্পী-মন কোন উচ্চতর জীবন-নীতি প্রভাবিত না হলে শিল্পসৃষ্টি কোন গুরুত্ব বা স্থায়িত্ব লাভ করে না—এ বিষয়ে টলস্টয়ের প্রত্যয়ও ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। সুতরাং শিল্পের লক্ষ্য হিসেবে তত্ত্বধর্মিতা, উপযোগিতা কিংবা নীতিবাদের সমর্থনের জন্য টলস্টয়কে আধুনিকতা-বিরোধী সেকেলে শিল্পতাত্ত্বিক বলে অভিহিত করবার সঙ্গত কোন কারণ নেই। যেহেতু আধুনিক শিল্পতাত্ত্বিকের পরিণত শিল্পচিন্তায়ও এগুলির যথাযোগ্য ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে।

ক্রোচের শিল্পতত্ত্বের আধুনিকতার সর্বশেষ লক্ষণ, শিল্পবিচারে কল্পনার অনন্যনির্ভর মানদণ্ড ব্যবহার। সকল যুগের শিল্পতাত্ত্বিকের মত ক্রোচে শিল্পকে শুধু কল্পনার সৃষ্টি বলেই ক্ষান্ত হননি, কল্পনার আদর্শকেই শিল্প বিচারের একমাত্র মানদণ্ড বলে ঘোষণা করেছেন।

যে যুক্তির সাহায্যে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা এই : যেহেতু শিল্পসৃষ্টির প্রেরণার উৎস একমাত্র কল্পনা, এবং কল্পনা নৈয়ায়িক জ্ঞান-নিরপেক্ষ, সে কারণে শিল্প-বিচারে কল্পনার আদর্শ ছাড়া অপর কোন মানদণ্ড ব্যবহার অচল। 'এস্থেটিক' গ্রন্থে তিনি বলেছেন : 'The criterion of taste is absolute with the Intuitive absoluteness of the imagination' (P. 122)।

শিল্প কল্পনাসৃষ্ট বলে শিল্পবিচার কল্পনার আদর্শেই হওয়া উচিত— এই সূত্র কল্পনার স্ব-নির্ভর নিরপেক্ষ রূপকে অক্ষুন্ন রাখলেও এ মানদণ্ড সে বিচারকে বস্তুনিষ্ঠ করার চাইতে ব্যক্তিনিষ্ঠ করে তোলে। বস্তুত পক্ষে শিল্পবিচার বস্তুনিষ্ঠাকে প্রাধান্য না দিয়ে ব্যক্তিনিষ্ঠাকে প্রাধান্য দিলে সে বিচারে ভ্রান্তির অবকাশ থাকে। টলস্টয়ও শিল্প সৃষ্টির উৎস হিসেবে কল্পনার অনন্য ভূমিকার কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু শিল্প বিচারে কল্পনার অনন্যপরতন্ত্র আদর্শ মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেন নি। ক্রোচের মত কল্পনাকে অদ্বৈতরূপে উপলব্ধি না করে তিনি দেখেছেন দ্বৈতরূপে : সৃষ্টিধর্মী কল্পনা (Constructive imagination) এবং খেয়ালী কল্পনা (Fancy)। খেয়ালী কল্পনা প্রভাবে যা সৃষ্টি হয় তা কৌতূহলোদ্দীপক, লঘু, লোকরঞ্জক। শিল্প বিচারে এ ধরনের সৃষ্টি নিম্ন পর্যায়ের বলেই তাঁর বিশ্বাস। আর সৃষ্টিধর্মী কল্পনা প্রভাবে যে শিল্পকর্ম রূপলাভ করে তার স্বভাবে থাকে সার্বজনীন আবেদন। তাঁর মতে এই পর্যায়ের শিল্পই স্থায়িত্ব অর্জন করে। টলস্টয়ের শিল্প বিচারে এখানে ব্যক্তিধর্মী খেয়ালী কল্পনাপ্রসূত শিল্পের মূল্য অস্বীকৃত, বস্তুনিষ্ঠ সার্বজনীন সৃজনধর্মী কল্পনাপ্রসূত শিল্পের মূল্য স্বীকৃত। আধুনিক শিল্পচর্চায় কোন কোন মহলে খেয়ালী কল্পনাপ্রসূত ব্যক্তিনিষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি সমাদৃত হলেও চিরকালের বিচক্ষণ বিচারশীল শিল্পামোদী মহলে সৃষ্টিধর্মী কল্পনাসৃষ্ট শিল্পকর্মই উচ্চ মানের বলে স্বীকৃত হয়েছে।

শিল্পবিচারে টলস্টয় কল্পনার যে ভূমিকার উল্লেখ করেছেন, তা ক্রোচে নির্দেশিত কল্পনার মত স্বাতন্ত্র্যধর্মী নয়। সৃষ্টিকর্মে কল্পনার ভূমিকা বিচারেও তাঁর সে একই সমষ্টি চেতনা। টলস্টয়ের স্ব-যুগে

বহু শিল্পকর্মে অনন্যপরতন্ত্র কল্পনা আত্মপ্রকাশ করে তাকে ব্যক্তিধর্মী বিলাস এবং উপভোগের সামগ্রী করে তুলেছিল। একারণে শিল্প-বিচারের মানদণ্ড হিসেবে টলস্টয় কল্পনার এমন একটি সার্বভৌম রূপের আশ্রয় নিয়েছেন—যাকে তিনি বলেছেন সৃষ্টিধর্মী কল্পনা। এই সৃষ্টিধর্মী কল্পনাই যে শিল্পকর্মে তাঁকে সিদ্ধি এনে দিয়েছিল, তা কারো অবিদিত নয়।

॥ পাঁচ ॥

শিল্পের প্রকৃত ভূমিকা নির্ণয়ে ধর্ম, নীতি, সংযম, উদ্দেশ্যমূলকতা প্রভৃতির অবতারণা এবং সমর্থন করায় টলস্টয়-উপলব্ধ শিল্পতত্ত্ব আধুনিক শিল্পামোদী মহলে প্রাচীনপন্থী অনাধুনিক বলে বহু-সমালোচিত। যে উৎকট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ আধুনিক মানব সমাজে ব্যাপক প্রসারতালাভ করে এ যুগের মানুষকে অহংসর্বস্ব, বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ এবং অবসন্ন করে তুলেছে,—সে একই অনুভূতি আধুনিক শিল্পীমনেরও বৈশিষ্ট্য। টলস্টয়ের জীবনঘনিষ্ঠ শিল্পতত্ত্ব আধুনিক শিল্পীর অহং-সর্বস্বতা, বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা এবং মানসিক ক্লৈব্যের বিরুদ্ধে এক সবল প্রতিবাদ। তাঁর শিল্পভাবনায় আধুনিক শিল্প-তাত্ত্বিকের মত সর্বসংস্কারমুক্তির আস্ফালন নেই। আছে,—সর্বমানবের মৈত্রী মিলনের উদার মনোভাব। আধুনিক স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ, অহংসর্বস্ব শিল্পী এবং শিল্প সমালোচক টলস্টয়ের চিরন্তন মানবাদর্শ-প্রভাবিত শিল্পবোধকে অনাধুনিক বলে বিচার-বিমূঢ়তার পরিচয় দেন, এটাই আশ্চর্য।

এই বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও ভাবীকালের শিল্পরূপ কল্পনায় টলস্টয় যে আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁকে নিঃসন্দেহে প্রগতিবাদী শিল্পতাত্ত্বিকদের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবে। পুনরুল্লেখ হবে জেনেও এই আদর্শবাদী শিল্পতাত্ত্বিকের ভাবীকালের শিল্প-পরিকল্পনার কথা আবার লিখছি। তাঁর মতে ভাবীকালের শিল্পের আবেদন কোন শ্রেণী বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে হবে সর্ব-লোকাশ্রয়ী। এই সার্বজনীন শিল্পের উদ্ভবও হবে জনসাধারণ থেকে

উদ্ভূত কোন শিক্ষিত ব্যক্তির হাতে। ভাবী কালের শিল্প ব্যক্তিমনের খেয়ালখুশীর তাড়নায় সৃষ্ট হবে না,—হবে প্রয়োজনের তাগিদে। ভাবীকালের শিল্পী অবসরবিলাসী হবেন না,—হবেন এমন পর্যায়ের ব্যক্তি যাঁরা শ্রমের সাহায্যে জীবিকা অর্জন করেন। ভাবীকালের শিল্পীর জীবন-অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষলব্ধ বলে বাহুল্যবর্জিত জীবনের সংহত রূপ তাঁদের শিল্পকর্মকে সজীব এবং প্রাণবন্ত করে তুলবে। বর্তমানের মত ভাবীকালের শিল্প ব্যবসায়িক সাফল্যের আশায় রচিত হবে না,—হবে শিল্পীর অকৃত্রিম মানবিক আবেগ-প্রভাবে। ফলে সে শিল্প হবে বিষয়-গৌরবী, বাস্তব চেতনাসম্পন্ন। সে শিল্পের অভিব্যক্তিও হবে জটিলতাহীন, সর্বজনবোধগম্য। ভাবীকালের শিল্প আধুনিক বিভ্রান্ত মানুষের বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করতে সহায়তা করবে। আয়তনের বিরাটত্বের জন্য ভাবীকালের শিল্প সমাদৃত হবেনা,—হবে তার অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের জন্য।

মানব-সাম্য চেতনায় উদ্বোধিত স্বপ্নদর্শী আদর্শবাদী শিল্পতাত্ত্বিক টলস্টয়ের এই সার্বজনীন-শিল্পসৃষ্টি-স্বপ্ন কোন কালে বাস্তবে রূপলাভ করবে কিনা বলা খুবই শক্ত। কিন্তু এই মহান মানবতাবাদী শিল্প-তাত্ত্বিকের প্রত্যাশার ভেতর প্রগতিশীলতার যে অভ্রান্ত স্বাক্ষর আছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

চতুর্থ অধ্যায়

শিল্পভাবনায় টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথ

শিল্পতাত্ত্বিক হিসেবে টলস্টয় এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সাদৃশ্য যেমন আছে বৈশাদৃশ্যও তেমনি কম নয়। উভয় মনীষীর শিল্পভাবনা তাঁদের দীর্ঘবিস্তৃত সাহিত্যিক জীবনের বহুকাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। টলস্টয়ের শিল্পভাবনায় বিবর্তনের রেখাটি খুব স্পষ্ট। যৌবনে এবং প্রৌঢ়ত্বে যে সমস্ত গল্প উপন্যাস লিখে অনন্য প্রতিভাবান কথাশিল্পী হিসেবে তিনি জগদ্বিখ্যাত হন, বৃদ্ধকালে সেগুলির শিল্পমূল্য তিনি অস্বীকার করেন, এমনকি সেগুলির সংস্কারে পর্যন্ত প্রয়াসী হয়েছিলেন। শিল্পী জীবনের অন্তিম পর্যায়ে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, যে শিল্পকর্ম অবসরবিলাসী বিত্তবান মানুষের কৌতূহল উদ্রেক করে, ভোগের ইন্ধন জোগায়, মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতাকে দূরীভূত করে মানব সমাজকে মিলিত করতে অক্ষম, আকর্ষণীয় বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকসৌন্দর্য সত্ত্বেও তা মূল্যহীন। মানব কল্যাণের মহৎ লক্ষ্যে নিয়োজিত সৃজনকর্মকেই তিনি শুধু শিল্পসৃষ্টির মর্যাদা দিয়েছিলেন। টলস্টয়ের পরিণত শিল্প-প্রেরণার লক্ষ্যে ছিল একমাত্র মানবতাবাদী জীবনাদর্শ।

টলস্টয়ের জন্মের ৩৩ বৎসর পরে ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে হয় রবীন্দ্রনাথের জন্ম এবং টলস্টয়ের মৃত্যুর পর তিনি আরও ৩১ বৎসর বেঁচেছিলেন। সুদীর্ঘ সাহিত্য-জীবনে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বহু মনীষী শিল্পতাত্ত্বিকের শিল্পচিন্তার উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন, কোন কোন শিল্প আন্দোলন এবং শিল্পচিন্তা তাঁর ভাবধর্মী মনকে গভীরভাবে আলোড়িতও করেছিল। ফলে তাঁর শিল্পচিন্তায় যথেষ্ট বৈচিত্র্য দেখা যায়। কোথাও তাঁর শিল্পচিন্তা সহজাত কল্পনাপ্রবণ মনের দ্বারা অনুরঞ্জিত, কোথাও বা আধুনিক শিল্পচিন্তা-প্রভাবিত, আবার কখনও বা স্ব-বিরোধিতায় আচ্ছন্ন। অনেক স্থলে তাঁর শিল্পভাবনা অবশ্য মৌলকতা-ভাস্বর। তবে একটি বিষয় লক্ষিতব্য। টলস্টয়ের

শিল্প ভাবনা যেমন বিভিন্ন শিল্প প্রকরণ এবং বহুমুখী জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনে বিশাল ব্যাপ্তি লাভ করেছিল, রবীন্দ্রনাথের শিল্পজিজ্ঞাসা মুখ্যত সাহিত্যাশ্রয়ী বলে সে পরিমাণ ব্যাপ্তি লাভের অবকাশ পায়নি। অবশ্য রবীন্দ্র শিল্প-চিন্তায় ব্যাপ্তির অভাব থাকলে গভীরতার কোন অভাব ছিল না। বহুস্থলে মৌলিকতার লক্ষণাক্রান্ত বলে তাঁর মূল্যবান শিল্পভাবনা শিল্পতাত্ত্বিক মহলে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মুখ্যত অতি তীক্ষ্ণ সৌন্দর্য-সচেতন কবি হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের শিল্প-ভাবনায় সৌন্দর্যতত্ত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তবে সে সুন্দর মঙ্গলের সম্পর্ক-বর্জিত নয়। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের শিল্পাদর্শ টলস্টয় থেকে খুব দূরবর্তী নয়। প্রকৃত শিল্পকর্ম বিচ্ছিন্নতাকে দূরীভূত করে মানব-মিলনের পথকে সুগম করে তোলে—এ প্রত্যয় টলস্টয়ের মত রবীন্দ্রনাথেরও। সাহিত্য শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিরূপণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, পারস্পরিক মানব-মিলনের সহায়ক বলেই জীবনে সাহিত্যের স্থান গুরুত্বপূর্ণ।

তবে শিল্পের লক্ষ্য বিষয়ে উভয় শিল্পতাত্ত্বিকের মনোভাব দুই প্রান্তবর্তী। শিল্পের বিষয়বস্তু হবে গুরুত্বপূর্ণ এবং লক্ষ্য হবে লোকহিত —এ বিষয়ে টলস্টয়ের মনে কোন দ্বিধা ছিল না। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে শিল্প অপ্রয়োজনের আনন্দ ছাড়া কিছুই নয়। তাঁর মতে শিল্পকর্ম সৃষ্টিতে শিল্পীর লক্ষ্যে থাকে সৌন্দর্য এবং আনন্দ চেতনার উদ্বোধন। এই বিশুদ্ধ নান্দনিক উপলব্ধির রাজ্যে পৌঁছাতে পারলে তবেই শিল্প কালজয়ী হয়। অপর পক্ষে টলস্টয় শিল্প রচনায় সৌন্দর্য সৃষ্টির লক্ষ্যের কথা স্বীকার করেও সার্বভৌম আবেদনসম্পন্ন শিল্পসৃষ্টির অপরিহার্য প্রেরণা হিসেবে ধর্মীয় চেতনার ওপর অনন্যনির্ভর গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। তাঁর মতে শুধুমাত্র নান্দনিক উপলব্ধিময় সাহিত্য মানব মিলনের সহায়ক নয়। একমাত্র ধর্মীয় চেতনাসমৃদ্ধ সাহিত্যই সে মহান ভূমিকা পালনে সমর্থ। সুতরাং কালজয়ী হবার অধিকার আছে শুধুমাত্র এ পর্যায়ের সাহিত্যের।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পচেতনায় ধর্মীয় উপলব্ধির অস্তিত্ব ছিল না, এমন নয়। তবে টলস্টয় থেকে তাঁর ধর্ম-উপলব্ধি পৃথক। তাঁর উপলব্ধিতে

ধর্ম মুখ্যত কবির ধর্ম। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, শিল্পই জীবন, জীবনই শিল্প (Art is life, life art)। জীবনের সঙ্গে শিল্পকে এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত-মিশ্রিত করে পৃথিবীর খুব কম শিল্পতাত্ত্বিকই উপলব্ধি করেছেন। জীবন শিল্পময়—এমন একটা আন্তর উপলব্ধি প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের শিল্প-চেতনায় ভাবধর্মী অনুভূতিরই প্রাধান্য—যদিও সে অনুভূতি একান্তভাবে বাস্তবতাবর্জিত নয়। তাঁর শিল্পজিজ্ঞাসা মুখ্যত ভাববাদী চেতনা-প্রভাবিত বলে সে জিজ্ঞাসায় টলস্টয়ের শিল্পভাবনার ঋজুতা এবং বলিষ্ঠতা দেখা যায় না।

টলস্টয়ের উপলব্ধিতে জীবন সত্যোপলব্ধির পথে অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামেরই নামান্তর। তাঁর জীবনী পাঠক মাত্রই জানেন, সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ভোগৈশ্বর্যময় পারিবারিক জীবন যাপন করার পর তাঁর অন্তর্জগতের সংগ্রাম তীব্র হয়ে ওঠে। এই আত্মিক সংগ্রাম প্রভাবে তাঁর শিল্পোপলব্ধিরও আমূল পরিবর্তন ঘটে। এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে তাঁর শিল্পজিজ্ঞাসায়ও আসে জীবন-প্রত্যয়ের দৃঢ়তা। এই অবিচলিত জীবন-প্রত্যয় প্রভাবে শিল্পরাজ্যের যে সমস্ত ভাব এবং বস্তুকে তিনি অসুন্দর মনে করতেন, তাকে অসুন্দর বলে উচ্চকণ্ঠ ঘোষণায় তিনি দ্বিধা করেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে শুধুমাত্র সে সমস্ত বস্তু এবং ভাবই সুন্দর যা জীবনকে গ্লানিমুক্ত করে সর্বমানবের মধ্যে অকৃত্রিম ভালবাসা এবং মিলনের অনুভূতি জাগ্রত করে। সৌন্দর্যের স্বরূপ নির্ণয় প্রশ্নে নির্বিচার সৌন্দর্যবাদী শিল্পতাত্ত্বিকদের সঙ্গে টলস্টয়ের এখানেই বিরোধ—এমনকি ভাববাদী সূক্ষ্ম সৌন্দর্যসচেতন শিল্পতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও। শিল্প টলস্টয়ের নিকট খেয়ালী কল্পনার ফসলও নয়, ভোগের ইন্ধন যোগাবার সামগ্রীও নয়,—শিল্প জীবনকে মহত্তর অভীপ্সার পথে আকর্ষণ করবার একটি শক্তিমান মাধ্যম।

শিল্পী হিসেবে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত সৌন্দর্যের উপাসক। যে সৌন্দর্য স্থূল ভোগবাসনা জাগ্রত করে চিত্তের উত্তেজনা ঘটায় টলস্টয়ের মত রবীন্দ্রনাথও তাকে সৌন্দর্যের মর্যাদা দেননি। রবীন্দ্র-শিল্পতত্ত্বেও সৌন্দর্য মঙ্গলসত্যের সঙ্গে জড়িত। নিজের শিল্প রচনায়ও রবীন্দ্রনাথ সে সৌন্দর্যেরই মাহাত্ম্য ঘোষণা করেছেন—যা মানুষের চিত্তলোকে-

প্রশান্তি আনয়ন করে, জীবনের পঙ্কিল পরিবেশ থেকে মানব-মনকে আনন্দময় ভাবলোকে উত্তীর্ণ করে। টলস্টয় জগতের অন্যতম সৌন্দর্য-স্রষ্টা শিল্পী হয়েও সৌন্দর্যের পরিণামী চিন্তায় যে ধারণা ব্যক্ত করেছেন তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য উপলব্ধির উদারতা এবং ব্যাপ্তি নেই। ফরাসী কালচার-প্রভাবিত ভোগবাদী রুশ সমাজের জীবনবোধের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় তাঁর সৌন্দর্য-উপলব্ধির যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে, তাঁর শিল্পতাত্ত্বিক আলোচনায় তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। তৎকালীন নগর-কেন্দ্রিক জীবন পরিবেশে সৌন্দর্যের নামে উৎকট ভোগলালসার নগ্ন প্রকাশ দেখে সার্বভৌম ধর্মচেতনাকেই তিনি শিল্পসৃষ্টির উৎস হওয়া উচিত বলে ঘোষণা করেন। শুধু তাই নয়, শিল্প-জিজ্ঞাসার অন্তিম পর্যায়ে উপনীত হয়ে শিল্পের বিষয়বস্তু যে মানব জীবনের পক্ষে তাৎপর্যময় এবং মঙ্গল বিধায়ক হওয়া উচিত—এ চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁর মনে কোন দ্বিধা ছিল না।

কালজয়ী শিল্পের অন্যতম লক্ষণ হিসেবে টলস্টয় সংক্রমণ শক্তির ওপর যে গুরুত্ব অর্পণ করেছেন, তার সঙ্গে রবীন্দ্র শিল্পচিন্তার কোন বিরোধ নেই। রবীন্দ্রনাথও টলস্টয়ের মত বিশ্বাস করেন, শিল্পী-চিত্তের অনুভূত ভাববস্তু যে পরিমাণে দেশকালের সীমা-অতিক্রমী হয়, শিল্পসৃষ্টি সে পরিমাণে সার্থক। যেহেতু ধর্মচেতনা-উদ্ভূত শিল্পের আবেদন দেশ এবং কালের গণ্ডীকে অতিক্রম করে সর্বযুগে সর্ব মানবের মনের ওপর সমান প্রভাব বিস্তার করে, সে কারণে টলস্টয়ের মত রবীন্দ্রনাথও এ পর্যায়ের শিল্প রচনার উৎকর্ষ সম্বন্ধে একমত। টলস্টয়ের দৃঢ় প্রত্যয়, সংক্রামকতা গুণ অর্জনের জন্য শিল্পিত বিষয়ের সঙ্গে শিল্পীকে একাত্ম হতে হবে। অর্থাৎ শিল্পী সত্য বলে নিজে যা উপলব্ধি করবেন, নির্দ্বিধায় শিল্পকর্মে তা রূপ দেবেন। শিল্পী অন্তরের অকৃত্রিমতাই (Sincerity) তাঁর সৃষ্ট শিল্পকর্মকে সর্ব-মানবের হৃদয়ের দ্বারে পৌঁছিয়ে দেয়। অপরপক্ষে যে শিল্পকর্ম শিল্পী-অন্তরের অকৃত্রিম উপলব্ধিজাত নয়, বাইরের কোন প্রয়োজনের তাগিদে বা উপস্থিত লোকরঞ্জনের উদ্দেশ্যে রচিত, সে শিল্পের আবেদন একান্তভাবে সাময়িক,

সর্বজনগ্রাহ্য তো নয়ই। শিল্পকে সর্বলোকাশ্রয়ী রূপ দেবার উপায় হিসেবে শিল্পীর আন্তরিক উপলব্ধির প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথও টলস্টয়ের সঙ্গে একমত।

শিল্প-সার্থকতা লাভের উপায় হিসেবে রবীন্দ্রনাথ শিল্পীর কলা-কৌশলের ওপর যে আত্যন্তিক গুরুত্ব অর্পণ করেছেন, টলস্টয় সে বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেন। টলস্টয় মনে করেন, শিল্পকর্মের সংক্রামকতা মুখ্যত নির্ভরশীল শিল্পীর চিন্তার স্বচ্ছতা এবং বিষয়বস্তুর গুরুত্বের ওপর। শিল্পীর শিল্প-ভাবনা যদি অস্বচ্ছ হয়, শিল্পিত বিষয়ের সঙ্গে যদি তাঁর তন্ময়তা না থাকে, ভাববস্তু যদি মৌলিক না হয়, অন্তরস্থ উপলব্ধির তাগিদে যদি তিনি অগ্রসর না হন,—তবে তাঁর শিল্পসৃষ্টির কলাকৌশল যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, তা পাঠক বা দর্শক-অন্তরে সাড়া জাগাতে পারে না।

টলস্টয়ের মতে শিল্প আসলে একটি মানস-প্রক্রিয়া। শিল্পী গভীর অনুভূতির সাহায্যে প্রথমে মানবমনের অস্পষ্ট অনুভূতি এবং চিন্তা-ধারাকে আত্মস্থ করে নেবেন। তারপর সর্বজনবোধ্য ভাষার সাহায্যে সে অস্পষ্ট অনুভূতিকে সুস্পষ্ট করে তুলবেন। টলস্টয়ের নিকট শিল্প-সৃষ্টির পক্ষে মানব-অনুভূতির স্বী-করণ যে পরিমাণে প্রয়োজনীয়, বিষয়ের গুরুত্ব এবং প্রকাশের স্বচ্ছতাও তার চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সার্থক শিল্পসৃষ্টির উপায় হিসেবে অনুভূতির স্বী-করণের প্রাশ্ন রবীন্দ্রনাথ টলস্টয়ের সঙ্গে একমত। কিন্তু শিল্পকর্মে বিষয়বস্তু এবং অভিব্যক্তির প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ টলস্টয় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেন। রবীন্দ্রনাথের মতে শিল্পসৃষ্টির চরম লক্ষ্য রস সৃষ্টি। রস সৃষ্টিতে তথ্যের প্রয়োজন স্বীকৃত হলেও সত্যবোধের সাহায্যে তথ্যকে অনির্বাচনীয় আনন্দলোকে পৌঁছিয়ে দেওয়াই শিল্পের প্রকৃত ভূমিকা। শিল্পীর অলৌকিক প্রতিভা স্পর্শে তথ্য যখন আনন্দলোকের সামগ্রী হয়ে ওঠে, তখনি হয় রসসৃষ্টি। রসবোধের সাহায্যেই শিল্পী আপনাকে প্রকাশ করতে পারেন, এবং সেই অভিব্যক্তির আনন্দ অপর অন্তরে সঞ্চারিত করে নিজেই আনন্দ পান। আনন্দই শিল্পী এবং উপভোক্তাকে এক পরম ঐক্যবোধে জাগ্রত করে। এই অদ্বৈত উপলব্ধির জন্য প্রকাশ-

কৌশলটাই মুখ্য, বিষয়বস্তু উপাদান মাত্র। রসবাদী রবীন্দ্রনাথ তাই নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেন, বিষয়ের গৌরব দর্শনে এবং বিজ্ঞানে—কিন্তু শিল্প সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে যা প্রধানত স্বীকারযোগ্য—সে হল রূপের গৌরব।

অভিনব এবং অকৃত্রিম অনুভূতি শিল্পী-অন্তরে যে আনন্দ সৃষ্টি করে, অভিব্যক্তি সুবলয়িত হলে অপর অন্তরে তা সমানভাবে সঞ্চারিত হয়। এই নৈকট্য ও মিলন ঘটানোইতো সাহিত্যের কাজ—এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথও টলস্টয়ের সঙ্গে একমত। কিন্তু আর্টের ফলশ্রুতি বিষয়ে টলস্টয় রবীন্দ্রনাথ থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। রবীন্দ্রনাথের একান্ত প্রত্যয়, শিল্পের লক্ষ্য আনন্দ সৃষ্টি, আনন্দ দান। সে আনন্দ সৌন্দর্য-সম্ভব। টলস্টয় আনন্দকে শিল্প সৃষ্টির অনন্য লক্ষ্য বলে সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর যুক্তি, আনন্দ তো নানা ভাবেই হতে পারে। নারীর নগ্ন মূর্তি দেখে আনন্দ হয়, ব্যভিচার করেও কেউ আনন্দ পায়। সুতরাং আনন্দ মাত্রই শিল্পসৃষ্টির লক্ষ্য হতে পারে না। সৌন্দর্যকে সরাসরি তিনি প্রত্যাখ্যান করেন নি। সৌন্দর্য বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন আধ্যাত্মিক অনুভূতিজাত সৌন্দর্য—যা মানুষকে মিলিত করে। যে সৌন্দর্য ইন্দ্রিয় চেতনার পরিতৃপ্তি বিধানেই চরিতার্থ, তাকে তিনি সৌন্দর্য বলতে নারাজ। সৌন্দর্য এবং আনন্দানুভূতির ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথের রসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রাধান্য, অপর পক্ষে টলস্টয় সৌন্দর্য এবং আনন্দকে উপলব্ধি করেছেন নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক চেতনার সাহায্যে। শিল্পের লক্ষ্য বিচারে একই যুগের দুই মনীষী শিল্পীর শিল্প-ভাবনা দুই বিপরীত প্রান্তস্পর্শী।

অভিনিবেশ সহকারে বিচার করলে দেখা যায়, সৌন্দর্য এবং আনন্দ বিষয়ে টলস্টয়ের উপলব্ধি অনেকটা প্রাচ্য চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য এবং আনন্দের উপলব্ধি পাশ্চাত্য শিল্পতাত্ত্বিক ক্রোচের উপলব্ধিরই প্রায় সমধর্মী। ক্রোচের মতই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন, শিল্পীর মনোজগতে সুন্দর উদ্‌ভাসিত হয় সুগভীর বোধের আলোকে। এই বোধ শিল্পী-অন্তরে নিবিড় ঐক্য-চেতনা জাগ্রত করে। এই চেতনা প্রভাবেই 'সুন্দর' শিল্পী-অন্তরে ধরা

দেয়। সুন্দরের চেতনা শিল্পী-মনে সৃষ্টি করে আনন্দবোধ। এ ভাবে সৌন্দর্যবোধ আনন্দবোধের সঙ্গে সুন্দর সামঞ্জস্য সূত্রে বিধৃত হয়ে বহির্জগতে রসরূপে পরিণতি লাভ করে। আনন্দ অবশ্য বস্তু-সম্পর্কহীন নয়। যে বস্তুকে আমরা অনুভূতির আলোকে প্রত্যক্ষ করি তা বাস্তবিক পক্ষে সুন্দর। ক্রোচের মত রবীন্দ্রনাথেরও ধারণা, সৌন্দর্য মানুষের অনুভূতি-লোকের ঐক্যের প্রকাশ। যা অসুন্দর, তা বিক্ষিপ্ত। সৌন্দর্য বস্তুনির্ভর হলেও বস্তুগত নয়। সৌন্দর্য শিল্পী অন্তরের গভীরতম উপলব্ধি।

সাহিত্যের সৌন্দর্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণাও টলস্টয় থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্তবর্তী। টলস্টয় মনে করেন, সে সাহিত্যই সুন্দর—সাহিত্যিকের ভাষা এবং ভাবনা যাতে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ, প্রকাশভঙ্গী প্রসাধনহীন সরল অথচ অর্থপূর্ণ। তাঁর মতে পৃথিবীর সব দেশেই প্রাচীন যুগে ধর্মীয় সাহিত্য সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল ভাব, ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গীর সরলতা ও অর্থময়তার জন্য। এ যুগের সাহিত্য যে ব্যতিক্রমী (Exclusive) এবং অবক্ষয়ী (decadent) হয়ে উঠেছে তার অন্যতম কারণ সে সাহিত্যের ভাব, ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গী বহুক্ষেত্রে অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য এবং ভঙ্গীসর্বস্ব। তাঁর সুচিন্তিত মতে সে সাহিত্যই মহৎ বলে স্বীকৃত হওয়া উচিত—যার ভেতর সকলের প্রবেশাধিকার আছে। অস্পষ্টতা এবং দুর্বোধ্যতার জন্য যে সাহিত্য সাধারণ পাঠকের মনে আবেদন সৃষ্টিতে অক্ষম, সে পর্যায়ের সাহিত্যকে টলস্টয় সাহিত্যের মর্যাদা দিতে নারাজ। অপরাপর শিল্পসৃষ্টির মত সংক্রমণশীলতাই যদি সাহিত্যের লক্ষ্য হয়, তবে অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য শিল্প কখনও সে লক্ষ্যে পৌঁছাতে সমর্থ নয়।

সাহিত্যে অস্পষ্টতা বিষয়ে রবীন্দ্র-চিন্তা টলস্টয়ের প্রায় বিপরীত। এ যুগের অনেক সাহিত্যস্রষ্টার মত সাহিত্যে তিনিও অস্পষ্টতার সমর্থক। শুধুমাত্র 'কাব্যে স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা' প্রবন্ধে নয়, তাঁর মননশীল প্রবন্ধ 'Personality'-তে তিনি বলেছেন, স্পষ্টতা যে সত্যের একমাত্র অথবা সব চাইতে উল্লেখযোগ্য দিক, এটা অবশ্য স্বীকার্য নয়। মনীষী এডমণ্ড বার্ক কিংবা শিল্পী-মনীষী জেণ্ডস্না

রেনল্ড্‌স-এর মত তিনিও বিশ্বাস করেন, যে ভাববস্তু সাহিত্যে স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত, তা গভীরতাহীন, ব্যাপ্তিহীন, ছোট মাপের। অপর পক্ষে অস্পষ্টতার মধ্যেই মহৎ ভাবসমূহের অভিব্যক্তির অবকাশ আছে। সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্বে কাব্য-কবিতায় অস্পষ্ট অভিব্যক্তির জন্য রবীন্দ্রনাথকে কত বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা কারো অজানা নয়। এই বিরোধিতা সত্ত্বেও অস্পষ্টতা বিষয়ে তাঁর প্রত্যয়ের দৃঢ়তা শিথিল হয়নি। সাহিত্য জীবনে বৃহত্তর খ্যাতির অধিকারী হবার পরও সাহিত্য সৃষ্টিতে তিনি ক্রমশই অস্পষ্টতা, রূপক এবং সংকেতধর্মিতার দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন। শুধুমাত্র পাশ্চাত্ত্য সংকেতধর্মী সাহিত্যাদর্শ প্রভাবে তিনি সাহিত্য সৃষ্টিতে অস্পষ্টতার আশ্রয় নিয়েছিলেন,—এটা মনে করা ভুল হবে। আন্তরিকভাবে তিনি বিশ্বাস করতেন, অস্পষ্ট শিল্পে মানুষের কল্পনা পাখা মেলবার সুযোগ পায়। মানব মনের অতলস্পর্শী যে ভাবসমূহ স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় না, রূপক এবং সংকেতের অস্পষ্টতায় সেগুলি সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করে।

সাহিত্যে-শিল্পে অস্পষ্টতা বিষয়ে টলস্টয় এবং রবীন্দ্রনাথ—কারো যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করা যায় না। শুধুমাত্র তাঁদের জীবনদৃষ্টি এবং লক্ষ্যের তারতম্যটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। টলস্টয় যেখানে মনে করেছেন, সাহিত্যপাঠক এবং শিল্পরসিক হবে জনগণ, রবীন্দ্রনাথ সেখানে শিল্প-সাহিত্যকে বাহন করে তুলতে চেয়েছেন এমন সমস্ত দুর-ধগম্য অন্তর্নিহিত সত্যের—যার মর্ম গ্রহণে সক্ষম পাঠক জনসাধারণের মধ্যে পাওয়া সহজ নয়। এই পর্যায়ের শিল্প সাহিত্যের মর্ম গ্রহণে সক্ষম একমাত্র পরিশীলিত মনের স্বল্প সংখ্যক নির্বাচিত অনুরাগী ব্যক্তি।

শিল্প-সাহিত্যের লক্ষ্য এবং ফলশ্রুতি সম্পর্কে টলস্টয় এবং রবীন্দ্রনাথ বহু স্থলে ভিন্ন মত পোষণ করলেও শিল্পী এবং সাহিত্যেকের গোষ্ঠীবদ্ধতার বিরুদ্ধে উভয় শিল্প-তাত্ত্বিক খড়্গহস্ত। টলস্টয় মনে করেন, যে শিল্প সমাজের স্বচ্ছল অবসরবিলাসী অভিজাত শ্রেণী-সৃষ্ট, সে শিল্পের আবেদনও সংকীর্ণ 'এলিট' (Elite) শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ ধরনের শিল্পসৃষ্টি যতই মনোরঞ্জক হোক না কেন, সার্বজনীন

আবেদন-সম্পন্ন হতে পারে না। তাঁর মতে যে সাহিত্যের আবেদন সার্বজনীন নয় তার চিরন্তনতার কোন দাবী নেই। টলস্টয় এ ধরনের ব্যতিক্রমী শিল্পকে বলেছেন Exclusive Art। স্ব-যুগের কোন কোন খ্যাতিমান সাহিত্যিকের সৃষ্টিকর্মকে তিনি ব্যতিক্রমী বলে অভিযুক্ত করেছেন, তাঁদের ঢক্কা-নিনাদিত সাহিত্য-শিল্পকে গৌরবহীন বলে ঘোষণা করেছেন। শুধুমাত্র অবসর বিলাসী সাহিত্যিকের ভঙ্গী-প্রধান ব্যতিক্রমী শিল্প সাহিত্যকে তিনি মূল্যহীন বলে ক্ষান্ত হননি, স্বাজাত্যবোধের চেতনা-প্রভাবিত সাহিত্যকেও শিল্পসৃষ্টির মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেছেন। এই অস্বীকৃতির কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, এ পর্যায়ের সাহিত্য সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধতাকে প্রশ্রয় দেয়, শিল্প রসিকের চিত্তকে বৃহত্তর মানবজগতের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারে না। আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের এই বিমর্ষ পরিণতি দেখে টলস্টয়, শিল্পসৃষ্টির মৌল প্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছেন মানুষের চিরন্তন ধর্মবোধকে—যা সর্বশ্রেণীর মানুষকে একটি সামঞ্জস্যময় ঐক্যসূত্রে বিধৃত করে।

শিল্প-সাহিত্য ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ টলস্টয়ের মত শুধুমাত্র আদর্শবাদী জীবন-ধারণাকে প্রাধান্য দেননি, নতুন নতুন শিল্প সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে নিজেকে জড়িত করেছেন—যার অনিবার্য প্রভাবে তাঁর সাহিত্য এবং শিল্পকর্মে বহু মোড় পরিবর্তন ঘটেছে। তথাপি সাহিত্য-শিল্প সম্পর্কীয় ধারণায় তিনি আশ্চর্য মুক্তদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। শিল্প-সাহিত্যের আদর্শ ভাবনায় তিনিও টলস্টয়ের মত গোষ্ঠীবদ্ধতা, ব্যতিক্রমী সাহিত্যের প্রতি আনুগত্য, আঞ্চলিকতা এবং সংকীর্ণ প্রাদেশিকতাবিরোধী। তাঁর মতে শিল্পীমাত্রেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত ব্যক্তিসীমাকে অতিক্রম করে বিশ্বমানবের মধ্যে স্বীয় শিল্পীসত্তাকে প্রসারিত করা। শিল্পীসত্তার এই উদার প্রসারের ফলেই শিল্পকর্ম ধ্রুবত্ব লাভ করে বলেই তাঁর বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের একান্ত প্রত্যয়, ব্যক্তিমানব বিশ্বমানবের মধ্যে নিজেকে ব্যক্ত করবার জন্য, ব্যক্ত সমষ্টির মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করবার জন্য নিরন্তর ভাঙা-গড়ার লীলায় ব্যাপৃত। শিল্প ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ লীলাবাদী।

সাহিত্য শিল্প হিসেবে রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রত্যয় টলস্টয় থেকে

উদার, গভীর, ব্যাপক এবং সদর্থক বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত। রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় মানুষ মাত্রই শিল্পী, মানুষের সামগ্রিক জীবনও শিল্পীরচনা ছাড়া আর কিছু নয়। এই সৃষ্টিকর্মে শিল্পী-মানুষ ব্যক্তি চেতনা থেকে সমষ্টি চেতনায়, ব্যক্তিবোধ থেকে বিশ্ববোধে জাগ্রত হবার চিরন্তন দ্বন্দ্বে নিত্য আলোড়িত।

টলস্টয় মানুষকে দেখেছেন স্বভাব-দুর্বল সত্তা হিসেবে। প্রত্যেক মানুষের ভেতর একটি শিল্পী-সত্তা আছে এবং সে সত্তা চিরন্তন অন্তর্দ্বন্দ্বে আলোড়িত। টলস্টয়ের শিল্প-ভাবনায় সে পরিচয় বেশী মিলেনা। রবীন্দ্রনাথের মত শিল্পভাবনায় তিনি লীলাবাদী নন, প্রত্যক্ষবাদী। তিনি দেখেছেন তাঁর সমকালীন শিল্পী-সাহিত্যিকদের ব্যতিক্রমী সৃষ্টিকর্ম জনসাধারণের মনে আবেদন সৃষ্টিতে অসমর্থ। এই অসামর্থ্যের কারণ, তাঁদের অভিনবত্ব-সন্ধানী শিল্পকর্মের তাৎপর্য অনুশীলন-সাপেক্ষ। আধুনিক শিল্পী আশা করেন, একমাত্র মনোযোগী অনুশীলনের সাহায্যেই পাঠকসাধারণ তাঁদের শিল্পলোকে প্রবেশের অধিকার পাবেন। শিল্পীর এ মনোভাব টলস্টয়ের সমর্থনযোগ্য নয়। তাঁর মতে শিল্প-সাহিত্যে থাকবে এমন স্বচ্ছতা, স্পষ্টতা এবং স্বতঃস্ফূর্ত মানবিক আবেদন যা পাঠক সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম। তাঁর বিশ্বাস আধুনিক শিল্প-সাহিত্য সে সার্বজনীন আবেদহীন। তাঁর বিচারশীল মন আধুনিক শিল্পী-সাহিত্যকের ব্যতিক্রমী মনোভাবের মধ্যে আবিষ্কার করেছে তাদের অহংবোধ, যৌনাসক্তি এবং জীবন সম্পর্কে দুঃসহ ক্লান্তি। এর অনিবার্য পরিণতিতে এসেছে সাহিত্যে বিষণ্ণতার স্বর, বিচ্ছিন্নতাবোধ। সাহিত্যের অন্তর্নিহিত প্রাণধর্ম সজীবতা হারিয়ে হয়ে উঠেছে শুষ্ক, প্রাণহীন। আধুনিক অধিকাংশ শিল্পী সাহিত্যিক সুস্থ জীবনবোধ-বর্জিত, তাঁদের সৃষ্টিও মন-ভোলানো ভঙ্গী-সর্বস্বতায় পর্যবসিত। বহুব্যাপ্ত দেশের জনগণের নিকট শিল্প-সাহিত্য এ কারণে অর্থশূন্য, অবান্তর, অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হচ্ছে। আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের এই অবক্ষয় দেখে টলস্টয় ফিরে যেতে চান সাহিত্য সৃষ্টির আদিযুগে—বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব, আইজাক, জোশেফ এবং জ্যাকবের কাহিনীর জগতে, ইলিয়াড এবং ওডেসির জীবনবোধের

রাজ্যে—যখন জীবন ছিল সুস্থ, প্রাণবন্ত এবং সজীব—যে জীবনবোধ সর্বশ্রেণীর মানুষের মনে সমান আবেদন সৃষ্টি করতো, এবং যে সাহিত্যের আবেদনও ছিল সার্বজনীন ও সর্বকালীন।

রবীন্দ্রনাথও আমাদের রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ কাহিনীর উন্মুক্তপ্রসার বলিষ্ঠ জীবনবোধের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সে সাহিত্যের সার্বজনীন এবং সর্বকালীন আবেদন সম্পর্কেও সচেতন। কিন্তু টলস্টয়ের মত আধুনিক সাহিত্যকে নির্বাসিত করে পৌরাণিক সাহিত্য-জগতে ফিরে যেতে চান নি। আধুনিক জীবন-জটিলতা শিল্প-সাহিত্যকে পূর্বস্বভাব বিচ্যুত করে ব্যতিক্রমী করে তুলেছে,—এ সত্য মেনে নিয়েও রবীন্দ্রনাথ সর্বযুগের বিচিত্র মানুষের প্রকৃত প্রাণের রূপ অনুসন্ধান করেছেন। এর অনিবার্য পরিণতিতে রবীন্দ্রনাথের শিল্প-জিজ্ঞাসায় ফুটে উঠেছে বৈচিত্র্যের মধ্যে এক পরম ঐক্যের সুর। রবীন্দ্র শিল্প-জিজ্ঞাসা তাই আধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত হয়েও চিরকালীন আবেদনসম্পন্ন।

মহৎ শিল্পসৃষ্টির লক্ষণ সম্পর্কে টলস্টয় যে দ্বিধাহীন মত প্রকাশ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়েও একমত হতে পারেননি। টলস্টয়ের মতে সে শিল্পই মহৎ—যার ভেতর সকলের প্রবেশাধিকার আছে, যার বিষয়বস্তু গুরুত্বপূর্ণ, এবং জনগণের নিকট সুবোধ্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে রসবস্তুর নিত্যতা স্বীকার করেও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন, সাহিত্যে রসবস্তুর আস্বাদনের জন্যও মানুষকে সর্বপ্রযত্নে শিক্ষালাভ করতে হয়। একমাত্র রসিক ছাড়া আর কেউ রসবস্তুর সন্ধান পান না। কালিদসের 'মেঘদূত' কাব্যে যে চিরন্তন বিরহ-বেদনার কথা বলা হয়েছে, একমাত্র রসিক ছাড়া আর কেউ তা আস্বাদন করতে অক্ষম।

টলস্টয়ের এখানেই আপত্তি। সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে মেঘদূতের কথা না বললেও এ অভিমত স্পষ্ট ভাষায় তিনি ব্যক্ত করেছেন, যে কাব্য একমাত্র নির্বাচিত ব্যক্তিরা উপভোগ করে থাকেন,—তাকে শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টির পর্যায়ে ফেলা চলে না। সাধারণ পাঠক যদি বাইবেলের কাহিনী, সৃষ্টিতত্ত্ব, রূপকথা এবং লোকগীতি পড়ে বা শুনে

আনন্দ পান, তবে অকৃত্রিম সাহিত্যরস উপলব্ধি করতেও সমর্থ। যে কাব্যের রসবস্তু তাদের অন্তরে সাড়া না জাগায়, তা তাদের উপলব্ধির অসামর্থ্য হেতু নয়, ঐ ধরনের কাব্যবস্তুর ব্যতিক্রমী স্বাদের জন্য। এ কারণে টলস্টয় আশা প্রকাশ করেছেন, ভাবীকালের সৃজনশীল শিল্পী উপন্যাস বা চিত্রশিল্প রচনা অপেক্ষা প্রলুব্ধ হবেন রূপকথা, ঘুমপাড়ানি গান, চিত্তাকর্ষক ধাঁধাঁ প্রভৃতি রচনায়। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে টলস্টয় বলেছেন, এ প্রকরণের লোকসাহিত্য ও সঙ্গীতের আবেদন তৎক্ষণাৎ জনসাধারণের মনে সাড়া জাগায়। শিল্পী-জীবনের প্রথম পর্যায়ে মানব-জীবন এবং মনের রহস্য উদ্‌ঘাটনে অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েও পরিণত চিন্তা এবং অভিজ্ঞতার প্রভাবে তিনি লোক-সাহিত্য এবং লোকসঙ্গীতকে চিরন্তন সাহিত্যের মর্যাদা দিয়েছেন। এ ছাড়া জনগণমনে সহজ আবেদনসঞ্চারী ছোটগল্প রচনা করে তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এটা কখনও অস্বীকার করা যাবে না, লোকসঙ্গীত, লোকসাহিত্য প্রভৃতির আবেদন নিঃসন্দেহে জনচিত্তে তৎক্ষণাৎ সাড়া জাগায়। তাই বলে আধুনিক শিল্প-সাহিত্যে আধুনিক জীবন-জটিলতার রূপায়ণ এবং সমস্যা-সমাধানের ইঙ্গিত থাকবে না,—এমন ধারণা যুগচেতনাকে অস্বীকৃতি জানানো ছাড়া আর কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথও লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত প্রভৃতির সার্বিক আবেদনের কথা স্বীকার করেন। কিন্তু শিল্প-সাহিত্যে আধুনিক জীবন-মনের প্রতিবিম্ব পড়বে এ সত্য স্বীকারে তাঁর মনে কোন দ্বিধা ছিল না। বাঙালীর লোক-সাহিত্যের রসগ্রাহী আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, এ পর্যায়ের সাহিত্যে মধুর এবং কৌতুক রসেরই প্রাধান্য। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের খাদ্য নেই। আধুনিক শিল্প সাহিত্যের প্রকৃতি বিচারে টলস্টয়ের ভাবনা যেখানে একপেশে, রবীন্দ্রনাথ সেখানে আশ্চর্য মুক্তদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।

টলস্টয় সাহিত্যসৃষ্টির ঐকান্তিক প্রেরণা হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেছেন লেখকের অন্তর্নিহিত সন্দেহ নিরসণের প্রয়োজনের ওপর (Author's need to solve an inner doubt)। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসৃষ্টির মূল প্রেরণাকে বলেছেন প্রকাশ-বেদনা। আসলে

শিল্পীর অন্তর্নিহিত সন্দেহ নিরসনের প্রয়াস এবং প্রকাশ বেদনা—উভয়ই সমগোত্রীয়। মানবজীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটনে প্রবৃত্ত হলে শিল্পী-মনে যে নানা প্রশ্ন জাগে, রবীন্দ্রকথিত প্রকাশবেদনাও সে জাতের। বিশ্বজীবন এবং বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে লেখক আত্মীয়তা স্থাপনে সক্ষম একমাত্র বেদনাময় চেতনার সাহায্যে। সে চেতনা যত তীক্ষ্ণ, তীব্র এবং গভীর—বিশ্বজগৎ এবং বিশ্বজীবনের সঙ্গে লেখকের সম্পর্কও তত সত্য এবং তত বাস্তব। সাহিত্য শিল্পের অন্তর্নিহিত ভাবপ্রেরণা আবিষ্কারে টলস্টয় এবং রবীন্দ্রনাথ একই পথের পথিক।

শিল্পী-জীবনে টলস্টয় মানবজীবন-রহস্য এবং সৌন্দর্য নিয়ে অপরূপ রূপসৃষ্টি করেও শিল্পের বৈশিষ্ট্য বিচারে সব চাইতে বেশী গুরুত্ব অর্পণ করতেন উচ্চতর জীবন-নীতি ওপর। যুক্তি প্রয়োগের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন, শিল্পের যে বিষয়বস্তু সকল মানুষের নিকট তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় তা মূলতঃ নীতিধর্মী হতে বাধ্য। যে বিষয়বস্তু সমাজে দুর্নীতির বিষবাষ্প ছড়ায়, তা কখনও তাৎপর্যপূর্ণ বা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হতে পারেনা। আধুনিক যুগে যে শিল্পসৃষ্টি মানুষের মনে ভোগবাসনার ইন্ধন জুগিয়ে জীবনকে কলুষিত করে, তার ভয়াবহ পরিণতি দেখে টলস্টয় শিল্পের অস্তিত্বের বিলুপ্তি কামনা করতেও দ্বিধা করেন নি। তাঁর স্ব-যুগের সমাজের অবক্ষয় দেখে টলস্টয় এত সংস্কারান্ধ হয়ে পড়েছিলেন যে, শেকসপীয়রের অমর প্রেমোপাখ্যান 'রোমিও জুলিয়েট'-এর ভেতর তিনি কুশ্রী যৌন-লিপ্সার গন্ধ পেয়েছিলেন। একমাত্র দায়ুদেয় সঙ্গীত (Songs of David) বা ঐ জাতীয় রচনা তাঁর নিকট সত্যিকারের শিল্প-নিদর্শন মনে হয়েছে। শিল্পভাবনায় নীতির ওপর একান্ত-নির্ভরতা টলস্টয়ের শিল্পাদর্শকে ক্রমশ সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর বৃত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে। যুগে যুগে যে সমস্ত শিল্পকীর্তি মানুষের মনে অনাবিল আনন্দ সৃষ্টি করেছে, টলস্টয়ের কঠোর শিল্পবিচারে সেগুলি শিল্প-পরিধির বাইরে থেকে গেছে। টলস্টয় রোমিও-জুলিয়েটের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনয়ন করেছেন, বাস্তবিক পক্ষে তার বিষয়বস্তুকে কি অশ্লীল, নীতিহীন বলা যায়? যে আত্ম-বিস্মৃত প্রেমানুবেগের জন্য সম্ভাবনাময় দুটি তরুণ-তরুণীর প্রাণ বিসর্জিত

হলো, তা কী অশ্রদ্ধেয়? এ ছাড়া দুটি সুন্দর ভাবোদ্বেল প্রাণের বিসর্জনের ফলে দ্বন্দ্বপরায়ণ দু'টি বংশের মধ্যে যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো তা কি পাঠক-মনকে সংবেদনশীল অনুভূতির রাজ্যে পৌঁছিয়ে দেয় না? যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর শান্তি এলো, তা পাঠ-মনকে শান্তরসে অভিষিক্ত করে—আর্টে যে শান্তরস টলস্টয়েরও আকাঙ্ক্ষিত। তরুণ-তরুণীর প্রেমানুভূতিকে যদি অশ্লীল বলে অগ্রাহ্য করা হয়, তবে দান্তের অমর কাব্য ভিটা নুয়েভাকেও (Vita Nuova) একই দায়ে অভিযুক্ত করতে হয়। কোন শিল্পসচেতন ব্যক্তিই বোধ হয় দান্তের বিরুদ্ধে অশ্লীলতা বা নীতিহীনতার অভিযোগ আনবেন না।

রবীন্দ্রনাথ টলস্টয়ের মত শিল্পে-সাহিত্যে উচ্চতর জীবন-নীতির প্রভাব স্বীকারে দ্বিধা করেন নি। তাই বলে তাঁকে নীতিবাদী শিল্পী-দার্শনিক কখনও বলা চলে না। শিল্পী হিসেবে যেমন, শিল্পতাত্ত্বিক হিসেবেও রবীন্দ্রনাথ সামঞ্জস্যের সাধক। শিল্পসৃষ্টির উপকরণ হিসেবে গ্যেটের মত প্রবৃত্তির উদ্দামতাকে তিনি অস্বীকার করেন নি। কিন্তু শিল্পবিচারে তাকে চরম মূল্য দেননি। শিল্পসৃষ্টিকে আনন্দলোকে পৌঁছিয়ে দেবার উপায় হিসেবে তিনি শিল্পকর্মে কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেছেন। কালিদাসের অমর নাটক এবং কাব্য 'শকুন্তলা' এবং 'কুমারসম্ভব'-এ সামঞ্জস্যময় জীবন-পরিণতির নিদর্শন আছে বলে তিনি সেগুলিকে শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর নিজের সৃষ্টি 'চিত্রাঙ্গদা', 'চোখের বালি', 'নষ্টনীড়' প্রভৃতি একদা নীতিবাগীশ সমালোচক মহলে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিল। এ সমস্ত রচনার রসপরিণাম বিচার করে আজ আর কেউ সেগুলিকে নীতিহীন সৌন্দর্য-সৃষ্টি মনে করেন না।

সাহিত্যে-শিল্পে নীতি-দুর্নীতি বিচারে রবীন্দ্রদৃষ্টি টলস্টয়ের দৃষ্টি থেকে অনেক বেশী উদার। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, কোন শিল্পকর্ম নীতিহীন কিংবা দুর্নীতির সহায়ক কিনা তার বিচার নির্ভরশীল শিল্পীর উদ্দেশ্য এবং শিল্পকর্মের সামগ্রিক তাৎপর্যের ওপর। সফোক্লিস লিখিত রাজা অদিপিউসের কাহিনীর মত অশ্লীল কাহিনী খুব কমই দেখা যায়। অথচ এটি জগতের একটি শ্রেষ্ঠ নাটক বলে স্বীকৃত। কালিদাসের

মেঘদূতে কামার্ত যক্ষের বিলাপের অনেক স্থল আপাতদৃষ্টিতে অশ্লীল। অথচ সহৃদয় পাঠক-অন্তরে সে সমস্ত শ্লোক যে বেদনাবোধ জাগ্রত করে তা তুলনাহীন। রবীন্দ্রনাথ নিজে সুগভীর অনুভূতি-প্রভাবে সে সমস্ত শ্লোকের ভেতর মানুষের চিরন্তন বিরহের বাণী শুনতে পেয়েছেন।

অবকাশ-তত্ত্ব রবীন্দ্র শিল্প-ভাবনায় একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে। অবকাশের মধ্যে শিল্পী-মন প্রয়োজনের দাসত্বমুক্ত হয়ে মুক্তির নিশ্বাস নিতে পারে বলে অবকাশই শিল্পসৃষ্টির সহায়ক—রবীন্দ্রনাথের এ ধারণা প্রত্যয়সিদ্ধ। এ অভিমত অনেকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করায় রবীন্দ্রনাথ অবকাশতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, অবকাশ অর্থ আলস্য নয়। পরিপূর্ণ অবকাশের পরিমণ্ডলে শিল্পী-মন স্বচ্ছন্দবিহারের সুযোগ পায়। অপরপক্ষে আলস্যবিলাসের মধ্যে সে মন নিষ্ক্রিয়, অসাড় হয়ে থাকে। টলস্টয়ও পরশ্রমজীবী আলস্য-বিলাসী সৌখীন শিল্পীদের সম্পূর্ণ দায়ী করেছেন শিল্পের অবক্ষয় ঘটানোর জন্য। এদিক থেকে এই দুই বিশিষ্ট শিল্পতাত্ত্বিকের অভিমত প্রায় অভিন্ন।

মানবচরিত্র সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও সুগভীর জ্ঞান টলস্টয় এবং রবীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্বের মূল ভিত্তি হলেও মানবচরিত্রের ক্রম-পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে টলস্টয় রবীন্দ্রনাথের মত এত বিশ্বাসী নন। যে সংস্কারবর্জিত কৃষক জীবন এবং সাধারণ মানুষের মনকে টলস্টয় শিল্পসৃষ্টির অন্যতম উপাদান বলে চিহ্নিত করেছেন, সে জীবন এবং মনও যে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, সে বিষয়ে টলস্টয় ভেবে দেখেন নি। গ্রামের কৃষক এবং সাধারণ জনসমষ্টির ভালো লাগাটাই যে উৎকৃষ্ট শিল্পবিচারের মাপকাঠি, টলস্টয়ের এ অভিমত সর্বাংশে মেনে নেওয়াও যায় না। শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত নাগরিক জীবনের সংগ্রাম, হতাশা এবং ব্যর্থতার শৈল্পিক রূপও যে আধুনিক সাহিত্যকে বিশিষ্ট মূল্যে মূল্যবান করে তুলেছে, সে বিষয়েও টলস্টয় নীরব। রবীন্দ্রসাহিত্যে আধুনিক শিক্ষিত জীবনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং করুণ ব্যর্থতা প্রাধান্য না পেলেও সে জীবনের ট্র্যাজেডি যে এ যুগের সাহিত্যের উপাদান হওয়া উচিত—এ বিষয়ে রবীন্দ্র-শিল্পী-মনে কোন দ্বিধা ছিল না।

প্রকৃত আর্টের লক্ষ্য মানবজীবন এবং সভ্যতাকে পরিপূর্ণ প্রগতির দিকে এগিয়ে নেওয়া—এ বিষয়ে মহান শিল্পতাত্ত্বিক টলস্টয় এবং রবীন্দ্রনাথ একমত। সজীব সমাজ দুর্মর প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত বলে সে সমাজের মানুষও দুর্বার প্রাণশক্তির অধিকারী। যে শিল্পকর্মে সে দুর্জয় প্রাণশক্তি অভিব্যক্ত, যুগে যুগে সে পর্যায়ের শিল্প মূল্যসমৃদ্ধ বিবেচিত হয়েছে। যে শিল্প গতিহীন অতীতকে আঁকড়ে থাকতে চায়, তার অবক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। টলস্টয় এবং রবীন্দ্রনাথ—উভয় শিল্প-তাত্ত্বিকের একান্ত প্রত্যয়, ভাবীকালের শিল্পী তাঁদের তাৎপর্যপূর্ণ শিল্পকর্মে সে প্রবল গতিশীল সমাজমনকে শিল্পসুন্দর অভিব্যক্তি দিয়ে মানবজীবন এবং সভ্যতাকে পূর্ণতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

টলস্টয় ঃ ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা

টলস্টয়ের ব্যক্তিত্বে এবং প্রতিভায় ছিলো এমন একটা অম্লান দীপ্তি যা স্ব-দেশ এবং স্ব-কালের সীমা অতিক্রম করে আজও বিশ্ব-বিবেককে শুভ বুদ্ধির জগতে জাগ্রত করে। সে মহিমার স্বরূপ উপলব্ধির জন্য তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অন্তর্লোকে প্রবেশের প্রয়োজন।

দীর্ঘজীবনে টলস্টয় যে সমস্ত মননশীল এবং খ্যাতিমান ব্যক্তি-সম্পর্কে এসেছিলেন তাঁরা সকলেই স্বীকার করেছেন, তাঁর ব্যক্তিত্বে ছিল দুই প্রবল বিপরীতমুখী প্রবণতা—যা তাঁকে লালসাপঙ্কিল জীবন থেকে ঋষিত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেছিল। টলস্টয়ের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বিখ্যাত কথাশিল্পী টুর্গেনিভ যৌবনে তাঁর মদ্যাসক্ত উচ্ছৃঙ্খল অবসর-বিলাসী জীবন দেখে তাঁকে 'গুহামানব' বলতেও দ্বিধা করেন নি। অপর পক্ষে পরিণত বয়সে তাঁর মোহমুক্ত, সমুচ্চ নীতিবাদী, অকৃত্রিম মানবতাবাদী এবং জ্যোতির্ময় অধ্যাত্মবাদী ব্যক্তিত্ব প্রভায়-অভিভূত ভক্তরা তাঁকে নব-আবির্ভূত পয়গম্বর রূপে পূজো করতেও দ্বিধা করেন নি। বিপরীতমুখী প্রবণতা এবং মানসিক দ্বন্দ্ব ছাত্রজীবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে জটিল জীবনের আবর্তে নিক্ষেপ করে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করেছে, জীবন সম্বন্ধে নতুন নতুন জিজ্ঞাসা জাগ্রত করেছে। কোন সময় সমাধানহীন জীবন-সংকটে পতিত হয়ে মৃত্যু চিন্তায় তিনি বিব্রত হয়েছেন, আবার কোন সময় সুদূর-লগ্ন স্বপ্নিল আশার আলো তাঁকে উদ্দীপিত করেছে। পরিবার-পরিজনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানকেই তিনি কোন সময় জীবনের পরম কাম্যবস্তু বলে মনে করেছেন, আবার অন্য সময় শোষিত নিপীড়িত মানুষের সেবায় আত্মোৎসর্গকেই মানুষের পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু রূপে উপলব্ধি করেছেন। গভীর মানব-প্রত্যয়ই শেষ পর্যন্ত তাঁর ভাবান্দোলিত আত্মাকে জাগ্রত করেছে ঈশ্বর-প্রত্যয়ের অবিক্ষুব্ধ চেতনালোকে। দৃঢ়ভিত্তিক ধ্রুব অধ্যাত্ম-চেতনাই তাঁর

অন্তরে সঞ্চার করেছে পৃথিবী ব্যাপী নিপীড়িত বঞ্চিত শোষিত মানুষ মাত্রেরই প্রতি সবল সক্রিয় প্রেম ও ভালোবাসা। এই কর্মপরিণত মানবপ্রেমই তাঁর ব্যক্তিত্বে এনে দিয়েছিল ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা যা তাঁর মনে সমকালীন রাজানুগ্রহপুষ্ট ধর্মসংঘের ভণ্ডামির ফতোয়া এবং স্বৈরতন্ত্রী সম্রাটের মানবতাবিরোধী নির্দেশ না মানার অভূতপূর্ব সাহস সঞ্চার করেছিল। তাঁর সত্যান্বেষী অকুতোভয় মানবপ্রেমিক ব্যক্তিত্ব এত প্রবল ছিল যে, স্বৈরতন্ত্রী জার সম্রাটেরা তাঁর রাষ্ট্র এবং ধর্মসংঘবিরোধী প্রচার কার্যে বাধার সৃষ্টি করলেও তাঁকে শৃঙ্খলিত করতে বা তাঁর ওপর শারীরিক নির্যাতন চালাতে সাহসী হন নি।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে রাশিয়ার সর্বোচ্চ ধর্মসংঘ-প্রেরিত যাজকেরা তাঁকে প্রচলিত খ্রীষ্টীয় রীতি অনুযায়ী অনুতাপ করার পরামর্শ দিলেও তিনি সে প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অথচ রাষ্ট্র-স্বীকৃত সর্বোচ্চ ধর্মসংঘ সিনদ থেকে বহিষ্কৃত তথাকথিত এই নাস্তিক মানুষটি জগদ্ব্যাপী সাহিত্যখ্যাতির শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হবার পর প্রিয় সাহিত্যকর্ম সাময়িক ভাবে স্থগিত রেখে মহামানব যীশু-প্রচারিত সত্যধর্মের সারবস্তু উদ্ধারের জন্য যে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন, তার তুলনা আধুনিক কালে দুর্লভ। বিপুল খ্যাতি এবং অর্থ উপার্জনের সহজ পথ ত্যাগ করে খ্রীস্টধর্মের সারসত্য নির্ণয়ে আত্মমগ্নতার জন্য প্রিয়তমা স্ত্রীই শুধু তাঁকে নিত্য গঞ্জনা দেন নি, সাহিত্যিক বন্ধু এবং প্রতিভামুগ্ধ পাঠকেরাও তাঁকে সৃজনধর্মী সাহিত্যকর্মে প্রত্যাবর্তনের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু সত্যান্বেষীর পথ থেকে কেউ তাঁকে বিচ্যুত করতে পারেন নি। জীবনের শেষ পর্যায়ে সৃজনধর্মী সাহিত্যকর্মে প্রত্যাবর্তন করলেও দেখা গেল, সাহিত্যের লক্ষ্য এবং আদর্শ সম্পর্কে তাঁর ধারণাই শুধু পরিবর্তিত হয়নি, অন্তিম পর্যায়ে রচিত তাঁর সাহিত্যের রচনাশৈলী এবং ভাববস্তুরও দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন ঘটেছে। যৌবনে এবং প্রৌঢ়ত্বে রচিত বিশ্বনন্দিত সাহিত্যকৃতি তাঁর নিকট অবসরবিলাসীদের উপভোগের জন্য রচিত মূল্যহীন সাহিত্যকর্ম বলে বিবেচিত হয়েছে। সে সাহিত্যই তাঁর নিকট শ্রেষ্ঠ সাহিত্যএবং শিল্পকর্ম বলে মনে হয়েছে—যার আবেদন

সর্বব্যাপক, যা সর্বজনবোধগম্য সহজ সরল ভাষায় রচিত, যা সর্বমানবের মধ্যে ভ্রাতৃত্বএবং মিলনের অনুভূতি জাগ্রত করে—অর্থাৎ যে সাহিত্য নির্ভেজাল খ্রীষ্টীয় ধর্মের মহত্তম চেতনা-উদ্ভূত। বস্তুতপক্ষে এই মহনে সৃজনধর্মী শিল্পীর প্রথম পর্যায়ের সাহিত্যসৃষ্টি মানবজীবন ও মনের সূক্ষ্মতম রহস্য-সন্ধানী উচ্চস্তরের শিল্পকর্ম বলে সর্বজন-স্বীকৃত হলেও তাঁর শেষ পর্যায়ের সাহিত্য সৃষ্টিতে সর্বমানবের আকাঙ্ক্ষিত শ্রেয়োবোধের যে অর্থপূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটেছে তার তুলনা বিশ্বসাহিত্যে বিরল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রীধারী না হলেও অদম্য পাঠস্পৃহা টলস্টয়কে সমকালীন পৃথিবীতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কিন্তু বহুবিস্তৃত জ্ঞানের সঞ্চয়ও তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্যতম পরিচয় নয়। যে অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণ তাঁর চিত্তবৃত্তিকে অহং-চেতনা-বিমুক্ত করে বিশ্বব্যাপকতা দান করেছিল—তা হল তাঁর সহজাত সারল্য, পরদুঃখকাতরতা, সার্বজনীন সহানুভূতি, মানবমাহাত্ম্যের প্রতি আবেগময় শ্রদ্ধাবোধ, প্রবৃত্তিতাড়িত জীবনে অনুষ্ঠিত পাপকর্মের প্রতিক্রিয়ায় অনুশোচনা এবং তীব্র জ্বালাবোধ। কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠকালীন অপরিণত বয়সে পতিতা নারীর সঙ্গে যৌনক্রিয়া সাঙ্গ করার পর খাটের নীচে বসে পড়ে তিনি কান্নায় বুক ভাসান, যৌবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ হবার পূর্বেই নিজ জমিদারীতে গিয়ে দরিদ্র প্রজাদের পড়াশোনার দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে স্বেচ্ছায় বহন করতে গিয়ে বহু অর্থ তিনি ব্যয় করেন। আবার এই আদর্শবাদী জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে প্রবৃত্তিতাড়িত জীবনের চরম স্বেচ্ছাচার। যৌবনোদ্ধত দরিদ্র কৃষক-বধূর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কে লিপ্ত হতে তাঁর বাধেনা, মহানগরী মস্কোয় গিয়ে জমিদারীর পয়সায় মদ, মেয়েমানুষ এবং জুয়ার নেশায় উন্মত্ত হয়ে ঋণ করেও ফ্যাসানবিলাসী অভিজাত জীবন-যাপন করে আত্মগর্বে স্ফীত হন। আবার পরমুহূর্তে পাপবোধে জর্জরিত হয়ে সমস্ত পাপকর্মকে পরম বিশ্বস্ততায় নিজ ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করে স্বস্তিলাভ করেন। গ্রামের জমিদারীতে এবং মহানগরীতে অনুষ্ঠিত সে উচ্ছৃঙ্খল দেহাসক্তির বাস্তব বৃত্তান্ত শুধুমাত্র

নিজ স্বীকারোক্তিতে (My confession) অকপটে বিবৃত করেই প্রায়শ্চিত্ত করেন না,—যে নিষ্পাপ কুমারীকে বিবাহ করবেন বলে স্থির করেন, বিবাহের পূর্বে তাঁর হাতে নিজের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ডায়েরিটিও তুলে দিতে দ্বিধা করেন না। প্রবৃত্তিতাড়িত জীবনেও পাশ্চাত্যের অধুনিক জীবনচিন্তা এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার আকাঙ্ক্ষায় একাধিকার তিনি পাশ্চাত্য দেশের বহুস্থানে পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু সহজাত পরদুঃখকাতর হৃদয়বৃত্তির প্রভাবে আভিজাত্য-লালিত আত্মকেন্দ্রিক মনুষ্যত্ববর্জিত নিষ্ঠুর পাশ্চাত্য সভতার প্রতি চরম বিতৃষ্ণা এবং বীতশ্রদ্ধার অনুভূতি নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

বিবাহিত জীবনে সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী পরিশীলিতমনা স্ত্রীর সান্নিধ্যে টলস্টয়ের অসংযত উদ্দাম অসামাজিক জীবনের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসায় শান্তিময় গৃহপরিবেশে তাঁর সৃজনধর্মী প্রতিভার অনন্যসাধারণ বিকাশ ঘটলো। তাঁর জীবনধর্মী উচ্চমানের গল্প-উপন্যাস-নাটক বিশ্বব্যাপী ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করায় বিপুল অর্থ ঘরে আসতে লাগলো। তার সঙ্গে ক্রম বর্ধমান জমিদারীর ও কৃষি উৎপাদনের আয় যুক্ত হওয়ায় রাশিয়ার অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত হলেন টলস্টয়। লক্ষ্মী সরস্বতীর প্রসাদপুষ্ট এই সুখী জীবনে টলস্টয়ের ব্যক্তিসত্তার দ্বৈতরূপ খুবই স্পষ্ট। সারাটা দিন অভিনব সৃষ্টিকর্মে ব্যাপৃত শিল্পী আত্মবিস্মৃত, সংসারের সমস্ত দায় দায়িত্ব স্ত্রীর স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে নিজে সংসারবিবিক্ত কৃচ্ছ্রতপা তপস্বী,—আর রাত্রিবেলায় নারীদেহলোলুপ অদম্য প্রভুত্বকামী স্বামী, প্রকৃতির প্রচণ্ড বেগ দমনে অসমর্থ মোহান্ধ এক দুর্বল পুরুষ। ভোগোন্মত্ত বলিষ্ঠ স্বামীর সমস্ত অত্যাচার স্ত্রীকে দীর্ঘকাল সহ্য করতে হয়েছে. প্রায় প্রতি বৎসর একটি করে সন্তান উপহার দিতে দিতে তাঁকে তেরোটি সন্তানের জন্ম দিতে হয়েছে, সদ্য প্রসূতি অবস্থায়ও তাঁকে বলাৎকার করতে দ্বিধা করেন নি টলস্টয়। যৌন জীবনে এ আতিশয্যের জন্য স্ত্রী যদি টলস্টয়ের প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়েও অবচেতন মনে ঘৃণার ভাব পোষণ করতে থাকেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সূতিকাগৃহে

বলাৎকারের ফলে স্ত্রী জটিল স্ত্রীরোগে আক্রান্ত হলে সহজ প্রাণ-চেতনার স্থির মুহূর্তে টলস্টয় নিজেকে এক 'নারকীয় স্বার্থপর পশু' বলে ধিক্কৃত করেন, আবার কোন সময় মোহময়ী নারী তাঁর দুর্দমনীয় কামনায় ইন্ধন জুগিয়েছেন বলে তাকে দোষারূপ করেন। একদিকে স্বামীর যৌন প্রবৃত্তির আতিশয্যে উত্ত্যক্ত, আর একদিকে স্বামীর পূর্ব প্রণয়িনী স্বাস্থ্যোজ্জ্বলা কৃষক-পত্নী এবং তার গর্ভে স্বামীর ঔরসজাত সন্তানকে দেখে ঈর্ষার তীব্র জ্বালা,—সুন্দরী স্ত্রী সোনিয়ার দাম্পত্য জীবনে সমস্ত সুখস্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দিলো। বস্তুতপক্ষে পরবর্তীকালে টলস্টয়ের দাম্পত্য জীবনে যে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠেছিলো, তার জন্য টলস্টয়ের নারী দেহলোলুপ অসংযত প্রবৃত্তির বেগ কম দায়ী নয়। নারীদেহ সম্ভোগ-প্রবণতা অব্যাহত ছিলো টলস্টয়ের জীবনের প্রায় সত্তর বৎসর পর্যন্ত।

কিন্তু এই ভোগপ্রবৃত্তি টলস্টয়-ব্যক্তিত্বের একমাত্র পরিচয় নয়। উন্মত্ত ভোগপ্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে এ অদ্ভুত আবেগপ্রবণ মানুষটির মনে জেগে উঠেছিলো সর্বস্বত্যাগের এক দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা—যে আকাঙ্ক্ষা তাঁর ব্যক্তিত্বের উত্তুঙ্গ মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো বিশ্বব্যাপী। কিভাবে ভোগের নেশায় উন্মত্ত এ মানুষটির মনে সর্ব-ত্যাগের দুর্বার কামনা জন্ম নিলো, রাষ্ট্রলালিত ধর্মসংঘের এবং অত্যাচারী শোষক জমিদারদের বিরুদ্ধে তাঁর অন্তরে তীব্র ঘৃণা ও আপোসহীন মনোভাবের সৃষ্টি হলো এবং কিভাবে কৃষক-শ্রমিকদের জীবনের সর্বপ্রকার বন্ধন মোচন করে মানবাধিকার আদায়ের জন্য অমিতবিক্রমে সর্বপ্রকার কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে তিনি আপসহীন যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন,— তার কোন যুক্তিসঙ্গত সদুত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হয় নির্যাতিত মানবতার প্রতি তাঁর অন্ধ আবেগতাড়িত ভালোবাসা কোনো প্রাক্তন সংস্কারজাত। না হলে সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশের নবীন যুবক বিদেশ ভ্রমণের সময় যখন প্যারিসে সাময়িকভাবে একটি অভিজাত হোটেলে বাস করছিলেন, তখন বেহালাবাদনরত একজন দীন ভিক্ষুকের প্রতি হোটেলবাসী উন্নাসিক অধিবাসীদের উপেক্ষা এবং নির্মম ব্যবহারের প্রতিবাদে সে ভিক্ষুককে হোটেলের অভ্যন্তরে ডেকে একত্রে পানাহার

করে তাকে সমপর্যায়ের মানুষের মর্যাদা দেবেন কেন, কিংবা গিলোটিনে মানুষ হত্যার মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখে বিদীর্ণ হৃদয়ে সে দেশেই বা পরিত্যাগ করবেন কেন? ইয়াস্নায়ায় সমৃদ্ধ জমিদার জীবনে সপ্তাহান্তে একদিন দরিদ্র নিরন্নদের মধ্যে অর্থসাহায্য বিতরণকে ধনাঢ্য ব্যক্তির আত্মতৃপ্তির একটি বহিলক্ষণ মনে করা গেলেও বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত বন্দিত লেখক যখন নিজের গুরুত্বপূর্ণ লেখনীকর্ম ছেড়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত আর্তের সেবায় সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট স্বেচ্ছায় বরণ করে নেন, কিংবা মস্কোনগরীর উপান্তে বস্তিবাসী কারখানা শ্রমিকদের চরম দারিদ্র্যখিন্ন নোংরা জীবন দেখে ধনী মালিকদের হৃদয়হীন স্বার্থপরতায় ক্ষোভে দুঃখে মর্মাহত হন,—তখন সে বেদনার উৎসে যে তাঁর প্রাক্তন সংস্কার-প্রভাবিত পরদুঃখ-বিগলিত দয়ার্দ্র অন্তর ছিলো—সেটা মেনে নিতে কোন অসুবিধা হয় না। দরিদ্র কৃষকদের প্রতি পরশ্রমজীবী জমিদারদের অন্যায় ব্যবহার এবং নির্মম শোষণ যে মনুষ্যত্ববিরোধী বর্বর পাশবিক কাজ ব্যক্তিত্ব বিকাশের বহু পূর্বেই প্রথম যৌবনেই তিনি তা উপলব্ধি করেছিলেন। দেহাশ্রিত প্রবৃত্তির স্রোতে যখন তিনি ভেসে চলেছিলেন, তখনও তিনি তাঁর জমির মালিকানা কৃষকদের ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন,—যদিও কৃষকেরা তাঁর এই মালিকানা হস্তান্তরের উদার প্রস্তাবকে অভিসন্ধি-প্রসূত জমিদারী চাল বলে গ্রহণ করেনি। উত্তরজীবনে অপরের শ্রমে জীবন নির্বাহ এবং পরিবার প্রতিপালনকে নীতিবিরুদ্ধ এবং ধর্মবিরুদ্ধ কাজ অনুভব করে তিনি যখন শ্রমজীবী কৃষকদের মধ্যে জমিদারী বিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তখন এই সাধু প্রয়াসে সব চাইতে বেশী বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তিনি তাঁর স্ত্রী-পুত্র এবং পরিজনদের কাছ থেকে। টলস্টয় নীতিবাদী এবং মানবতাবাদী মনীষী হলেও বিপ্লবী ছিলেন না। তবু জমিদারী প্রথা যে ন্যায়নীতি-বিরোধী আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতার ওপর প্রতিষ্ঠিত—এ সত্য অন্তর দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। কৃষকেরা নিজের অধিকার সম্বন্ধে আত্মসচেতন হলে তাঁর স্বদেশে জমিদারী প্রথা শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে—এ দেওয়ালের লেখন স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে টলস্টয়ের মৃত্যুর মাত্র সাত বৎসর পরেই রাশিয়ায় যে কৃষক-বিপ্লব সংঘটিত হয়,

তার অন্যতম লক্ষ্য ছিলো জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। জমির ওপর কৃষকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার সম্পর্কে এই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানবতাবাদী মনীষীর ক্রমান্বয়ী সংগ্রাম ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের রুশ বিপ্লবের যে ভিত্তিভূমি রচনা করেছিলো—এ কথা সে সার্থক বিপ্লবের বলিষ্ঠ নেতা লেনিনও স্বীকার করেছেন।

সৃজনধর্মী সাহিত্যকর্মের সাহায্যে বিশ্বব্যাপী খ্যাতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করার পর মনীষী টলস্টয় মূল বাইবেলোক্ত প্রকৃত খ্রীস্টধর্মের স্বরূপ সন্ধান, স্বৈরতন্ত্রী জার সম্রাটের অত্যাচারী শাসন এবং শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ এবং রাজানুগ্রহপুষ্ট ধর্মের মুখোসধারী অর্থোডক্স চার্চ কর্তৃক সম্রাটের সকল কাজের সমর্থনের বিরুদ্ধে যে নির্ভীক এবং বিরামহীন অভিযান চালনা করেন,—তা নিঃসন্দেহে তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বিকাশের অভ্রান্ত স্বাক্ষর। জারের মানবতাবিরোধী অপশাসনের বিরুদ্ধে তাঁর সাহসী প্রতিবাদ রাশিয়ার শোষিত, উৎপীড়িত এবং বঞ্চিত জনগণকে যে স্বাধিকার অর্জনের জন্য বিপ্লবের দিকে ঠেলে দিয়েছিলো—তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে ভাবীকালের সমাজ-বিপ্লবীদের মতো টলস্টয় ধর্মকে আফিমের নেশার সঙ্গে তুলনা করে বর্জন করেন নি। অক্লান্ত পরিশ্রম, ব্যাপক অধ্যয়ন, এবং গভীর গবেষণার সাহায্যে মহামানব যীশু-নির্দেশিত মূল খ্রীস্টধর্মের সারবস্তু উদ্ধার করে তিনি তাঁর মানবিক সাম্যচেতনাকে উদার ধর্মভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর ধর্মমূলক প্রচার পুস্তিকাগুলিতে তিনি বলতে চেয়েছেন, বাইবেলোক্ত মানব-ধর্মনীতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হলে তবেই স্বভাবত স্বার্থান্ধ মানুষের মন থেকে হিংসা দ্বেষ লোপ পাবে, ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি এবং সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পাবে এবং এই উদার চেতনার সাহায্যে মানুষ পরম আকাঙ্ক্ষিত সাম্যবাদী সমাজ গঠনে সমর্থ হবে। শুধুমাত্র ধর্মমূলক প্রচার পুস্তিকায় নয়, পরিণত সাহিত্য স্রষ্টার জীবনে শিল্পতত্ত্ব আলোচনায়ও সাহিত্য-শিল্পকে তিনি অসূয়াহীন ভ্রাতৃভাবের উদ্বোধক অকৃত্রিম খ্রীস্টীয় ধর্মাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠা দিতে উৎসুক হয়েছিলেন, এবং নিজেও শেষ পর্যায়ের কোন কোন গল্প-উপন্যাসে খাঁটি খ্রীস্টীয়

ধর্মাদর্শকে অনবদ্য শিল্পরূপ দিয়েছিলেন। শুধুমাত্র প্রচারমূলক পুস্তিকায়, শিল্পতত্ত্বে বা সাহিত্যে নয়, উত্তরজীবনে সমস্ত ভোগবিলাস, পরশ্রমে অর্জিত সম্পত্তির মোহ পরিত্যাগ এবং শ্রমজীবী জনগণের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে মিশিয়ে দেবার পরম লক্ষ্য নিয়ে তিনি যে মুক্ত জীবন এবং সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন—তা তাঁর স্ত্রীপুত্র-পরিজনদের নিকট যতই অবাঞ্ছিত মনে হোক না কেন, সর্বযুগের মানুষের নিকট তাঁকে ঋষিত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। খ্রীস্টীয় ধর্মনীতিনির্ভর জনগণ-প্রীতিই যে তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সজীব প্রেরণা হিসেবে কার্যকরী হয়েছিল, তাঁর মধ্য জীবনের মননশীল রচনা এবং উত্তর জীবনের প্রচার-পুস্তিকা ও সৃজনশীল রচনা তার অসংশয়িত প্রমাণ।

টলস্টয়ের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের মূলে তাঁর অতৃপ্ত জীবন-জিজ্ঞাসা। এক জায়গায় তিনি বলেছেন, যারা জীবনকে শুধু অশ্রুপূর্ণ বিষাদ ভারাক্রান্ত মনে করেন, সেটা যেমন সত্য নয়, তেমনি অধিকাংশ লোক যৌবন, সুস্বাস্থ্য এবং বিত্তসম্পত্তির মালিক হলে জীবনকে যেমন উপভোগের সামগ্রী মনে করে,—তাও তেমনি মিথ্যা। তা হলে জীবন কী? এ প্রশ্নের উত্তরে জীবন-রহস্যমুগ্ধ টলস্টয় প্রজ্ঞার অধিকারী Emerson-এর মতই বলতে পারতেন,—'Life is a series of surprises. We do not guess to-day the mood, the pleasure the power of to-morrow, when we are building up our being' (অর্থাৎ জীবনটা হলো কতগুলো চমকের পরম্পরা। ব্যক্তিসত্তা গড়ার কাজে আজ আমরা যখন ব্যাপৃত, আগামী দিনে সে সত্তার প্রবণতা, আনন্দ এবং শক্তি কি হবে আমরা তা অনুমান করতে পারিনা)। টলস্টয়ের ব্যক্তিত্ব বিকাশেও এই অভাবিত চমক-পরম্পরা দেখে আমরা বিস্মিত হই। যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল জীবন-বিলাসী টলস্টয় উত্তর জীবনে Liddon-এর মতই অনুভব করেছিলেন—'Life is beutiful in the ratio in which it is laid out in noble action or patient perseverance (অর্থাৎ, জীবনটা সে পরিমাণেই সুন্দর যে পরিমাণে তা

মহান কর্মে বা সহিষ্ণু ধৈর্যশীল প্রয়াসে নিয়োজিত)। গ্যেটের মতই টলস্টয়েরও জীবন সম্পর্কে ধারণা হল—'Life is a quarry, out of which we are to mould and chisel and complete a character' (অর্থাৎ, জীবন হল একটি জিজ্ঞাসা যার থেকে আমাদের বাটালি দিয়ে কুঁদে গড়ে নিতে হবে সম্পূর্ণাঙ্গ একটি চরিত্র)। Bailey-র মত টলস্টয়েরও ধারণা,—'He most lives who thinks most, feels the noblest, acts the best' (যে ব্যক্তি ভাবেন বেশী, মহত্তমের অনুভূতি যাঁর হৃদয়ে এবং যাঁর কর্মধারা সর্বোত্তম তার জীবন-যাপনই সর্বাধিক ফলপ্রসূ। ভূয়োদর্শী সেনেকার (Seneca) মত টলস্টয়েরও বিশ্বাস ছিলো,—'No man enjoys the true taste of life but he who is ready and willing to quit it' (যে ব্যক্তি ত্যাগের জন্য প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক, তিনি ছাড়া আর কেউ জীবনের প্রকৃত স্বাদ উপভোগ করতে পারে না)। জীবনের অর্থসন্ধানী Staniclaus-এর ধারণা ছিল,—'To make good use of life, one should have in youth the experience of advanced years and in old age the vigour of youth.' —(জীবনের সদ্ব্যবহারের জন্য যৌবনে প্রয়োজন বয়োবৃদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং বার্ধক্যে যৌবনের উদ্যম)। টলস্টয়ের যৌবনে এবং বার্ধক্যে এ সব সদ্‌গুণের সমাবেশ ঘটেছিল বলে তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বে এসেছিল ঋজুকঠিন দৃঢ়তা এবং জ্ঞানবৃদ্ধের পরিপূর্ণতা। মননশীল Rivarol মানুষের জীবনাচরণের তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছিলেন: 'Man spends his life in reasoning on the past, complaining on the present and trembling for the future.'। টলস্টয়ের দীর্ঘজীবনেও দেখি, বিগতকালের সত্য আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে প্রাজ্ঞ যুক্তিতর্কের অবতারণা, তাঁর স্ব-কালের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এবং ভবিষ্যতের ভাবনায় বেপথু হৃদয়াবেগ।

বিভিন্ন কালের উক্ত পাশ্চাত্য জীবন ভাবুক মনীষীদের সুভাষিতের আলোকে টলস্টয়ের উন্নতশীর্ষ চরিত্র এবং ব্যক্তিত্বের একটা ধারণা করতে পারি। সে পরিচয় উজ্জ্বল রেখায় আরও দীপ্যমান

হয়ে ওঠে তাঁর সমকালীন এবং পরবর্তী কালের পাশ্চাত্য মনীষীদের মূল্যায়নে। রম্যাঁ রলাঁ বলেছেন,—'এক সময় সমগ্র য়োরোপের নাড়ি ধরে টান দিয়েছেন তল্‌স্তোয়। সমগ্র য়োরোপে এক যোগে প্রতিধ্বনিত হয়েছে এমন আর একটিও কণ্ঠস্বর নেই।' তিনি আরও বলেছেন,—'আজকের দিনের সমালোচকদের মতো আমরা বলিনাঃ দুজন তল্‌স্তোয় ছিলেন,--সংকটের আগের তল্‌স্তোয় এবং সংকট-পরবর্তী তল্‌স্তোয় একজন ছিলেন শিল্পী, অন্যজন মোটেই শিল্পী নন। আমাদের কাছে তল্‌স্তোয় একজনই ছিলেন, এবং তার পুরোটাকেই আমরা ভালোবেসেছিলাম। অনুভূতি দিয়ে আমরা বুঝেছিলাম, এ ধরনের বিশাল হৃদয়ে সব কিছুই একীভূত হয়ে যায়, আবার সব কিছুর জন্যই নির্ধারিত থাকে অবিচ্ছেদ্য স্থান।' [মূল ফরাসীর ইংরেজী অনুবাদের অনুবাদ করেছেন আবু করিম]। The Russian Point of View-তে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ বলেছেন,—'এই একজন মানুষ, যিনি বন্য নন, প্রকৃতির সন্তানও নন, তিনি শিক্ষিত, সমস্ত রকম অভিজ্ঞতাই রয়েছে তাঁর। তিনি সেই সব অভিজাতদের মধ্যে একজন—যাঁরা নিজেদের স্বরূপের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে গেছেন। তিনি গেঁয়ো নন, তিনি মেট্রোপলিটন, তাঁর চেতনা ও বুদ্ধি অত্যন্ত সুক্ষম, শক্তিশালী এবং সুচর্চিত।......কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে হারিয়ে যায় না কিছুই।' [অনুবাদ, ফারুক মেহেদী)। টোমাস মান তাঁর শিল্পী-ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, 'তল্‌স্তোয় নিজে শৈল্পিক ধর্মের জন্য কোনোরূপ সচেষ্ট থাকেন না, যখন তিনি শিল্পের বিরুদ্ধে সশস্ত্র রুখে দাঁড়ান, আর প্রত্যাখ্যান করেন শিল্পকে, শুধুমাত্র অভ্যাসের বশে শিল্প-আঙ্গিক ব্যবহার করেন, তাঁর নিজস্ব দ্বিধাগ্রস্ত ও শ্রমলব্ধ নৈতিক মতবাদ প্রচারের উপায় হিসেবে, তখনও সেই আকাঙ্ক্ষিত ও আপাতবর্জিত শিল্পও আমাকে মুগ্ধ রাখে।' (টোমাস মানের জার্মান রচনার ইংরেজী ভাষান্তর Tolstoy থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন সন্তোষ গুপ্ত)।

টলস্টয়ের প্রগতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বিখ্যাত

লেখক স্টেফান ট্সহ্বাইগ্ তাঁর রচনা সংকলনের ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন,—

'বিপ্লব-বিরোধী এই কাউন্ট (তল্‌স্তোয়) লেনিন ও ত্রৎস্কির পথ যেভাবে সহজ করে দিয়েছিলেন, ঊনবিংশ শতকের অন্য কোন রুশ বিপ্লবীই তা করেন নি। তল্‌স্তোয়ই প্রথম ব্যক্তি যিনি জারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন, এবং হোলি সিনদের নিষেধাজ্ঞার পর চার্চ ত্যাগ করেন। বিদ্যমান সমুদয় কর্তৃপক্ষকে হাতুড়ির আঘাতে তিনিই বিচূর্ণ করেন, এক নতুন ও শ্রেয়তর পৃথিবীর আবশ্যিক শর্ত হিসেবে সামাজিক সাম্যতার দাবী তিনিই প্রথম তোলেন। সেন্সর কর্তৃক নিষিদ্ধ তাঁর রচনাসমূহ হাতে নকল হয়ে পৌঁছে যেত শত সহস্র পাঠকের কাছে, সম্পত্তির বিলুপ্তি সম্পর্কে তাঁর দাবীর কথা সাধারণ্যে জানা হয়ে যেত, অথচ সেই সময়েই চরম সমাজ-বিপ্লবীরা উদারনৈতিক উপশম ও সংস্কার নিয়েই বেশী খুশী ছিল। রাশিয়াকে তাড়াতাড়ি র‍্যাডিক্যাল করে তুলতে তল্‌স্তোয়ের র‍্যাডিক্যাল ধ্যান-ধারণা যে ভূমিকা রেখেছে অন্য কোন বই বা ব্যক্তি তা পারেনি। কোন দুঃসাহসী কাজ থেকে ফিরে না আসার জন্য এত উৎসাহ তাঁর মতো আর আর কেউ দেয়নি। কাজেই তাঁর অন্তর্গত যাবতীয় প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রেড-স্কোয়ারের একটি মনুমেণ্ট তাঁর প্রাপ্য। কেননা রুশো যেমন ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের পূর্বপুরুষ, তেমনি তল্‌স্তোয়ও ছিলেন 'প্রোড্রোমোস (গ্রীক শব্দ, অর্থ 'অগ্রদূত')—রুশভূমির বিপ্লবের সত্যিকারের আদি-পুরুষ। [ইংরেজী ভাষান্তর থেকে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছেন ফারুক মেহেদী]।

টলস্টয় এবং রবীন্দ্রনাথের জীবন-দৃষ্টির পার্থক্য বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়ে সুবীর রায়চৌধুরী ডক্টর হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত 'লেভ্ তল্‌স্তোয়' সংকলন গ্রন্থের অন্তর্গত 'সাদৃশ্যের সন্ধানে' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন,—

'ধর্ম এবং কামনার দ্বন্দ্ব তল্‌স্তোয়ে যেমন তীব্রভাবে চিত্রিত তেমন রবীন্দ্রনাথে নেই। তল্‌স্তোয়ের ধর্মীয় দৃষ্টি অনুতপ্ত পাপীর মতো—অনেক পাপের মূল্যে সে একে পায়। অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি প্রশান্ত। গৌতম বুদ্ধ প্রথমে যেমন দেহ নির্যাতনের মধ্যে মুক্তি খুঁজে-ছিলেন, তেমনি তল্‌স্তোয়ও নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ধর্মে

উত্তরণ চেয়েছেন। আর রবীন্দ্রনাথ হলেন পরবর্তী ধ্যানী বুদ্ধ, বৈরিতা নয়, বৈরাগ্যে তার পূর্ণতা……। আমাদের কল্পনা করতে ইচ্ছা করে তল্‌স্তোয় 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস পড়ে কী বলতেন? শচীশকে হয়ত তাঁর মনে হতো অস্পষ্ট, বড়ো বেশি 'অশরীরী'—যেখানে পাপ নেই, বিক্ষোভ নেই, সেখানে যন্ত্রণার তীব্রতা কোথায়?'

ম্যাক্সিম গোর্কি টলস্টয়ের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্ব নির্ণয় করেছেন এভাবে ঃ

'তিনি (তল্‌স্তোয়) যদি মাছ হতেন, তা হলে নিঃসন্দেহে মহাসাগরই হতো তাঁর আবাসভূমি। নদীতে তো নয়ই, উপসাগরের বুকেও তিনি সাঁতার কাটতেন না।…… সত্যিকারের ঋষির মতো তিনি সুগভীর মর্যাদার সঙ্গে নিস্তব্ধ হয়ে থাকতে জানেন। এ কথা সত্য যে, যে-সব চিন্তাভাবনা তাঁকে আচ্ছন্ন করে সে সম্পর্কে তিনি অনেক কথা বলেন। কিন্তু এটা আপনি স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারেন যে, আরো অনেক কথা আছে যা তিনি বলেন না। এমন অনেক বিষয় রয়েছে যে সম্পর্কে তিনি কারো কাছে মন খুলতে পারেন না। হয়তো অনেক ভাবনা রয়েছে,—যে সম্পর্কে তিনি ভীত ও শঙ্কিত।… ..মাঝে মাঝে মনে হয়, তিনি যেন কোন দূর দেশ থেকে এসেছেন, সেখানে মানুষের চিন্তা-ভাবনা-অনুভূতি অন্য রকম, পরস্পরের সঙ্গে আচরণ ও ব্যবহার অন্য রকম। সেখানে মানুষ নড়াচড়া করে ভিন্নভাবে, কথা বলে ভিন্ন ভাষায়, সে সময় তিনি এক কোনায় বসে থাকতেন। ক্লান্ত, ধূসর, অন্য কোন দেশের ধূলায় ধূসরিত। সবার দিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন। সে চোখের দৃষ্টি যেন কোন অপরিচিতের কিংবা কোন মূক বধিরের।……উপদেশ বর্ষণ ও তত্ত্বপ্রচারণার একঘেয়েমি সত্ত্বেও এই অবিশ্বাস্য লোকটির জ্ঞানের বিশালতা ও বৈচিত্র্য সীমাহীন।……ওর সম্পর্কে বিস্ময়ের ঘোর কারো কখনও কাটে না, কিন্তু তার সঙ্গে খুব ঘন ঘন সাক্ষাৎ হোক, তাও বোধ হয় আপনি চাইবেন না। আমি তো তাঁর সঙ্গে এক ঘরে দূরের কথা, এক বাড়ীতেই বাস করতে পারবো না। ওঁর সঙ্গে থাকা মানে এমন একটা প্রান্তরে বাস করা—যেখানে খর সূর্য সব কিছু পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে, যেখানে সূর্য পর্যন্ত নিজে

পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, সামনে যেখানে শুধু অন্তহীন কালো রাত্রি।”
[এই অংশটি গোর্কির —'আ লিতেরাতুরে'র সংক্ষিপ্ত ইংরেজী অনুবাদ On Literature গ্রন্থের Lev Tolstoy প্রবন্ধের Notes-এর অন্তর্ভুক্ত। সে Notes থেকে অংশত অনুবাদ করেছেন মেহের কবীর]।

টলস্টয়ের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে ম্যাক্সিম গোর্কি তাঁর অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে নিজস্ব অনুভূতি ব্যক্ত করেছিলেন নিম্নোক্ত আবেগমথিত ভাষায়ঃ

'……তিনি যেন হঠাৎ জীবন্ত-হয়ে-ওঠা এক প্রাচীন শিলা! সমস্ত কিছুর উৎস ও লক্ষ্যভূমি জ্ঞাত আছেন…সমুদ্র যেন তাঁর আত্মারই অংশ। আশেপাশে সকল কিছুর সাথে তিনি অবিচ্ছিন্ন। নিথর বুড়ো মানুষটি যেন মধুর এবং সুগভীর দৈববাণী উচ্চারণ করলেন, সে বাণী তাঁর পায়ের নীচের বিষণ্ণ তরঙ্গ থেকে উপরে আকাশের শূন্যতায় কিসের অন্বেষায় হারিয়ে গেল। যেন তাঁর কথায়, তাঁর ইচ্ছাতেই সকল কিছু ঘটছে।……এই ঘোরের মধ্যে অকস্মাৎ আমার যেন মনে হলো এইবার তিনি জেগে উঠবেন, তাঁর অঙ্গুলি-নির্দেশে স্তব্ধ হবে সমুদ্র, পাহাড় হয়ে উঠবে জঙ্গম, নড়েচড়ে উঠবে, চিৎকার করে উঠবে। যেন আশেপাশের সকল কিছুই জেগে উঠবে, কথা কয়ে উঠবে শতধা ভিন্ন ভাষায়—বলবে তাঁর কথা, বিরুদ্ধেও কত কথা। আমার সেই মুহূর্তের অনুভব ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব।'

[প্রাগুক্ত ইংরেজী অনুবাদের The letter অংশের আংশিক ভাষান্তর করেছেন মাহমুদ আল জামান]।

বরিক পাস্তির্নোক তাঁর আত্মজৈনিক রচনায় টলস্টয়ের ব্যক্তিত্ব নির্ণয় প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন,—

'তল্‌স্তোয় ছিলেন একজন নীতিবাগীশ ও সাম্যবাদী, প্রবক্তা ছিলেন এমন এক ন্যায়নীতির যা ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে সমভাবে ও সমপরিমাণে প্রযুক্ত হবে। তত্রাচ তাঁর যাবতীয় গুণাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট হচ্ছে তাঁর মৌলিক চিন্তাধারা—এতখানি মৌলিক যে তা প্রায় কুটাভাসের সামিল। সৃজনশীল ধী-

শক্তির আবেগ তল্‌স্তোয় অনিঃশেষভাবে স্বীয় অন্তরে ধারণ করেছিলেন। এঁরই আলোকে তিনি প্রতিটি জিনিষকে তার আদিম এবং মৌলিক সজীবতায় দেখতে পেতেন। দেখতেন নতুন ভাবে—যেন সেবারই মাত্র প্রথম দেখছেন। কিন্তু তিনি নিজে কখনও অদ্ভুতকে খুঁজে বেড়ান নি, তাকেই লক্ষ্য ভেবে কখনও তার পিছনে দৌড়ান নি, এবং যেটা আরও কম করেছেন তা হলো, সাহিত্যের প্রকরণ হিসেবে তাকে ব্যবহার করা।'

[শাকের চৌধুরী কৃত পাস্তিয়ের্নাকের আত্মজৈবনিক রচনার ইংরেজী ভাষান্তর An Essay in Autobiography থেকে প্রাসঙ্গিক অংশের অনুবাদ।]

টলস্টয়ের অপ্রতিরোধ অহিংস মতবাদ এবং ধর্মপ্রচারের নির্মম সমালোচক হলেও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের সাহায্যে বিপ্লবী নেতা লেনিন টলস্টয়ের ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিভার স্বরূপ উন্মোচনে যে বাস্তব-দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন মননশীলতায় তা উজ্জ্বল। লেনিন প্রথমে নিজের প্রত্যয় অনুযায়ী টলস্টয়ের মতাদর্শের অসঙ্গতি তুলে ধরেছেন এভাবে ঃ

'...একদিকে অতি সংযত বাস্তববাদ, সমস্ত রকমের মুখোস ছিঁড়ে ফেলা, আর একদিকে জগতের সব চেয়ে জঘন্য একটা জিনিষের উপদেশ—ধর্মপ্রচার ঃ সরকারীভাবে নিযুক্ত যাজকদের জায়গায় নৈতিক প্রত্যয় থেকে কাজ করবে এমন যাজক আনবার চেষ্টা, অর্থাৎ অতি-মার্জিত এবং সেই কারণে বিশেষ ন্যাক্কারজনক যাজকতন্ত্র গড়ে তোলার চেষ্টা......এই সব অসঙ্গতির দরুণ টলস্টয়ের পক্ষে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন এবং সমাজতন্ত্রের জন্য আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা কিংবা রুশ বিপ্লবকে বোঝা সম্ভব হয়নি, তা বলাই বাহুল্য। তবে তল্‌স্তোয়ের অভিমতে আর মতবাদে অসঙ্গতিগুলো আপতিক নয়, উনিশ শতকের শেষ তেহাইয়ে রুশ জীবনের অসঙ্গতিপূর্ণ অবস্থা তাতে প্রকাশ পেয়েছে।'

'...তল্‌স্তোয়ের মৌলিকত্ব আছে, কেননা সমগ্রভাবে ধরলে তাঁর মতামতের সার-সংক্ষেপে আমাদের বিপ্লবের বিশেষক উপাদানগুলো প্রকাশ পেয়েছে কৃষক বুর্জোয়া বিপ্লব হিসেবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে

আমাদের বিপ্লবে কৃষককুলকে তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে হয়েছে, যে অসঙ্গতিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে, বাস্তবিকই তার একখানা দর্পণ হলো তল্‌স্তোয়ের অভিমতের অসঙ্গতিগুলো। এক দিকে বহু শতকের সামন্ততন্ত্রের উৎপীড়ন এবং সংস্কারের পরবর্তী দশকগুলির ত্বরিত নিঃস্বতা জমিয়ে তুলেছে পাহাড় প্রমাণ ঘৃণা, ক্ষোভ আর মরিয়া দৃঢ়সংকল্প। সরকারী যাজকমণ্ডলী, জমিদারগণ, আর জমিদারবাদের সরকারকে ঝেঁটিয়ে একবারে বিদায় করবার প্রচেষ্টা, ভূমি থেকে জঞ্জাল সাফ করবার প্রচেষ্টা, পুলিশ-শ্রেণীগত রাষ্ট্রের জায়গায় মুক্ত আর সমান সমান ছোট কৃষকদের লোকসমাজ স্থাপনের প্রচেষ্টা—এই প্রচেষ্টা হলো আমাদের বিপ্লবে কৃষককুলের প্রত্যেকটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপের মুল উপাদান। নিঃসন্দেহে বলা যায় তল্‌স্তোয়ের অভিমত-'তন্ত্র'কে কখনও কখনও যে বিমূর্ত 'খ্রীস্টীয় নৈরাজ্যবাদ' বলে মূল্যায়ন করা হয়, তার চেয়ে ঢের বেশী পরিমাণে, কৃষকদের এই প্রচেষ্টার সঙ্গেই তাঁর রচনার মর্মবাণী মেলে'।

টলস্টয়ের মৃত্যুর পর তাঁর শৈল্পিক অবদানের বৈশিষ্ট্য এবং মহত্ত্ব সম্পর্কে লেনিন লিখেছেন :—

'মহাশিল্পী হিসেবে তল্‌স্তোয় দেখা দেবার সময়ে তখনও দেশে ভূমিদাস প্রথার আধিপত্য ছিল। অর্ধ শতকের বেশী কালের সাহিত্যিক ক্রিয়া কলাপের মধ্যে সৃষ্টি-করা এক গুচ্ছ মহান রচনায় তিনি চিত্রিত করেছেন প্রধানত পুরাতন প্রাক্‌-বিপ্লব রাশিয়াকে, যে রাশিয়া ১৮৬১ সালের (যে বৎসর রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথার বিলোপ ঘটে) পরেও রয়ে গিয়েছিল আধা ভূমিদাস প্রথার অবস্থায়—জমিদার আর কৃষকের গ্রাম রাশিয়া। রাশিয়ার ইতিহাসের এই কাল পর্যায়টা চিত্রিত করার মধ্যে তল্‌স্তোয় এত সব বিরাট সমস্যা তুলে ধরতে পেরেছেন, আর সক্ষম হয়েছেন শিল্প-ক্ষমতার এমন শিখরে উঠতে যে, তাঁর রচনাবলীর স্থান হয়েছে বিশ্বসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির মধ্যে। ভূমিদাস মালিকদের পদানত একটি দেশে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতির যুগটা তল্‌স্তোয়ের দেদীপ্যমান আলোক-

সম্পাতের কল্যাণে হয়ে উঠলো সমগ্র মানবজাতির শিল্পকলাগত বিকাশের ক্ষেত্রে একটা অগ্রপদক্ষেপ।'

'. ঠিক কৃষক আন্দোলনেরই শক্তি আর দুর্বলতা, ক্ষমতা আর সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে তল্স্তোয়ের রচনাবলীতে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এবং পুলিশের সঙ্গে গাটছড়া-বাঁধা সরকারী যাজকমণ্ডলীর বিরুদ্ধে তাঁর ক্রুদ্ধ, আবেগচঞ্চল এবং প্রায়ই নির্মম তীব্র প্রতিবাদের মধ্যে ফুটে উঠেছে আদিম ধরনের কৃষক গণতান্ত্রিক জনগণের অনুভূতি,—তাদের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দীর ভূমিদাসত্ব, সরকারী জুলুম আর রাহাজানি, এবং গির্জার ভণ্ডামি, ছলনা আর প্রতারণা জমিয়ে তুলেছিল পর্বত-প্রমাণ ক্রোধ আর ঘৃণা। ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার বিরুদ্ধে তাঁর অনমনীয় বিরোধিতার মধ্যে ফুঠে উঠে সেই ঐতিহাসিক কাল-পর্যায়ের কৃষক জনগণের মানসতা, যাতে ভূমি-সম্পত্তি আর রাষ্ট্রীয় 'আবণ্টন' উভয় রূপের মধ্যযুগীয় জমিদারী প্রথা দেশের পরবর্তী বিকাশের পথে হয়ে উঠেছিল একটা অতি অসহ্য অন্তরায়, আর যখন এই ভূমি মালিকানার অতি সরাসরি আর নির্মম ধ্বংস ছিল অনিবার্য, অবধারিত। পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর অবিরাম অভিযোগ,—অতি প্রগাঢ় আবেগ এবং সুতীব্র সক্রোধ ঘৃণায় ভরপুর সে অভিযোগের মধ্যে ফুটে উঠেছে প্যাট্রিয়ার্কাল কৃষকের অনুভূত সমগ্র পরম বিতৃষ্ণা, যা সে অনুভব করেছে নতুন অদৃশ্য অবোধ্য শত্রুর আগমনে, যা শহরের কোন জায়গা থেকে কিংবা বিদেশের কোন জায়গা থেকে এসে ধ্বংস করেছে গ্রাম-জীবনের সমগ্র 'খুঁটিগুলিকে', সঙ্গে নিয়ে আসছে অভূতপূর্ব অধঃপতন, গরিবি. ভূখা, বর্বরতা, বেশ্যাবৃত্তি, সিফিলিস—'আদিম সঞ্চয়নের যুগের অনুসঙ্গী যাবতীয় বিপর্যয় দুর্দশা, যা শতগুণ প্রকোপিত হলো মিঃ কুপনের (১৯শ শতকের নবম ও দশম দশকের সাহিত্যে এই নামে পুঁজি ও পুঁজিপতিদের বুঝানো হতো) গড়ে তোলা সর্বাধুনিক লুণ্ঠন-প্রণালীগুলো রাশিয়ার মাটিতে পরিবাপনের দরুণ।'

টলস্টয়ের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে লেনিন মন্তব্য করেছেনঃ '...যে উত্তরাধিকার তিনি রেখে গেছেন তার মধ্যে রয়েছে এমন বস্তু যা

অতীতের জিনিষ হয়ে পড়েনি, যা ভবিষ্যতের। রাশিয়ার প্রলিতারিয়েত এই উত্তরাধিকার গ্রহণ করে সেটা নিয়ে কাজ করছে।'

টলস্টয়ের জীবন এবং সাহিত্যের বিবর্তনকে লেনিন দেখেছেন এ ভাবে :

'..জন্মসূত্রে আর শিক্ষা-দীক্ষায় তল্‌স্তোয় ছিলেন রাশিয়ার সব চেয়ে উপরে তলার ভূমি সম্পত্তিবান অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ— এই পরিবেশের যাবতীয় প্রচলিত মতামত থেকে ভেঙে বেরিয়ে এসে শেষের দিককার রচনাবলিতে তিনি সমস্ত সমসাময়িক রাষ্ট্রীয়, যাজক-মণ্ডলীয়, সামাজিক আর অর্থনীতিক প্রতিষ্ঠানাদির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা-আক্রমণ চালিয়েছিলেন। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের ভিত ছিল জনগণের দাসত্ব-দশা, জনগণের গরিবি, কৃষক আর সাধারণ ভাবে ছোট মালিকদের সর্বনাশ, সমগ্র সমসাময়িক জীবনে পরিব্যাপ্ত জুলুম আর ভণ্ডামি।...তল্‌স্তোয়ের দৃষ্টিকোণ হল প্যাট্রিসিয়ান অতি সরল কৃষকের দৃষ্টিকোণ এবং নিজ সমালোচনা এবং মতবাদে তিনি হাজির করেছেন সেই কৃষকের মানসতা।

প্রলেতারীয় সংগ্রামে টলস্টয়ের সাম্যবাদী অথচ নিষ্ক্রিয় সংগ্রামের সমালোচনা প্রসঙ্গে লেনিন বলেন :

'শাসক শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে তল্‌স্তোয়ের অভিযোগ প্রচণ্ড শক্তিশালী এবং অকৃত্রিম। গির্জা, আইন-আদালত, সমরবাদ, আইনগত বিবাহ-বন্ধন, বুর্জোয়া বিজ্ঞান ইত্যাদি যে সব প্রতিষ্ঠানাদি দিয়ে আধুনিক সমাজ বজায় থাকে, সেগুলোর ভিতরকার মিথ্যাচার তিনি একেবারে স্পষ্ট করে খুলে ধরেছেন। কিন্তু, আধুনিক সমাজব্যবস্থার কবর-খনক প্রলেতারীয়দের জীবন, কর্ম এবং সংগ্রামের একেবারে বিরুদ্ধে প্রতিপন্ন হয়েছে তাঁর মতবাদ। লেভ্ তল্‌স্তোয়ের শিক্ষায় তা হলে প্রতিফলিত হয়েছে কার দৃষ্টিকোণ? তাঁর মুখে ফুটেছে সেই বহু সংখ্যক রুশ জনগণের কথা যারা আধুনিক জীবনের কর্তাদের অত্যন্ত ঘৃণা করে ইতিমধ্যেই, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে সচেতন, সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুরাদস্তুর

অনমনীয় সংগ্রাম চালাবার পর্যায়ে পৌঁছায়নি তখন পর্যন্ত।..... গভীরতম প্রদেশ অবধি আলোড়িত এই মানব-মহাসমুদ্র তার যাবতীয় দুর্বলতা এবং বলিষ্ঠ উপাদানগুলি সমেত প্রতিবিম্বিত হয়েছে তলস্তোয়ের মতবাদে। ...... লেভ্ তল্স্তোয়ের সাহিত্যিক রচনাবলি পড়ে রুশ শ্রমিকশ্রেণী তার শত্রুদের আরও ভালভাবে চিনতে শিখবে, কিন্তু তল্স্তোয়ের মতবাদ বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমগ্র রুশ জনগণকে বুঝতে হবে তাদের নিজেদের দুর্বলতা কোথায়—যে দুর্বলতা তাদের মুক্তির লক্ষ্যটাকে সমাপ্তি অবধি নিয়ে যেতে দেয়নি। এগিয়ে যাবার জন্যে এটা অবশ্যই বোঝা দরকার।'

শিল্পী টলস্টয়ের যুগ-সচেতনতার পরিমাণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লেনিন বলেছেন :—

'লেভ তল্স্তোয় যে যুগের মানুষ, যে যুগ এমন বলিষ্ঠ রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে তাঁর দেদীপ্যমান সাহিত্যিক রচনাবলীতেও এবং তাঁর মতবাদেও সেটা ১৮৬১ সালের পরে শুরু হয়ে চলছিল ১৯০৫ সাল অবধি। তল্স্তোয়ের সাহিত্যিক কর্মজীবন শুরু হয়েছিল আরো আগে, সেটা শেষ হয়েছিল আরও পরে, তা ঠিক। কিন্তু এই যে কাল-পর্যায়ের উত্তরণকালীন প্রকৃতি তল্স্তোয়ের রচনাবলি, এবং 'তল্স্তোয়-বাদে'র সমস্ত উপাদানের উদ্ভব ঘটিয়েছিল, সেই সময়েই তিনি সম্পূর্ণত সুপরিণত হয়ে উঠেছিলেন শিল্পী হিসেবেও, চিন্তাবীর হিসেবেও।'

তল্স্তোয়বাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লেনিনের অভিমতও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ

'আসল ঐতিহাসিক মনস্তত্ত্বের দিক থেকে তল্স্তোয়বাদ একটা প্রাচ্য রীতির, এশীয় রীতির মতাদর্শ। তারই থেকে এসেছে কৃচ্ছ্রসাধনা, অমঙ্গলের বিরুদ্ধে না-প্রতিরোধ, প্রগাঢ় দুঃখবাদের স্বর, 'সব কিছুই নাস্তি, সব কিছুই একটা ভৌত নাস্তি' (জীবনের অর্থ, পৃঃ ৫১)—এই প্রত্যয়, এবং 'আত্মা'র প্রতি বিশ্বাস, 'সব কিছুর আদিতে বিশ্বাস, এই আদির সঙ্গে সংস্রবে মানুষ নিছক 'মজুর', 'যার উপর ন্যস্ত হয়েছে নিজ আত্মাকে রক্ষা করার কাজ'—এই বিশ্বাস ইত্যাদি ;

বিপ্লবী সাম্যবাদী নেতা লেনিনের মনে 'তল্স্তোয়বাদে'র সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সংশয়ের কোন অবকাশ না থাকলেও তাঁর আদর্শবাদী মতবাদের সত্যমূল্য বিষয়ে দ্বিধাহীন অভিমত প্রকাশে কুণ্ঠিত হননি তিনি। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হলো :

'তল্স্তোয়ের মতবাদ নিশ্চয়ই স্বপ্নরাজ্যের ব্যাপার এবং মর্মবস্তুর দিক থেকে সেটা প্রতিক্রিয়াশীল,—কথাটা অতি যথাযথ এবং অতি-প্রগাঢ় অর্থেই। কিন্তু তার অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে, এই মতবাদ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের নয়, কিংবা অগ্রসর শ্রেণীগুলির জ্ঞানালোক প্রাপ্তির মূল্যবান উপচার যোগাতে পারার মতো বৈচারিক উপাদান তাতে ছিলো না।'

[প্রগতি প্রকাশন, মস্কো-প্রকাশিত লেনিনের 'সাহিত্য প্রসঙ্গে' বই থেকে 'লেভ্ তল্স্তোয়' সংকলনে (ঢাকা 'মুক্তধারা' প্রকাশিত) সম্পাদক ডক্টর হায়াৎ মামুদ 'রাশিয়ার দর্পণ' নামকরণ করে যে রচনাটি পুনর্মুদ্রিত করেন, উদ্ধৃতিগুলি তার থেকে গৃহীত। —লেখক]

এই হলো পাশ্চাত্যের বিভিন্ন মনীষীর দৃষ্টিতে টলস্টয়ের অনন্য-সাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং কালজয়ী প্রতিভার মোটামুটি পরিচয়। এই মনীষী চিন্তানায়কের জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্ব এবং ভাস্বর প্রতিভার বহুব্যাপ্ত বিকাশে তাঁর বিশিষ্ট জীবন-পরিবেশ, বিচিত্র অভিজ্ঞতা, স্ব-কাল এবং বহু অধ্যয়নজনিত জ্ঞান-সঞ্চয়ের সক্রিয় ভূমিকা অবশ্যই ছিলো। কিন্তু কোন অদৃশ্য দুর্নিবার শক্তির প্রেরণায় জীবন-রহস্য সন্ধানী প্রতিভাবান শিল্পী টলস্টয় অবশেষে শোষিত নির্যাতিত মানবমুক্তি-প্রয়াসী মহামনীষী এবং মানবপ্রেমিক টলস্টয়ে রূপান্তরিত হলেন, টলস্টয়ের দুর্লভ ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার স্বরূপ-সন্ধানীদের নিকট চিরদিনই তা দুর্ভেদ্য রহস্য বলে বিবেচিত হবে। এখানে এসে টলস্টয়ের সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিভার চাবিকাঠি-সন্ধানীদের পক্ষে এই

অসাধারণ মানুষটির অনির্ণেয় অলৌকিক দৈবী প্রতিভার ওপর প্রত্যয় স্থাপন ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।*

পরিশিষ্ট

শিল্প প্রসঙ্গে
[On Art]
লিও টলস্টয়

অনুবাদ : **দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ**

[কোন বস্তু শিল্প নামধেয় এবং কোন বস্তু শিল্প নয় ; শিল্প কখন গুরুত্ব লাভ করে এবং কখন তুচ্ছ বিবেচিত হয় ।]

॥ এক ॥

অনেক তুচ্ছ, এমনকি ক্ষতিকর বিষয়ও আমাদের জীবনে এমন শ্রদ্ধার আসন অধিকার করে থাকে, যা আদৌ তাদের প্রাপ্য নয়। এ ধরনের অনেক ক্রিয়াকলাপকে সহ্য করা হয় শুধুমাত্র এই কারণে যে, সেগুলি আমাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। ফুল, প্রাণী (ঘোড়া) অথবা প্রাকৃতিক দৃশ্যের যথাযথ অনুকৃতি, আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত পরিবারে সঙ্গীত চর্চার নামে যে কুৎসিৎ এক ধরনের শৃঙ্খলাহীন সঙ্গীত শিক্ষা হয়ে থাকে, কিংবা সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্র সমূহে যে অজস্র দুর্বল গল্প এবং নিকৃষ্ট পদ্য প্রকাশিত হয়, স্পষ্টত এগুলি শিল্পকর্মই নয়। এ ছাড়া ইন্দ্রিয়-উদ্দীপক অশোভন এবং অশ্লীল চিত্রাঙ্কন কিংবা ওই পর্যায়ের সঙ্গীত ও গল্প রচনা শিল্প-গুণান্বিত হলেও কোন শ্রদ্ধাযোগ্য মূল্যবান কাজ নয়।

সুতরাং যে সমস্ত বস্তু আমাদের নিকট শিল্পকর্ম বলে বিবেচিত, সেগুলির মধ্যে কোনটি শিল্প নামধেয়, কোনটি আদৌ শিল্প নামের যোগ্য নয়,—তা পৃথক করে নেবার প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয়ত, যথার্থ শিল্পকর্ম বলে অভিহিত বস্তুর মধ্যেও কোনটি তুচ্ছ এবং নিম্ন পর্যায়ের এবং কোনটি গুরুত্বপূর্ণ ও মহৎ-শিল্প, তা নির্ণয় করা দরকার।

শিল্প এবং অ-শিল্পের মধ্যে ভেদরেখা কোথায় টানা যায় এবং

অকিঞ্চিৎকর নিকৃষ্ট শিল্পের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ মহৎ শিল্প কী?—তা নিরূপণের দায়িত্বও জীবনে অপরিসীম।

প্রকৃত শিল্পকর্ম নয় এমন বস্তুকে শিল্প বলে অভিহিত করে আমরা অনেক মারাত্মক বিভ্রান্তির সম্মুখীন হই। এর ফলে অনেক বস্তুর প্রতি আমরা যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি, তা সেগুলির প্রাপ্য তো নয়ই, বরং আমাদের ধিক্কার এবং ঘৃণার যোগ্য। শিল্প প্রযোজনার জন্য স্টুডিও, পেইন্ট, চিত্রপট, মর্মর প্রস্তর, বাদ্যযন্ত্র, দৃশ্যাবলী এবং যন্ত্রপাতি সম্বলিত প্রেক্ষাগৃহ প্রভৃতি নির্মাণে যে বিপুল মানবিক শ্রম ব্যয়িত হয় এবং শিক্ষা গ্রহণের সময় শিল্প-শিক্ষার্থীদের যে একপেশে শ্রমের শিকারে পরিণত করা হয়, তাতে তাদের মূল্যবান মনুষ্য-জীবন বিকৃত হয়ে যায়। লক্ষে লক্ষে না হলেও হাজারে হাজারে শিশুকে তথাকথিত নৃত্য এবং সঙ্গীত শিল্পের অনুসরণের নামে একমুখী শ্রমসাধ্য কর্মে প্রবৃত্ত হতে বাধ্য করা হয়। পীড়াদায়ক শিক্ষাক্রম অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সন্তানেরা শিল্পের প্রতি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে, তাদের কথা বাদ দিলেও যে সমস্ত ছেলেমেয়ে নৃত্যাভিনয় এবং সঙ্গীতকলার প্রতি অনুরক্ত, তারাও শিল্পের নামে যে বস্তুর নিকট আত্মনিবেদিত, তার বিষাক্ত প্রভাবে অনিবার্য স্বভাব বিকৃতি লাভ করে। যদি সাত আট বছরের ছেলেমেয়েকে দৈনিক সাত আট ঘণ্টা ধরে দীর্ঘ দশ পনের বৎসর ব্যাপী কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে বাধ্য করা হয়, বালিকাদের নৃত্যগীতের স্কুলে* পাঠিয়ে তাদের গর্ভাবস্থার প্রথম মাসগুলোতেও বিশেষ ধরনের নাচে বাধ্য করা হয় (টলস্টয়ের ভাষায় ছাগলের মত নৃত্য) এবং এ সমস্তই যদি শিল্পের নামে অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে যথার্থ শিল্প কী?—তার সংজ্ঞা প্রথমেই নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। এ ছাড়া শিল্প মানবজাতির পক্ষে যে মূল্যবান বস্তু, তা প্রমাণ করবার জন্যও শিল্পের সংজ্ঞা নির্ধারিত হওয়া উচিত।

---

*যে বিদ্যালয়ে নৃত্যাভিনয় অনুশীলনকারীদের পাঠ দেওয়া হয় এবং যে সমস্ত রঙ্গমঞ্চে প্রধান প্রধান নৃত্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়, রাশিয়াতে সেগুলি রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়।

এ অবস্থায় প্রশ্ন ওঠে, যে শিল্প প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হিসেবে মানব জাতির নিকট মূল্যবান, তার সঙ্গে অ-প্রয়োজনীয় পেশা, ব্যবসায়িক উৎপাদন, এবং নৈতিকতাহীন ক্রিয়াকলাপের ব্যবধান কোথায় ? যথার্থ শিল্পের প্রকৃত তাৎপর্য এবং গুরুত্ব কোথায় নিহিত ?

॥ দুই ॥

একটি শিল্পতত্ত্ব আছে,—যে মতানুসারে শিল্পের প্রকৃত তাৎপর্য নির্ভরশীল বিষয়বস্তুর গুরুত্বের ওপর। এ তত্ত্বের বিরুদ্ধবাদীরা একে বলে থাকেন 'উদ্দেশ্য মূলক'। এই তত্ত্বানুযায়ী শিল্প-সৃষ্টিকে প্রকৃত শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হতে হলে তার বিষয় হবে গুরুত্বপূর্ণ, মানুষের পক্ষে প্রয়েজেনীয়, মঙ্গলমুখী, নৈতিক এবং শিক্ষাপ্রদ।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী শিল্পী—অর্থাৎ যে ব্যক্তি কিছুটা নৈপুণ্যের অধিকারী—তিনি সমকালীন সমাজ-মানসকে কৌতূহলী করে মত মূল্যবান ভাববস্তুকে এমন পরিচ্ছদে সজ্জিত করতে সক্ষম—যা শিল্প-রূপ বলে প্রতীয়মান হয় এবং বাস্তবিকই এ ধরনের সৃষ্টি প্রকৃত শিল্পকর্ম। ওই তত্ত্বানুযায়ী ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সত্যকে যদি শৈল্পিক রূপের পরিচ্ছদে সজ্জিত করে উপস্থিত করা যায়, তবে সেগুলি প্রকৃত শিল্পসৃষ্টি।

অপর যে মতবাদ নান্দনিক বা কলাকৈবল্যবাদী তত্ত্ব বলে স্ব-ঘোষিত, তার বক্তব্য হলো, প্রকৃত শিল্পের সার নিহিত রূপমূর্তির (form) সৌন্দর্যের মধ্যে। অর্থাৎ কোন সৃষ্টিকে প্রকৃত শিল্প পর্যায়ে উন্নীত হতে হলে প্রয়োজন, প্রকাশভঙ্গীর অনন্যতা বা সুন্দর অভিব্যক্তি দেবার ক্ষমতা।

ওই তত্ত্বের অনুবর্তীরা বলেন, শিল্পসৃষ্টির জন্য প্রয়োজন শিল্পীর কলাকৌশল দক্ষতা। এই নৈপুণ্যের সাহায্যে তিনি শিল্পবস্তুকে এমন রূপ দেবেন, যা শিল্প-উপভোক্তার মনে সর্বোচ্চ পরিমাণ আনন্দদায়ক প্রভাব বিস্তার করে। এই মতবাদ অনুসারে সুন্দরভাবে অঙ্কিত প্রাকৃতিক দৃশ্য ফুল, নগ্নমূর্তি এবং চমৎকার পরিবেশিত নৃত্যাভিনয় (ব্যালে) শিল্পসৃষ্টি বলে বিবেচিত হবে।

বাস্তববাদী বলে স্ব-ঘোষিত তৃতীয় মতবাদের বক্তব্য হলো,—শিল্পের তাৎপর্য নিহিত বাস্তব সত্যের অবিকল অভিব্যক্তির মধ্যে। অর্থাৎ শিল্পকে যথার্থ শিল্প হতে হলে জীবনের বাস্তব রূপকে যথাযথভাবে চিত্রিত করতে হবে।

ওই তত্ত্বানুযায়ী শিল্পী তাঁর দৃষ্ট বা শ্রুত কোন বস্তুকে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব এবং রূপগত সৌন্দর্য-নিরপেক্ষভাবে পুনঃসৃষ্টি কর্মে তাঁর সাধ্যমত রূপ দিতে পারলেই তা শিল্পকর্ম বলে বিবেচিত হবে।

শিল্প সম্পর্কীয় মতবাদগুলি মোটামুটি এই। শিল্প নামে আজকাল যা অভিহিত, তার প্রত্যেকটি এই মতবাদগুলির কোন না কোনটি অনুসরণ করে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু এই মতবাদগুলির প্রত্যেকটি পরস্পরবিরোধী হওয়া ছাড়াও এদের মধ্যে কোন মতবাদই শিল্পের প্রধান দাবী পূরণে অক্ষম। সে দাবী হলো এমন একটি সীমানা নির্ণয়,—যা শিল্পকে ব্যবসায়িক, তুচ্ছ অথবা ক্ষতিকর সৃজনকর্ম থেকে পৃথক করে।

এই মতনাদগুলির যে কোন একটিকে অনুসণ করে অবিচ্ছিন্নভাবে কারুশিল্পের মত সৃজনকর্ম চলতে পারে, এবং সে সৃজনকর্ম তুচ্ছ অথবা অনিষ্টকর দুই-ই হতে পারে।

প্রথমোক্ত উদ্দেশ্যমূলক শিল্পতত্ত্বানুযায়ী ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের নিকট সব সময়ই সুলভ। সুতরাং এ সমস্ত ভাববস্তুর সাহায্যে যে কেউ তথাকথিত শিল্পবস্তু নির্মাণে সক্ষম হয়। এ ছাড়া এ পর্যায়ের বিষয়বস্তুকে তাঁরা এমন ধোঁয়াটে এবং অন্তরস্পর্শহীন ভাবে উপস্থিত করতে পারেন যে, সেই অনুভূতিহীন অভিব্যক্তির ফলে তাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সৃজনকর্মও মহান বিষয়বস্তু বিচ্যুত হয়ে তুচ্ছ, কপট, এমন কি ক্ষতিকারক প্রকাশরীতিতে পর্যবসিত হতে পারে।

অনুরূপভাবে দ্বিতীয় তত্ত্ব (নান্দনিক) অনুসরণে যে কোন ব্যক্তি শিল্পের যে কোন কলাকৌশল আয়ত্ত করে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এমন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন,—যা সুন্দর এবং আনন্দদায়ক। কিন্তু এই সুন্দর

এবং আনন্দদায়ক শিল্পবস্তুও তাৎপর্যহীন এবং ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

ঠিক এমনি ভাবে 'বাস্তববাদী' বলে তৃতীয় তত্ত্বের বেলায়ও দেখা যায়, 'শিল্পী' নাম কিনতে আগ্রহী ব্যক্তিমাত্রই অবিচ্ছিন্ন ভাবে তথাকথিত শিল্পবস্তু নির্মাণ করতে পারেন, যেহেতু ব্যক্তি মাত্রই সব সময় কিছু না কিছুতে আগ্রহশীল। এ পর্যায়ের শিল্পী যদি তুচ্ছ এবং অশুভ বিষয়ের প্রতি আগ্রহশীল হন তবে শিল্পকর্মও তুচ্ছ এবং অশুভ হতে বাধ্য।

এখানে সব চাইতে উল্লেখ্য বিষয় এই যে, উক্ত তিনটি শিল্পতত্ত্বের প্রত্যেকটিকে অনুসরণ করে কারু-শিল্পের পন্থায় অবিচ্ছিন্নভাবে 'শিল্প-কর্ম' নামে অভিহিত বস্তু উৎপাদিত হতে পারে এবং বাস্তবক্ষেত্রে হচ্ছেও তাই। ফলে তিনটি মুখ্য এবং পরস্পরবিরোধী মতবাদ শিল্প এবং অ-শিল্পের মধ্যেকার বিভেদরেখা নিরূপণেই শুধু যে ব্যর্থ হচ্ছে তা নয়, উপরন্তু তারা শিল্পের সঙ্গত পরিধিকে অযথা প্রসারিত এবং বিক্ষিপ্ত করে দিয়ে সব রকম তাৎপর্যহীন এবং ক্ষতিকর বিষয়কে শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছে।

॥ তিন ॥

তাহলে প্রশ্ন ওঠে,—প্রয়োজনীয়, গুরুত্বপূর্ণ, শ্রদ্ধাযোগ্য শিল্প এবং অপ্রয়োজনীয়, গুরুত্বহীন, শ্রদ্ধার অযোগ্য এবং ঘৃণার্হ শিল্পসৃষ্টি—যা নৈতিক চরিত্র কলুষিত করার সহায়ক,—এ দুইকে পৃথক করবার সীমারেখা কোথায়? প্রকৃত শিল্পকর্মের অবস্থিতিই বা কোথায়?

এ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিতে গেলে প্রথমে আমাদের শিল্পকর্মের সঙ্গে অপর কর্মের (যাকে সাধারণত শিল্পকর্ম বলে গুলিয়ে ফেলা হয়) পার্থক্য কোথায় তা বিচার করে দেখতে হবে। পূর্ববর্তী প্রজন্মের মানুষের কাছ থেকে আমরা যে ধারণা এবং উপলব্ধির অধিকারী হয়েছি, তার থেকে নতুন উপলব্ধির প্রভাবজাত কর্মকে পৃথক করতে হবে এবং নতুন উপলব্ধ বিষয়বস্তু সমূহকে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মের মানুষের হাতে তুলে দিয়ে যেতে হবে।

বিজ্ঞানের মতই শিল্পকলার ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান হস্তান্তরের কাজটি শিক্ষাদান এবং শিক্ষা গ্রহণের মতই কাজ, তা শৈল্পিক ক্রিয়া নয়। অভিনব বস্তু সৃষ্টিকেই বলা চলে প্রকৃত সৃষ্টি—অকৃত্রিম শৈল্পিক কর্ম।

জ্ঞান বা শিক্ষাদান কর্মকে অপরের নিকট পৌঁছে দেবার মধ্যে স্বতন্ত্র কোন তাৎপর্য নেই। সে তাৎপর্য সম্পূর্ণ নির্ভরশীল—যা সৃষ্টি হলো লোকে সে বস্তুকে কি মূল্য দিচ্ছে তার ওপর—তাদের বিবেচনায় এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মের হাতে কোনটি দিয়ে যাওয়া প্রয়োজন—তার ওপর।

সুতরাং 'শিল্পকর্ম কি বস্তু?'—তার সংজ্ঞা ভাবীকালের বংশধরদের হাতে কি দিয়ে যাওয়া উচিত—তারও পথ নির্দেশ করবে। মনে রাখা দরকার, শিক্ষকতার কাজটি সাধারণত শৈল্পিক কাজ বলে বিবেচিত হয় না। শিল্পকর্মের গুরুত্ব যথার্থভাবে আরোপিত হয় সৃষ্টির ওপর—যাকে বলা হয় শিল্পসৃষ্টি।*

* সর্বাপেক্ষা প্রচলিত এবং ব্যাপকভাবে ফেনানো শিল্প-সংজ্ঞা হলো—শিল্প এমন একটি বিশেষ ক্রিয়া যার লক্ষ্য বৈষয়িক উপযোগিতা নয়, বরং মানুষের মনে আনন্দ সৃষ্টি করাই শিল্পের কাজ। আরও বলা হয়, আনন্দ হলো সে জাতীয় বস্তু যা 'আত্মার মহত্ত্ব এবং সমুন্নতি' বিধানের সহায়ক।

অধিকাংশ ব্যক্তির শিল্প সম্পর্কে যে ধারণা, তার সঙ্গে এ সংজ্ঞার মিল আছে। কিন্তু এই সংজ্ঞা যাথার্থ্যহীন এবং যথোচিত স্বচ্ছও নয়। এবং এই সংজ্ঞাটির খুব বেশী স্বেচ্ছাচারী ব্যাখ্যাও করা যায়।

এই সংজ্ঞা অস্পষ্ট, যেহেতু এর মধ্যে দুটি ধারণার একত্র মিশ্রণ ঘটেছে। সে দুটি হলো, (১) শিল্প এমন একটি মানবিক ক্রিয়া যা শিল্পবস্তু সমূহ উৎপাদন করে, এবং (২) সে ক্রিয়ার ভেতর গ্রহীতার অনুভূতিসমূহও অভিব্যক্তি লাভ করে। শিল্প যে স্বেচ্ছাচারী ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে তার কারণ, যে আনন্দ আত্মার মহত্ত্ব এবং সমুন্নতি বিধান করে সে আনন্দ কোথায় নিহিত সে বিষয়ে কোন সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়নি। সুতরাং একটি শিল্পসৃষ্টি দেখে কোন ব্যক্তি যে আনন্দ

তাহলে প্রশ্ন ওঠে, শৈল্পিক (এবং বৈজ্ঞানিক) সৃষ্টি কী?

শৈল্পিক এবং বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি এক ধরনের মানসক্রিয়া,—যা অস্পষ্ট-উপলব্ধ অনুভূতি (বা চিন্তাকে) এমন স্পষ্ট করে তোলে—যাতে তা অপর মনে সঞ্চারিত হয়।

সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সকল মানুষের মধ্যেই বর্তমান বলে আমরা প্রত্যেকেই অন্তর্নিহিত অভিজ্ঞতার আলোকে তা উপলব্ধি করতে পারি। এই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সংঘটিত হয় নিম্নোক্ত উপায়েঃ কোন ব্যক্তি হয়ত হঠাৎ এমন কিছু কল্পনা করেন বা অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে বসেন,—যা তার কাছে সম্পূর্ণ নূতন, অপরিচিত এবং অশ্রুত মনে হয়। এই অভিনব বিষয়টি তাঁর মনে রেখাপাত করে এবং তিনি সেই উপলব্ধিকে সাধারণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অপরের নিকট তুলে ধরতে সচেষ্ট হন। এই প্রয়াসে প্রবৃত্ত হয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি দেখতে পান, তাঁর নিকট যা স্পষ্ট বলে অনুভূত, শ্রোতাদের নিকট তা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও নূতন। তাঁর বক্তব্য বিষয়কে তাঁরা দেখতে পান না বা উপলব্ধিও করেন না। এই বিচ্ছিন্নতা, বৈশাদৃশ্য এবং অপরের সঙ্গে সংযোগহীনতা তাঁকে পীড়া

---

*পেয়েছে বলে স্বীকার করে, তা দেখে অপর ব্যক্তি আদৌ কোন আনন্দই পায় না।

সুতরাং শিল্প সংজ্ঞা নির্দেশের জন্য সে ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য দুদিক থেকেই নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। প্রথম, শিল্পস্রষ্টার আত্মার জগতে সে ক্রিয়া যেভাবে কার্যকরী হয়, তার বৈশিষ্ট্য কী? এই ক্রিয়া অপরাপর কারুকর্ম অথবা ব্যবসা বানিজ্য, এমনকি বিজ্ঞান (যদিও শেষোক্তটির সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে) থেকে পৃথক, যেহেতু এরূপ ক্রিয়ার পশ্চাতে কোন বস্তুবাদী প্রয়োজনের তাগিদ নেই, বরং এরূপ ক্রিয়া শিল্পস্রষ্টা এবং শিল্প উপভোক্তা উভয়ের মনে একটি বিশেষ ধরনের তথাকথিত শৈল্পিক তৃপ্তি বিধান করে। এ বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা দিতে গেলে কি প্রেরণা মানুষকে এরূপ কর্মে প্রবৃত্ত করায় অর্থাৎ শৈল্পিক সৃষ্টি কিভাবে আত্মপ্রকাশ করে, ব্যক্তিবিশেষকে তা অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে।

দেয়। নিজের উপলব্ধির সত্যতা আরও গভীর ভাবে যাচাই করে ঐ ব্যক্তি পুনরায় চেষ্টা করেন, তাঁর দৃষ্ট, অনুভূত অথবা উপলব্ধ বিষয়কে অন্য কোন উপায়ে অপর মানুষের নিকট প্রকাশ করতে। কিন্তু তিনি দেখতে পান, অপরাপর ব্যক্তি তার বক্তব্য বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারছেন না, কিংবা তিনি যে ভাবে উপলব্ধি বা অনুভব করেন. সেভাবে তাঁরা উপলব্ধি বা অনুভবও করেন না। ফলে সে ব্যক্তি এমন সন্দেহে পীড়িত হতে থাকেন যে, তিনি এমন কিছু কল্পনা করেন বা অস্পষ্ট অনুভব করেন,—যার সত্যিকারের কোন অস্তিত্বই নেই। অথবা বাস্তব ক্ষেত্রে অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও অপবাপর ব্যক্তি তা দেখতে বা অনুভব করতে পারছেন না। এই সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর নূতন আবিষ্কারকে স্পষ্ট করে তুলবার কাজে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন—যাতে তাঁর বা অপরের নিকট তাঁর উপলব্ধ বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহও না থাকে। যখন এই স্পষ্টতাদান কার্য সমাপ্ত হয়, তখন ঐ ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে, তিনি যা দেখেছেন, উপলব্ধি বা অনুভব করেছেন তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই নেই। তাঁর সন্দেহ অপনীত হলে দেখা যায়, অপর ব্যক্তিও তারই মত অনুভব এবং উপলব্ধি করতে পারছেন। তাঁর নিজের নিকট এবং অপরের নিকট যা অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য ছিল, তাকে নিজের ও অপরের নিকট স্পষ্ট এবং সন্দেহাতীত করার এই প্রয়াসই হলো মানুষের আধ্যাত্মিক সৃষ্টিকর্মের সাধারণ উৎস। অপর কথায় যা মানুষের মনের দিগন্ত প্রসারিত করে এবং অননুভূত এবং অগোচর বিষয়কে মানুষের অনুভূতি এবং উপলব্ধির সীমায় নিয়ে আসে, তাকেই আমরা শিল্পকর্ম বলে অভিহিত করি।*

* মানুষের মানসক্রিয়ার পরিণতিকে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ক, উপদেশাত্মক; শৈল্পিক এবং অন্যান্য বিভাগে ভাগ করা হয়েছে পর্যবেক্ষণের সুবিধার জন্য। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এরূপ বিভাগের অস্তিত্ব নেই। যেমন, Tver, Nizhnigo'rod, Simbirsk, এবং Sara'tov প্রভৃতি ভল্গা নদীর বিভিন্ন অংশ দেখে বলা যায় না নদীটিকে সে সমস্ত অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। বস্তুত আমরা এ সমস্ত বিভাগ করি নিজেদের সুবিধার জন্য। . . . .

শিল্পীর কাজ এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই নিহিত এবং এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে শিল্প উপভোক্তার অনুভূতিরও যোগ রয়েছে। সেই অনুভূতির উৎসে আছে অনুকরণ-প্রবণতা, কিংবা আরও স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় সংক্রমিত হবার সামর্থ্য এবং সেই সঙ্গে এক ধরনের সম্মোহন। সম্মোহন শিল্পীর সেই আত্মিক শক্তি—যা তাঁর মনের অস্পষ্ট উপলব্ধ ভাবকেই শুধু স্পষ্টতা দান করে না, সংশয়কে দূরীভূত করে শৈল্পিক সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে সেই ভাবকে শিল্প উপভোগকারীর নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। শিল্পী যখন প্রকাশিতব্য বিষয়কে এমন স্বচ্ছতা দান করতে পারেন যে, তা সহজেই অপর মনে সঞ্চারিত হয় এবং সৃষ্টি মুহূর্তে শিল্পী নিজে যা উপলব্ধি করেছিলেন, অপর চিত্তে যদি সেই একই অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারেন,—একমাত্র তখনই একটি শিল্পকর্ম সমাপ্ত হয়েছে বলা যেতে পারে।

পূর্বে যা কেউ উপলব্ধি, অনুভব বা ধারণা করেনি—অনুভূতির গভীরতার সাহায্যে শিল্পী সকলের নিকট যদি তা স্পষ্ট এবং গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারেন,—তখনি জন্ম হয় যথার্থ শিল্পকর্মের।

লক্ষ্যে উপনীত হওয়ায় শিল্পী-মনের তীব্র অনুভূতির পরিতৃপ্তি ঘটলে তার মনে আনন্দ সৃষ্টি হয়। শিল্পের আস্বাদনকারীও সেই একই অনুভূতির উত্তাপ এবং পরিতৃপ্তির অংশীদার হন, আত্মসমর্পণ করেন শিল্পীর অনুভূতির নিকট, সে শিল্পের অনুকরণ করেন এবং সংক্রমিত ও অবিষ্ট হন সেই শিল্পের দ্বারা। আর সৃষ্টিমূহূর্তে শিল্পী যা অনুভব করেছিলেন, স্বল্পক্ষণের জন্য হলেও তিনিও তা অনুভব করতে থাকেন।

আমার মতে এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যই শিল্পকর্মকে অপরাপর সমস্ত কর্ম থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।

॥ চার ॥

এই বিভাগ অনুসারে শিল্পীর তীব্র অনুভূতি এবং চিন্তা প্রভাবে অর্জিত নতুন পদবাচ্য সব কিছুই শিল্পকর্ম। কিন্তু এই মানসিক ক্রিয়ার ওপর মানুষ যে গুরুত্ব অর্পণ করে তা যথার্থ বিবেচিত হবে—যদি তা

মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর হয়। যেহেতু এটা স্পষ্টই দেখা যায় যে, মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর বলে স্বীকৃত শিল্পের ওপর যে গুরুত্ব অর্পণ করা হয়, নতুন কোন অশুভ কর্মের ওপর কিংবা মানুষকে অশুভের দিকে আকর্ষণ করে এমন কোন নতুন প্রলোভনের ওপর আমরা সে মূল্য আরোপ করতে পারিনা। শিল্পের গুরুত্ব এবং মূল্য নিহিত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার এবং আত্মিক সম্পদের সমৃদ্ধি সাধনের মধ্যে।

সুতরাং শিল্পকর্মে যদিও সব সময় অভিনব কিছুর অস্তিত্ব থাকবেই, তবু অভিনব কোন বস্তুর অভিব্যক্তি মাত্রকেই সব সময় শিল্প বলা যাবে না। শিল্পকর্মে বলে বিবেচিত হবার প্রয়োজনীয় শর্তগুলি হলো এই:

১। শিল্পকর্মের অন্তর্নিহিত অভিনব উপলব্ধি বা ভাবনাকে অর্থাৎ শিল্পের বিষয়বস্তুকে মানব জাতির পক্ষে মূল্যবান হতে হবে।

২। শিল্পের অন্তর্গত বিষয়টির প্রকাশ এমন স্বচ্ছ হওয়ার প্রয়োজন যাতে জনসাধারণ তা সহজেই বুঝতে পারে।

৩। স্রষ্টা শিল্পকর্মে উদ্দীপ্ত হবেন অন্তরের তাগিদে, বাইরের কোন প্রণোদনায় নয়।

সুতরাং যে রচনায় নতুন কোন ভাবনার প্রকাশ নেই তা শিল্পকর্ম নয়। এ ছাড়া অত্যন্ত সুকৌশলে প্রকাশিত বিষয়বস্তুও তুচ্ছ বা মানুষের পক্ষে গুরুত্বহীন হলে শিল্পকর্ম বলে বিবেচিত হবে না—শিল্পীর আভ্যন্তরীণ প্রেরণায় আন্তরিকতার সঙ্গে সৃষ্টি হলেও হবে না। সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার সম্পর্ক আন্তরিক এবং অকৃত্রিম হলেও যদি তা অপরের বোধগম্য না হয়, তবে তাও শিল্পকর্ম হিসেবে বিবেচ্য নয়। বিষয়ের গুরুত্ব এবং প্রকাশের স্বচ্ছতা সত্ত্বেও যে সৃষ্টিকর্ম শিল্পীর অন্তর-প্রেরণাজাত নয়, বাহ্য উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, তাও শিল্পকর্ম পর্যায়ে উত্তীর্ণ হবে না।

যথার্থ শিল্পকর্মের অস্তিত্ব নির্ভরশীল অভিনব বস্তুর প্রকাশে। এ ছাড়া অকৃত্রিম শিল্পকর্ম অন্তঃস্থিত বিষয়, রূপগত স্পষ্টতা এবং আন্তরিকতা সম্পর্কিত তিনটি শর্ত কিয়ৎ পরিমাণে পূরণ করতে সক্ষম।

শিল্পমূর্তি বলে পরিচিতির জন্য শিল্পকর্মে বিষয়বস্তু, সৌন্দর্য এবং আন্তরিকতার যে সর্বনিম্ন পরিমাণ বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন তার সংজ্ঞা কিভাবে নির্ণয় করা সম্ভব,—এখন সে সমস্যার আমরা সম্মুখীন হই।

শিল্পকর্মে পরিণত হবার অপরিহার্য প্রথম শর্ত হলো,—তা এমন বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত হবে,— যা ছিল ইতিপূর্বে অপরিজ্ঞাত, অথচ যা মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়ত, তাতে বিষয়বস্তুর প্রকাশ হবে এমন সুখবোধ্য, যাতে তা সহজে সকলের নিকট পৌঁছায়, এবং তার উদ্ভব হবে শিল্প স্রষ্টার অন্তরস্থিত কোন সংশয় নিরসনের প্রয়োজন থেকে।

যে সৃষ্টিকর্মে এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রত্যেকটি সামান্য পরিমাণেও বিদ্যমান—তা শিল্পসৃষ্টি বলে বিবেচিত হবে। এর মধ্যে যে কোন একটি যদি কোন সৃষ্টিকর্মে অনুপস্থিত থাকে, তবে তা শিল্পকর্ম বলে বিবেচিত হবে না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রত্যেক কর্মের মধ্যেই এমন কিছু থাকে যা মানুষের পক্ষে অল্পবিস্তর প্রয়োজনীয়, এবং যেহেতু প্রত্যেক কাজই অল্পবিস্তর বোধগম্য এবং প্রত্যেক সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে স্রষ্টার আন্তরিকতার সম্পর্কের যোগও অনিবার্য,— সুতরাং শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিষয়-বস্তু, সুখবোধ্য প্রকাশ এবং আন্তরিকভাবে রূপ দেবার সীমারেখা কোথায় ? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে শিল্প সর্বোচ্চ মাত্রায় যা অর্জন করতে পারে তার সুস্পষ্ট উপলব্ধির মধ্যে। শিল্পের সর্বোচ্চ মাত্রার বিপরীতে দেখতে হবে সর্বনিম্ন মাত্রা। এর সাহায্যে শিল্প থেকে অ-শিল্পকে আলাদা করা যাবে। শিল্পবস্তুর সর্বোচ্চ সীমা বলা যায় তাকে,—যা চিরকাল সকল মানুষের নিকট সমান প্রয়োজনীয়। যে বিষয়বস্তু শুভ এবং নৈতিকতাপূর্ণ তা সর্ব সময় সকল মানুষের নিকট প্রয়োজনীয়।* সুতরাং বিষয়বস্তুর নিম্নতম

* অর্ধ শতাব্দী পূর্বে 'গুরুত্বপূর্ণ', 'শুভ' এবং 'নৈতিক' শব্দের কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হতো না। কিন্তু আমাদের যুগে দশ জনের মধ্যে নয়জন শিক্ষিত ব্যক্তি এ শব্দগুলি সম্পর্কে একটি আত্মস্ফীত মনোভাব নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'গুরুত্বপূর্ণ, মঙ্গলমুখী এবং নৈতিক' বস্তু কী ?

মাত্রা স্বাভাবিক ভাবেই পাওয়া যাবে সে ধরনের বিষবস্তুতে যা মানুষের পক্ষে অ-প্রয়োজনীয়, ক্ষতিকর এবং অনৈতিক। অভিব্যক্তির সর্বোচ্চ মাত্রা পাওয়া যাবে সেই বস্তুতে যা সব সময় মানুষের নিকট সুখবোধ্য। সুখবোধ্য বলতে সেই বস্তুকে বোঝায় যার ভেতর কোন অস্পষ্টতা, প্রয়োজনাতিরিক্ততা বা যাথার্থ্যহীনতা নেই। যা স্পষ্ট, সংহত এবং সুনির্দিষ্ট তাকেই বলা যায়—সুন্দর। অপর পক্ষে অভিব্যক্তির নিম্নতম মাত্রা পাওয়া যাবে তাতেই যা দুর্বোধ্য, বিক্ষিপ্ত, অনির্দিষ্ট এবং অবয়বহীন। বিষয়ের অভিব্যক্তির সঙ্গে শিল্পীর সম্পর্কের সর্বোচ্চ মাত্রা থাকে তাতেই—যা সকল মানুষের মনে বাস্তবের অনুভূতি জাগ্রত করে' শুধুমাত্র অস্তিত্ব আছে বলেই যা বাস্তব বলে স্বীকৃত, শিল্পের বাস্তব হুবহু তাই নয়। শিল্পীর আত্মার জগতে যা আনাগোনা করে,—সে বস্তুই বাস্তব। বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রকৃতির অনুসরণেই এই পর্যায়ের বাস্তবের অনুভূতি জাগ্রত হয়। সুতরাং শিল্পিত বিষয়ের সঙ্গে শিল্পীর সর্বোচ্চ সম্পর্ক নিহিত আন্তরিকতায়। অপর পক্ষে শিল্পিত বিষয়ের সঙ্গে শিল্পীর কৃত্রিম সম্পর্কের মধ্যে নিহিত এই সম্পর্কের সর্বনিম্ন সীমা। সকল প্রকারের শিল্পকর্ম এই দুই সীমার মধ্যে অবস্থান করে।

পূর্ণাঙ্গ শিল্পসৃষ্টি তাকেই বলা যায়,—যার বিষয়বস্তু গুরুত্বপূর্ণ, তাৎপর্যমণ্ডিত এবং সে কারণে 'নৈতিক'। এই পর্যায়ের শিল্পের

তাঁরা ধরেই নেন যে, এই শব্দগুলি শর্তাধীন কিছু প্রকাশ করে, এদের কোন সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। সুতরাং যে আপত্তি উঠবার সম্ভাবনা তার জবাব আমিই দেব।

বলের দ্বারা নয়, প্রেমের দ্বারা যা মানুষকে সংযুক্ত করে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের আনন্দকে যা অভিব্যক্তি দেয়—সে বস্তুই গুরুত্বপূর্ণ, শুভ এবং নৈতিক। 'মন্দ' বা 'নীতিহীন' বলা যায় সে বিষয়কে যা মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে এবং বিযুক্তি প্রভাবে যা মানুষকে দুঃখকষ্টের সম্মুখীন করে। মানুষ পূর্বে যা অনুভব করতে সক্ষম হতো না বা ভালোবাসতো না,—যার প্রভাবে তা উপলব্ধি করতে বা ভালোবাসতে পারে—তাকে বলা চলে 'গুরুত্বপূর্ণ'.

অভিব্যক্তি হবে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন, সকলের নিকট সুবোধ্য,—সুতরাং সুন্দর। শিল্পকর্মের সঙ্গে স্রষ্টার সম্পর্ক হবে সম্পূর্ণ আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত এবং সে কারণেই তা হবে প্রকৃতির অনুসারী। এই তিনটি শর্তের অল্পবিস্তর পূরণের ওপরেই রচনা শিল্পকর্ম পদবাচ্য হয়ে ওঠে—তা সে যতই অসম্পূর্ণ পর্যায়ের হোক না কেন। কোন শিল্পকর্মের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু যদি নিতান্ত তুচ্ছ এবং মানুষের নিকট অপ্রয়োজনীয় হয়, কিংবা তার অভিব্যক্তি যদি দুর্বোধ্য হয়, অথবা সেই সৃজনকর্মের সঙ্গে স্রষ্টার সম্পর্ক যদি আন্তরিকতাহীন হয়—তবে তা শিল্প নামের অযোগ্য হবে। এই দিকগুলোর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণতালাভের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে প্রকৃত শিল্পকর্মের উৎকর্ষের তারতম্য। কোন কোন শিল্পকর্মে প্রথম দিকটি প্রধান হয়ে ওঠে, কোন কোনটিতে দ্বিতীয়টি, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তৃতীয়টি।

শিল্পের তিনটি মৌলিক শর্ত অনুসারে বাকী সমস্ত অসম্পূর্ণ সৃজনকর্ম তিনটি মুখ্য কোঠায় পড়ে : প্রথম, বিষয়বস্তুর গুরুত্বের জন্য যেগুলি স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত ; দুই, আঙ্গিকগত সৌন্দর্যের জন্য যেগুলি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ; তৃতীয়, ঐকান্তিক আন্তরিকতার জন্য যেগুলি উল্লেখ্য স্থানের অধিকারী। এই তিনটি শিল্প প্রকরণের মধ্যে সবগুলিই নিখুঁত শিল্পের প্রায় সন্নিকটবর্তী এবং যেখানে শিল্পের অবস্থান সেখানে তাদের অভিব্যক্তি অনিবার্য হয়ে ওঠে।

তরুণ শিল্পীদের শিল্পকর্মে মুখ্যত ঐকান্তিক আন্তরিকতারই প্রাধান্য। তবে এই আন্তরিকতা বিষয়বস্তুর অকিঞ্চিৎকরতা এবং অল্পবিস্তর রূপগত সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশ্রিত। অপর পক্ষে প্রবীণ শিল্পীদের শিল্পকর্মে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনেক সময় রূপাঙ্গিকের সৌন্দর্য এবং অকৃত্রিমতার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে। পরিশ্রমী শিল্পীদের শিল্পকর্মে সাধারণত বিষয়বস্তু এবং অকৃত্রিমতার ওপরে আঙ্গিকগত সৌন্দর্যের প্রাধান্য দেখা যায়।

প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গুণের প্রাধান্যের পরিপ্রেক্ষিতে সকল শিল্পকর্মের মূল্য-মান নির্ণয় সম্ভব। সে মূল্য-মান অনুযায়ী শিল্পকর্মকে নিম্নোক্ত তিনটি ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম, যে শিল্পকর্মে

বিষয়বস্তু এবং সৌন্দর্য—দুইয়েরই অস্তিত্ব আছে, অথচ অকৃত্রিমতার পরিমাণ খুবই যৎসামান্য। দ্বিতীয়, যার ভেতর বিষয়বস্তুর গুরুত্ব আছে, কিন্তু সৌন্দর্য এবং আন্তরিকতার পরিচয় খুবই কম। তৃতীয়, বিষয়বস্তু সংস্থান যে সৃজনকর্মে খুবই কম, অথচ যে শিল্পকর্ম সুন্দর এবং অকৃত্রিম। এ রকম গাণিতিক বিন্যাসের সাহায্যে এই উপ-বিভাগের সংখ্যা আরও বাড়ানো যায়।

এই তিনটি মৌলিক গুণের ভিত্তিতে শুধুমাত্র সমস্ত শিল্পকর্ম নয়, মানুষের সাধারণ মানসিক কর্মসমূহেরও মূল্যমান নির্ণয় করা যেতে পারে। বস্তুতপক্ষে পূর্বে যেমন, বর্তমানেও তেমনি ভাবে তাদের মূল্য নির্ণীত হয়ে আসছে।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের লোক শিল্পের কাছে এই তিনটি গুণ দাবী করেছে বিভিন্ন পরিমাণে। তার ফলে শিল্পের মূল্যায়নে পার্থক্য ঘটেছে এবং আজও ঘটছে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ক্লাসিক যুগে বিষয়বস্তুর তাৎপর্যের দাবী ছিল খুব বেশী। পরবর্তীকালে, বিশেষতঃ আমাদের যুগে স্বচ্ছতা এবং অকৃত্রিমতার জন্য যে দাবী সোচ্চার—তা ছিল সে যুগে খুব কম। মধ্যযুগে সৌন্দর্যের জন্য দাবী বৃদ্ধি পায়, অপর পক্ষে তাৎপর্য এবং অকৃত্রিমতার দাবী নীচু স্তরে নেমে যায়। আমাদের যুগে আন্তরিকতা এবং সত্যান্বেষার দাবী খুব বেড়ে গেছে, অপর পক্ষে সৌন্দর্য, বিশেষ করে তাৎপর্যের দাবী অনেক নীচু স্তরে নেমে গেছে।

॥ পাঁচ ॥

এই তিনটি শর্তকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে শিল্পের বিচার করা হলে তবেই শিল্পকর্মের প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব হয়। কিন্তু এই তিনটি বিষয়ের ওপর সামগ্রিক ভাবে ভিত্তি না করে যদি এর যে কোন একটি বা দুটি বিষয়ের ভিত্তিতে শিল্পকর্মের মূল্যায়ন করা হয়, তবে সে মূল্যায়ন অযথার্থ হতে বাধ্য।

অথচ উল্লেখিত একটি মাত্র শর্তের ভিত্তিতে শিল্পকর্মের মূল্য-মান নির্ণয়ের ভ্রান্ত নীতি এ যুগে বিশেষভাবে প্রচলিত। এর ফলে শিল্পের

নিকট মানুষের যে প্রত্যাশা, তার মান এতই নিম্ন পর্যায়ে অবনমিত করা হয়েছে যে, শিল্পের তুচ্ছ অনুকৃতিসমূহও আজ শিল্পের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। এমন সমস্ত নিকৃষ্ট বস্তুও এ যুগে শিল্পের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছে যে, শিল্প প্রকৃতপক্ষে কি বস্তু, তার সীমারেখায় কোথায়, কারিগরি নৈপুণ্য এবং তুচ্ছ আমেদপ্রমোদের সঙ্গে প্রকৃত শিল্পের পার্থক্য কোনখানে—সে বিষয়ে সমালোচক, জনসাধারণ এমনকি শিল্পীরা পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন।

প্রকৃত শিল্পপ্রকৃতি-উপলব্ধিহীন ব্যক্তিরাই একটি মাত্র দিক থেকে শিল্পকর্মের বিচার করেন। নিজের চরিত্র এবং শিক্ষা অনুযায়ী তাঁরা শিল্প-প্রকরণের প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয়ের মধ্যে একটি দিকেই লক্ষ্য করে থাকেন। তাঁরা কল্পনা করেন এবং ধরেই নেন যে, শিল্পের ব্যাপারে তাদের অনুভূত ঐ একটি মাত্র দিক আছে এবং সেই দিকের ওপর নির্ভরশীল তাৎপর্যই সমগ্র শিল্পের সংজ্ঞা নির্দেশক। তাদের মধ্যে কেউ কেবল শিল্পের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুর গুরুত্বের দিক থেকে, আবার কেউ শুধু শিল্পীর আন্তরিকতা এবং প্রকৃতি অনুসরণের বিশ্বস্ততার দিক থেকে শিল্প-স্বরূপ ব্যাখ্যা করে থাকেন। এখানেই না থেমে তাঁরা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর নির্ভর করে শিল্প-প্রকৃতির সংজ্ঞা নির্দেশ করেন। নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তাঁরা শিল্পতত্ত্ব সৃষ্টি করেন, এমন ব্যক্তিদের প্রশংসা এবং উৎসাহিত করেন যারা তাঁদের মতই শিল্পের প্রকৃত অবস্থান কোথায়,—তা উপলব্ধি না করে বিভিন্ন উপাদানের সাহায্যে শিল্পকে পিঠার মত তৈরী করেন এবং শিল্প-নামধারী সব রকমের মুর্খ কাজ এবং জঘন্য বস্তুর নোংরা স্রোতে পৃথিবীকে ভাসিয়ে দিয়ে সে সমস্ত বস্তুকে 'শিল্পকর্ম' বলে অভিহিত করে থাকেন।

শিল্প-প্রিয় অধিকাংশ লোক এই ধরনের। অধিকাংশের প্রতিনিধি হিসেবে পূর্বোল্লিখিত তিনটি নান্দনিক মতবাদের প্রবক্তারাও সে দলের। সে শিল্পতত্ত্বগুলিও অধিকাংশ লোকের ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষা এবং চাহিদা পূরণ করে মাত্র।

এ সমস্ত তত্ত্ব শিল্পের সামগ্রিক গুরুত্ব সম্পর্কে ভুল বোঝার এবং তার তিনটি মৌলিক শর্তকে অস্বীকার করার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

এর ফলে শিল্পের তিনটি ভ্রান্ত তত্ত্বের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। প্রকৃত শিল্পের তিনটি মৌলিক শর্তের মধ্যে একটিকে মাত্র গ্রহণ করে অপর দুটোকে পরিহার করাই হলো এই সংঘর্ষ সৃষ্টির কারণ।

উদ্দেশ্যমূলক বলে অভিহিত প্রথম তত্ত্ব কেবলমাত্র সেই সব বস্তুকে শিল্পকর্ম হিসেবে গ্রহণ করে- যাদের বিষয়বস্তু অভিনব হোক বা না হোক, প্রচলিত নীতির দিক থেকে সকল মানুষের নিকট গুরুত্বপূর্ণ। এই তত্ত্ব অনুসারে শিল্প ব্যাপারে সৌন্দর্য এবং আধ্যাত্মিক গভীরতার প্রশ্ন নেহাৎ গৌন।

কলাকৈবল্যবাদ নামে অভিহিত দ্বিতীয় তত্ত্ব শিল্প বলে সেই বস্তুকেই স্বীকার করে—যা রূপগত সৌন্দর্যে ঐশ্বর্যবান। এই তত্ত্ব বিষয়বস্তুর মহত্ত্ব, গুরুত্ব কিংবা আন্তরিকতার প্রশ্ন-নিরপেক্ষ।

প্রচলিত মতে বাস্তববাদী বলে অভিহিত তৃতীয় তত্ত্ব মাত্র তাকে শিল্পকর্ম বলে অঙ্গীকার করে—যাতে বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক আন্তরিক এবং সে কারণে সত্যসন্ধানী। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বিষয়বস্তু যত তুচ্ছ বা কুৎসিতই হোক না কেন, যদি তাতে কিয়ৎপরিমাণে রূপগত সৌন্দর্যের অস্তিত্ব থাকে, পরিবেশিত বিষয়ের সঙ্গে শিল্পীর সম্পর্ক আন্তরিক হয় এবং যদি তা প্রকৃতির বিশ্বস্ত অনুসরণ হয় তবে তা উৎকৃষ্ট শিল্প পদবাচ্য।

॥ ছয় ॥

উক্ত সব তত্ত্বই শিল্প বিষয়ক একটি মুখ্য প্রশ্নের কথা ভুলে যায়। তা হলো বিষয়বস্তুর গুরুত্ব, সৌন্দর্য কিংবা আন্তরিকতা— এ সবের কোনটিই শিল্পের একমাত্র শর্ত নয়। শিল্পসৃষ্টির মৌল শর্ত হলো,— শিল্পীকে কোন অভিনব এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। যথার্থ শিল্পীর পর্যায়ে উন্নীত হতে হলে চিরকালের মত ভবিষ্যতের শিল্পীকে সম্পূর্ণ অভিনব এবং গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় অনুভবে সক্ষম হতে হবে। অভিনব বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য শিল্পীর পক্ষে প্রয়োজন পর্যবেক্ষণ, মনন, এবং জীবনের বৈচিত্র্য সম্পর্কে মনোযোগী অন্তর্দৃষ্টি এবং ধ্যানতন্ময়তা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সে সমস্ত তুচ্ছ বিষয়

থেকে মুক্ত থাকতে হবে যা মানুষকে জীবনের গভীরে প্রবেশে বাধা দেয়। তাঁর দেখা অভিনব বস্তুগুলি গুরুত্বপূর্ণ কিনা তা উপলব্ধির জন্য শিল্পীকে নৈতিক দিক থেকে অবশ্যই পরিশীলিতমনা হতে হবে। স্বার্থপর জীবন যাপন না করে তাঁকে সাধারণ মানুষের জীবন-প্রবাহের অংশীদার হতে হবে।

শিল্পী যদি অভিনব এবং গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় অন্তরে যথার্থভাবে অনুভব করেন, তবে অভিব্যক্তির একটি রূপ অবশ্যই তিনি খুঁজে পাবেন। এবং যে আন্তরিকতা শিল্পসৃষ্টির অপরিহার্য অঙ্গ, তাও তার রচনায় বিদ্যমান থাকবে। অভিনব বিষয়কে সর্বজনবোধগম্য করে প্রকাশ করার সামর্থ্য অবশ্যই তাকে অর্জন করতে হবে। হাঁটার সময় নিউটনের গতি-সূত্রের কথা যেমন মানুষ কখনও ভাবে না, তেমনি শিল্প সৃষ্টির সময় তাঁকেও শিল্পকৌশলের সূত্র সম্পর্কে যেন কিছুই ভাবতে না হয়। হাঁটার সময় কোন ব্যক্তির পক্ষে হাঁটা সম্পর্কে চিন্তা করা কিংবা তাঁর নিজস্ব হাঁটার ভঙ্গীর প্রশংসা করা তেমন উচিত নয়, তেমনি শিল্পীরও নিজের শিল্পকর্মকে খুঁটিয়ে দেখে তার প্রশংসা করা কিংবা শিল্প-কৌশলকে উদ্দেশ্যে পরিণত করা কোন ক্রমেই উচিত নয়। বিষয়টি কিরূপে স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করা যায়, এবং তা সকলের নিকট বোধগম্য হয়—একমাত্র তার প্রতিই শিল্পীর লক্ষ্য থাকা উচিত।

সর্বশেষে, বহিরঙ্গীয় উদ্দেশ্য পরিহার করে অন্তরের আভ্যন্তরীণ তাগিদ মেটাবার জন্যই শিল্পীকে শিল্প রচনায় ব্রতী হতে হবে। অর্থ লালসা এবং অসার দম্ভ মেটাবার লক্ষ্যের উর্ধ্বে উঠতে হবে তাঁকে। শিল্পকে নিজের অন্তর দিয়ে ভালবাসতে হবে, অপরের বরাত দিয়ে নয়। অর্থাৎ অপর ব্যক্তি যা ভালোবাসে বা ভালোবাসার যোগ্য বিবেচনা করে, তা যদি তাঁর কাছে ভালো না লাগে কিংবা ভালোবাসার অযোগ্য প্রতীয়মান হয়, তবে সে ক্ষেত্রে ভালোবাসার অভিনয় অবশ্যই তাঁকে পরিহার করতে হবে।

এ সমস্ত গুণ অর্জন করতে হলে শিল্পীর দৃষ্টিকে প্রলোভনের টোপ থেকে অন্তর্দিকে ফিরিয়ে নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে বালাআম (Balaam) কাহিনী স্মরণীয়। বালাআমের নিকট রাজার লোকেরা প্রস্তাব নিয়ে

এলে প্রথমে তিনি ঈশ্বরের নির্দেশের জন্য প্রতীক্ষা করেছিলেন, এবং নির্দেশ লাভ করে তদনুযায়ী জবাব দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে উপ-ঢৌকন এবং রাজসম্মানের লোভে ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করে যখন তিনি রাজার নিকট গমন করেছিলেন, তখন প্রলোভন এবং আত্ম-স্ফুরিতায় তাঁর দৃষ্টি এতই অন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি যে গর্দভের ওপর আরূঢ় ছিলেন, সে গর্দভ যা দেখতে পেয়েছিল— তাও তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না।

॥সাত ॥

আমাদের যুগে ওই ধরনের কিছু দাবী করা হয় না। শিল্প স্থষ্টির অভিলাষী কোন ব্যক্তি তার আত্মার জগতে গুরুত্বপূর্ণ কিংবা অভিনব কোন অনুভূতি জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে রাজী নন — যাতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু কিংবা অভূতপূর্ব অনুভূতিকে আন্তরিক ভাবে ভালোবেসে যথাযোগ্য রূপসৌন্দর্যে তিনি তাকে মূর্ত করে তুলতে পারেন। এ যুগের শিল্পযশপ্রার্থীরা তাঁদের বিবেচনায় চতুর বলে অনুমিত ব্যাক্তিদের আলোচিত এবং প্রশংসিত কোন প্রচলিত বিষয়কে গ্রহণ করে তাকে যথাসম্ভব 'শৈল্পিক' রূপ দান করেন। অথবা নিজস্ব কলা-কৌশলগত নৈপুণ্য প্রদর্শনের পক্ষে সুবিধাজনক কোন বিষয় নির্বাচিত করে শ্রম এবং ধৈর্যের সাহায্যে নিজের ধারণা অনুযায়ী তাকে 'শিল্পিত' করার প্রয়াস পান। অথবা কোন বিষয় তাঁর মনে আকস্মিক কোন অনুভূতি স্থষ্টি করলে তিনি মনে করেন, যেহেতু তাঁর মনে অনুভূতি স্থষ্টি হয়েছে, তা অবশ্যই শিল্পের জন্ম দিতে সমর্থ - এ বিবেচনায় তিনি সেই অনুভূতিকে নিজের শিল্প রচনার বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেন।

এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে শিল্পের নামে অসংখ্য অপ-শিল্পের উদ্ভব হচ্ছে। যে কোন কারিগরি পণ্যের মতই নূনতম বিরতি ছাড়াই এ জাতীয় তথাকথিত শিল্পবস্তু উৎপাদন করা যেতে পারে। সমাজে সব সময়ই নানা রকম ফ্যাসানের প্রবণতা থাকে। ধৈর্যের সঙ্গে অনুশীলন করলে এর কোন কোন কায়দা রপ্ত করা অবশ্যই সম্ভব। তা ছাড়া কোন না কোন বিষয় সব সময় কিছু না কিছু লোকের কৌতূহলের সামগ্রী। প্রকৃত শিল্পকর্মের সঙ্গে যে সমস্ত শর্ত যুক্ত হওয়া উচিত,

সেগুলিকে বিছিন্ন করে আজকাল অনেকে শিল্পের নামে বহুল পরিমাণ ছদ্মবেশী শিল্পকর্ম উৎপাদন করে চলেছেন জনসাধারণ, সমালোচক, এমনকি ছদ্ম-শিল্পীরাও তাকে শিল্প বলে বিবেচনা করেছেন, কিন্তু তার সংজ্ঞা নিরূপণে সমর্থ হচ্ছেন না।

এ যুগের মানুষ যেন আত্মগতভাবেই বলে থাকেন, 'যেহেতু শিল্প-সৃষ্টি সৎকর্ম এবং প্রয়োজনীয় 'সে কারণে তার উৎপাদন যত বেশী হয় ততই ভালো'। শিল্পের উৎপাদন যদি অধিক পরিমাণে সম্ভব হতো তবে সত্য সত্যই তা ভালোই হতো। কিন্তু গোলমেলে ব্যাপার এই যে, ফরমায়েস দিয়ে তেমন সৃষ্টিই সম্ভব—যা নিতান্তই কারিগরি নৈপুণ্যের কাজ —যেহেতু এ ধরনের সৃষ্টিকর্মে শিল্পের অপরিহার্য শর্তগুলি অনুপস্থিত।

বস্তুতপক্ষে ফরমায়েস দিয়ে কোন সত্যিকারের শিল্পসৃষ্টি হয় না। যেহেতু প্রকৃত শিল্পকর্ম শিল্পীর আত্মার জগৎ উদ্ভূত-নতুন কোন জীবন-ধারণার বিস্ময়কর উদ্‌ঘাটন (Revealation) (যা মানুষের আয়ত্তের অতীত এমন কোন নিয়মে সংঘটিত)—যার অভ্যুদয়ে মানব-প্রগতির পথ আলোকিত হয়।*

---

* টলস্টয়ের বিশ্ব-আলোড়নকারী শিল্প-বিষয়ক গ্রন্থ 'What is Art ?' রচনার (১৮৯৮) পূর্বে দীর্ঘকাল তিনি শিল্পাদর্শ সম্বন্ধে যে সমস্ত ভাবনা-চিন্তা করেছিলেন, তার প্রাথমিক রূপ দেন তিনি 'On Art' নামক একটি প্রবন্ধে। এ প্রবন্ধটি লিখিত হয় 'What is Art ?'-এর মাত্র দুই বৎসর পূর্বে ১৮৯৫-৯৭-র মধ্যে। World's Classic's Series-এ টলস্টয়ের বিখ্যাত অনুবাদক Aylmer Maude কর্তৃক 'What is Art and Essays on Art' নামক যে বিখ্যাত অনুবাদ গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় (১৯৩০), 'শিল্প প্রসঙ্গে' তার অন্তর্গত 'On Art' প্রবন্ধের অনুবাদ। 'On Art' প্রবন্ধের' ভূমিকায় এইলমার মড্ বলেছেন :—

'What is Art ?' রচনার পূর্বে On Art শীর্ষক প্রবন্ধটিতে টলস্টয় তাঁর শিল্প সম্পর্কীয় অভিমতগুলি প্রকাশের শেষ প্রয়াস পান। এ প্রবন্ধটি লিখে অবশ্য তিনি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তবে এ প্রবন্ধে অভিব্যক্ত অভিমত কতগুলি ক্ষেত্রে তাঁর শিল্প-বিষয়ক

পরিণত অভিমতের সন্নিকটবর্তী। এ প্রবন্ধ লেখার সময় তিনি যে সমস্ত বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন নি, সেগুলি হলো: (ক) পরবর্তী গ্রন্থে শিল্প সম্পর্কে তিনি যে পরিষ্কার কাজ-চালানোর মত সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন, এ প্রবন্ধে তার অনুপস্থিতি। (খ) শিল্পকর্মের যে রূপমূর্তি (Form) তাকে সংক্রামক (infectious) করে তোলে, তার মূল্য এবং প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণে পৃথক স্বচ্ছ ধারণা। এবং (গ) অনুভূতির যে বিষয়বস্তু সাধারণ মানবজীবন-সম্পর্কিত, তা কি পরিমাণে মানবজাতির হিত অথবা ক্ষতি করে।

On Art প্রবন্ধটি পড়লে মনে হয়, যে পথরেখা তিনি পুরোপুরি আবিষ্কার করতে পারেন নি, এ প্রবন্ধে তিনি সে পথ সন্ধানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। পরবর্তীকালে লিখিত 'What is Art?' নামক গ্রন্থে তিনি তাঁর শিল্প-প্রত্যয়কে দৃঢ় এবং বিশদ প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

—এ. এম.

শিল্প সম্পর্কে 'What is Art?'-এ পরিণত সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার পূর্বে টলস্টয় যে সমস্ত ভাবনা-চিন্তা করেছিলেন, তাঁর স্মারক হিসাবে টলস্টয় অনুরাগী-মহলে On Art প্রবন্ধটির মূল্য নিশ্চয়ই স্বীকৃতি পাবে —এ ভরসায় প্রবন্ধটি এখানে অনূদিত হল।—গ্রন্থকার।



শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১	২২	চার্চকও	চার্চকেও
৩২	৪	প্রশসাযোগ্য	প্রশংসাযোগ্য
৩৭	১৩	ভোকাজ্জার	ভোগাকাঙ্ক্ষায়
৩৮ (ফুটনোট)	১৮	parsecution	persecution
৩৮	২০	প্রলন্ধ	প্রবন্ধ
৩৮	২১	হীয়াৎ	হায়াৎ
৩৮	২১	লেভতস্তোয়	লেভ তল্স্তোয়
৪৫	১০	আমেরা	আমরা
৫৫	২৮	sulby	sully
৫৬	২৮	বস্তুতাঢ	বস্তুগত
৬৩	৫	নিম্নভিমুখী	নিম্নাভিমুখী
৬৩	১৩	মত	×
৬৬	৭	প্রভৃতত	প্রভৃত
৭৩	২৮	স্থূলতমা	স্থূলতম
৭৫	২৮	অস্পষ্টিত	অস্পষ্টতা
৭৬	১৬	শিল্পগুরসিকও	শিল্পরসিকও
৭৮	৬	শিল্প	শিল্পে
৮১	৩	কন্‌কসা	নক্‌সা
৮২	৯	ডেলিভর্ডে	ভেলিভার্ড
৮৫	১৭	মৃলক্ষণ	সুলক্ষণ
৮৮	১৮	শিল্পেক	শিল্পকে
৯২	৪	স্বস্ফুতঃর্রর্তভাবে	স্বতঃস্ফূর্তভাবে
৯৩	২০	শিল্প কাহিনী	কাহিনী
৯০	২০	সামঞ্জস্যে	সামঞ্জস্যময়
৯৮	৪	ল	লা
১০০	১৭	খটলে	ঘটলে
১০১ ফুটনোট	২য়	rescow	Moscow
১০৫	১২	নিষ্কাষণ	নিষ্কাশন
১০৬	২১	উপাক্তভোগের	উপভোক্তার
১১৬	১৯	প্রাশ্ন	প্রশ্নে
১১৯	২১	দুরধগম্য	দুরধিগম্য
১২০	২৭	ব্যক্ত	ব্যক্তি